ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর ভূমিকা

এম. ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

এ. কে. এম ইদ্রিস আলী

সিনিয়র প্রফেসর

গবেষক

মোঃ কামাল হোসেন

RB

B

954.0

ইতিহাস ও সংস্কৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারি ২০০১ ইং

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর ভূমিকা

এম. ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
446960

তত্ত্বাবধায়ক

২৪.০২.০৭

এ. কে. এম ইদ্রিস আলী

সিনিয়র প্রফেসর

GIFT

446960

গবেষক

২৪.০২.০৭

মোঃ কামাল হোসেন

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ইং

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বীর সেনানী

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী

44696

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

*

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর ভূমিকা

সূচিপত্রঃ

ক্রমিক নং		পৃষ্ঠা নং
উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর ছবি:		*
সূচিপত্র		I-III
তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়-এর মতামত:		**
কৃতজ্ঞতা স্বীকার:		***
প্রস্তাবনা:		এক-তিন
প্রথম অধ্যায়-		০১-৩৮
আধুনিক যুগের ইতিহাস চর্চার দিক দর্শন:		০১-৩৫
১।	নয়া যুগের নয়া ঐতিহাসিক চিন্তনের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রাচ্য দেশে এর প্রতিক্রিয়া:	০৭-১৭
২।	সিন্ধীর জীবন ও সময়, ভারতীয় প্রেক্ষাপট:	১৭-২৪
৩।	সিন্ধী ও কাবুল মিশন, এক নয়া পথের যাত্রী:	২৪-২৮
৪।	সিন্ধী ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ:	২৮-৩১
৫।	জীবন সায়াহ্নে সিন্ধীর কিছু চিন্তা ভাবনা:	৩১-৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়-		৩৯-৪৮
	(ক) জন্ম ও বংশ পরিচয়:	৩৯
	(খ) শিক্ষাগ্রহণ ও ধর্মান্তরিত হওয়ার ইতিহাস:	৩৯-৪১
	(গ) সিন্ধুতে বসতি স্থাপন ও শিক্ষা গ্রহণ:	৪১-৪২
	(ঘ) দেওবন্দ গমন ও শিক্ষাগ্রহণ:	৪২-৪৩
	(ঙ) চিকিৎসার জন্য দিল্লী গমন ও শিক্ষাগ্রহণ:	৪৩
	(চ) সিন্ধুতে প্রত্যাবর্তন ও বিবাহ বন্ধন:	৪৩-৪৪
	(ছ) পুনরায় দেওবন্দ গমন ও শিক্ষাগ্রহণ:	৪৪-৪৫
	(জ) ইন্তেকাল:	৪৫
তৃতীয় অধ্যায়-		৪৯-১২৩
	সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন:	৪৯-১০৮
(ক) গোঠপীরঝাণ্ডায় 'দারুল ইরশাদ' প্রতিষ্ঠা:		৪৯

44696
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

(খ) দেওবন্দে 'জমী'অতুল আন্সার'-এ যোগদান: ৪৯-৫১
১) জমী'অতুল আন্সার-এর প্রথম কনফারেন্স: ৫১-৫২
২) জমী'অতুল-আন্সার-এর দ্বিতীয় কনফারেন্স: ৫২-৫৩
৩) জমী'অতুল-আন্সার থেকে সিন্ধীর পদত্যাগ: ৫৩
(গ) দিল্লীতে গমন ও 'নিযারাতুল মা'আরিফ'-এ যোগদান: ৫৪-৫৫
(ঘ) সিন্ধী'র সশস্ত্র বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক তৎপরতা: ৫৫-৫৮
১) ব্রিটিশদের দমননীতি ও ভারতীয় রাজনীতি: ৫৫-৫৮
(ঙ) ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী: ৫৮-৬৬
১) ব্রিটিশ ভারতের উপর বহিরাক্রমণের পথ নির্ধারণ: ৬০
২) দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কেন্দ্র: ৬১
৩) হেড কোয়ার্টার: ৬১
৪) অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কেন্দ্রসমূহ: ৬১
৫) দেশ-বিদেশে মিশন প্রেরণ: ৬৩
ক) চীন ও বার্মা মিশন প্রেরণ: ৬৩
খ) জাপানে মিশন প্রেরণ: ৬৪
গ) ফ্রান্সে মিশন প্রেরণ: ৬৪
ঘ) আমেরিকা মিশন প্রেরণ: ৬৪
(চ) সিন্ধী ও মাহমূদ হাসানের দেশত্যাগ: ৬৬
১) সিন্ধীর আফগানিস্তানে গমন: ৬৬
২) মাহমূদ হাসানের হিজায গমন: ৬৮
৩) আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ কেন্দ্র: ৬৯
৪) প্রবাসী স্বাধীনতাকামীদের কাবুলে আগমন: ৬৯-৭১
৫) সিন্ধীর কাবুলে কূটনৈতিক তৎপরতা: ৭১-৭২
৬) অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন: ৭২-৭৪
৭) জুনূদুল্লাহ (আল্লাহর বাহিনী) নামক মুক্তিফৌজ গঠন: ৭৪-৭৮
(ছ) অস্থায়ী ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দেশে মিশন প্রেরণ: ৭৮-৮২
ক) রাশিয়া মিশন প্রেরণ: ৭৯-৮০
খ) ইস্তাম্বুল ও জাপানে মিশন প্রেরণ: ৮০-৮১
(জ) ঐতিহাসিক রেশমী রুমাল আন্দোলন: ৮১-৮২
১) গালিবনামা: ৮২-৮৩
২) আনওয়ারনামা: ৮৩-৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৩) ইংরেজ কর্তৃক রেশমীপত্র উদ্ধার: ৮৮–১০২

(ঝ) রাউলাট রিপোর্ট ও সিন্ধীর ব্রিটিশ বিরোধী কর্মতৎপরতা: ১০২–১০৬

(ঞ) আমীর আমানুল্লাহ খানের আমলে সিন্ধীর কর্মতৎপরতা: ১০৬–১০৮

চতুর্থ অধ্যায়– ১২৪–১৩৪

আফগানিস্থান ত্যাগ এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ব্রিটিশদের বিরোধিতা: ১২৪–১৩২

ক) রাশিয়া ভ্রমণ: ১২৬–১২৭

খ) তুরস্কে ভ্রমণ ও ব্রিটিশ বিরোধী কর্মতৎপরতা: ১২৭–১৩১

গ) মক্কা ভ্রমণ: ১৩১–১৩২

পঞ্চম অধ্যায়– ১৩৫–১৪৯

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর সিন্ধীর কর্মতৎপরতা: ১৩৫–১৩৬

ক) করাচীতে অবতরণ ও বিবৃতি প্রদান: ১৩৬–১৩৭

খ) দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কর্মতৎপরতা: ১৩৭–১৩৮

গ) যমুনা নর্মদা সিন্ধ সাগর পার্টি গঠন: ১৩৮–১৩৯

ঘ) 'দর্শন সেবা সমিতি' গঠন: ১৩৯–১৪১

ঙ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশনীতির সমর্থন: ১৪১–১৪৭

উপসংহার: ১৫০–১৫২

ষষ্ঠ অধ্যায়– ১৫৩–১৭২

পরিশিষ্ট– এক ১৫৩–১৬৩

রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা ১৫৩–১৬৩

পরিশিষ্ট– দুই ১৬৪–১৭১

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা ১৬৪–১৭১

পরিশিষ্ট– তিন ১৭২

উপমহাদেশীয় মুসলমানের উৎপত্তি। ১৭২

গ্রন্থপঞ্জীসমূহ ১৭৩–১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন. করা যাচ্ছে যে, **"ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর ভূমিকা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি মোঃ কামাল হোসেন-এর গবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা এবং এটি এম.ফিল ডিগ্রি প্রদানের জন্য বিবেচনাযোগ্য।

২৪.০২.০৭

এ.কে.এম ইদ্রিস আলী

প্রফেসর

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ।

**

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর ভূমিকা" শীর্ষক শিরোনামে গবেষণাপত্র প্রণয়নে আমি বিশেষভাবে অত্র গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক, ইতিহাসবিদ এবং বিভাগীয় সিনিয়র প্রফেসর এ. কে. এম ইদ্রিস আলী স্যার-এর প্রতি কৃতজ্ঞ। এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে তিনি আমার জন্য যে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সময়-অসময়ে আমার বিরক্তকে অসামান্য মমতা দিয়ে সহ্য করেছেন, বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, মূল্যবান উপদেশ, বই পুস্তক দিয়ে সহযোগিতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন; এর কোন তুলনা হয় না। তাঁর এ ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব না।

দেশ-বিদেশের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, নিপুণ সুধী ও পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি তা অতীব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। নানা অন্তরায় ও প্রতিকূল অবস্থায় গবেষণা কাজ চালিয়ে যাবার জন্য যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা।

মোঃ কামাল হোসেন

***

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশদের হাতে বাংলার নবাব সরকারের পতনে বঙ্গ ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাস্তব অবস্থায় এক নাজুক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বঙ্গ ভারতের মানুষ এ অভূতপূর্ব অবস্থার জন্য কোনক্রমেই প্রস্তুত ছিল না। অষ্টাদশ শতকের পলাশীর ঘটনার স্যার যদুনাথ সরকার যে মূল্যায়ন করেছেন তার সাথে অনেকেই ন্যায়সঙ্গত ভাবে সূর মেলাতে পারেন নি। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, পলাশীর ঘটনার মর্মবস্তুতে ছিল এক নয়া যুগের আগমন বার্তা। এ নয়া যুগ কাদের জন্য আর্শিবাদ আর কাদের জন্য অভিশাপ, তাৎক্ষনিকভাবে দেশের অগ্রগামী সমাজের লোকদের নিকট সমভাবে বোধগম্য ছিল না। এই ঘটনার ছিল নানা ধরনের সুদূর প্রসারী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া। দেশের মানুষের একাংশ হয়ে পড়েন কিংকর্তব্যবিমূঢ়; আবার এ ঘটনার প্রতি কারও সাড়া ছিল ইতিবাচক; কোন কোন ক্ষেত্রে ভীষণ নেতিবাচক।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এদেশের রাজনীতিক, সমাজ সংস্কারক ও বুদ্ধিজীবী মহলের গর্বিত অংশগ্রহণ রয়েছে। ভারতবর্ষের যে সব ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী। তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী, সংগ্রামী ও জাগ্রত বিবেকের অধিকারী। সেই সাথে তার মধ্যে ছিল চিত্তচাঞ্চল্যের লক্ষণ। তিনি শৈশবে শিখ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই জন্মভূমি পাঞ্জাব ছেড়ে সিন্ধুতে বসবাস শুরু করেন। এজন্য তিনি নিজেকে সিন্ধী নামে পরিচয় দিতে বেশি পছন্দ করতেন। তাঁর ধর্মান্তর কি নয়া ধর্মের প্রতি নির্বিচার আকর্ষণের একটি কারণ? ছাত্রজীবনে সিন্ধী দেওবন্দে মাওলানা মাহমূদ হাসানের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর ছোঁয়া পেয়ে তিনি তৎকালীন বাস্তবতায় জিহাদী মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্তে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের নীতি বিসর্জন দেন।

তাঁর জীবনাদর্শ ও রাজনৈতিক চিন্তা ও ধর্মীয় ভাবনা নিয়ে পরস্পর বিরোধী মতামত আছে। এজন্য তাকে বিশেষভাবে জানার প্রয়োজন আছে। কর্মজীবনের গোড়ার দিকে তিনি সনাতন ধর্মেই দীক্ষা গ্রহণ করেন; প্রথম জীবনে সনাতন শিক্ষায় একজন বড় পন্ডিত হলেও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুধাবনের প্রচন্ড দুর্বলতা থাকার কথা। ফলে আধুনিক সমাজ বিকাশের ধারা সম্পর্কে তাঁর মতামত অপরিবর্তনীয় হতে পারতনা; আশ্চর্যের ব্যাপার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করতে হিন্দু-মুসলিমের যুক্ত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন বটে; কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর মতামত অপরিচ্ছন্ন হওয়ায় হিন্দু মুসলমান দু'টো জাতির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। যা ছিল অবাস্তব অথচ তিনি ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত 'পাকিস্তান আন্দোলন'- এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর জন্য পাকিস্তানে তিনি প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি উপমহাদেশের একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান খুঁজেছিলেন সর্বভারতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোন রূপরেখা তুলে ধরতে ব্যর্থ হন। প্রথম দিকে তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে সাংগঠনিক তৎপরতা চালালেও জীবনের শেষ দিকে কিছুটা ব্রিটিশ তোষণনীতি অবলম্বন করেন বলে কারও ধারণা হতে পারে এবং বক্তব্য বিবৃতির মধ্যেই তাঁর কর্মধারা সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। তৎকালীন বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, মুসলিম বিশ্বের প্রায় সব দেশের সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকায় এবং সামরিক *সাহায্য নিয়ে ভারতের পাশে দাঁড়াবে এমন কোন দেশ না থাকার কারণে, তিনি শেষ জীবনে* সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করেন। স্বাধীনতার জন্য, সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য আত্মনির্ভরশীল কোন পথ ও মতের অনুসন্ধান পাননি।

তিনি একজন বিতর্কিত ব্যক্তি, কিন্তু সর্বদা সক্রিয়। এই পণ্ডিত, বাগ্মী, গবেষক, লেখক, কূটনৈতিক, রাজনীতিক ও সর্বোপরি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বীর সেনানী সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানে উর্দু ভাষায় কিছু লেখা-লেখি ও গবেষণা হলেও বাংলাভাষায় উক্ত শিরোনামে কোন গবেষণা আজও পর্যন্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। তাঁর জীবন ও অবদান সম্পর্কে বাংলাদেশ-পাক-ভারত তথা উপমহাদেশে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বইপত্র পাওয়া গেলেও তা যৎসামান্য। স্বাধীনতা পূর্বকালে রচিত লেখাগুলো রাজনৈতিক কারণে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরবর্তীকালে তাঁর সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে তাও অপ্রতুল এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। তাই সময়ের দাবীর কারণে এ মহান ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক; এবং সিন্ধীর রাজনীতি এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে একটি সার্বিক গবেষণা কর্মের প্রয়োজন আছে বৈকি! মূলত এ অভাব পূরণের জন্যই এ অভিসন্দর্ভ রচনার প্রয়াস।

এ গবেষণা কর্মের জন্য যেসব মৌলিক গ্রন্থের একান্তই প্রয়োজন ছিল, এমন বেশ কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করা হয়েছে এবং অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে: মাওলানা *উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী রচিত 'শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ আওর উনকি সিয়াসী তাহ্‌রিক'* ও *'কাবুল মেঁ সাত* সাল', মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরবাদী রচিত 'মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী আওর উনকে নাকিদ', ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ রচিত 'মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ঃ জীবন ও কর্ম', শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহ্‌মদ মাদানী রচিত 'নকশ্-এ হায়াত' ২য় খণ্ড ও 'সফরনামা-এ আসীরে মাল্টা', আবদুর রশীদ আরশাদ রচিত 'বীস বড়ে মুসলমান', মাওলানা আব্দুর রহমান রচিত 'তাহরীকে রেশমী রুমাল', মুহাম্মদ সারওয়ার রচিত 'খুতুবাত-এ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী'ও 'তা'লীমাত-এ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী', সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ রচিত 'আসিরান-এ মাল্টা' ও 'উলামা-এ হক', ড. অতুল চন্দ্র রায় রচিত 'ভারতের ইতিহাস' সায়্যিদ মাহবূব রিজবী রচিত 'তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ', আব্দুল জলীল রচিত 'দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ' মওলানা মুজীবুর রহমান রচিত 'মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর রোজনামচা', হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী রচিত 'আযাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী' ইত্যাদি গ্রন্থরাজি। কোন মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থের সন্ধান মেলেনি। 'দৈনিক জমী'অত', 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা', 'The Dhaka University studies', 'Rawlatt sedition committee Report', 'Silken letters conspiracy case and who is who' ইত্যাদি পত্রিকা ও রিপোর্টসমূহ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও এই গবেষণা কাজে ছোট-বড় বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থাগারসহ বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি, মালিবাগ মাদ্‌রাসার কুতুবখানা, চৌধুরীপাড়া মাদ্‌রাসার লাইব্রেরি, ইক্‌রা বাংলাদেশ-এর গ্রন্থাগার, ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসার লাইব্রেরি, ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদ্‌রাসার লাইব্রেরি, আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর এ. কে. এম ইদ্রিস আলী-*এর ব্যক্তিগত পাঠাগার*, ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্-*এর ব্যক্তিগত পাঠাগার*।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রেক্ষাপটে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে কাবুল ত্যাগ করতে হয়। অতঃপর তিনি পর্যায়ক্রমে রাশিয়া আশ্রয় নিয়ে সমাজবাদ, তুরস্কে গিয়ে কামাল পাশার ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সাথে পরিচিত হন। কিন্তু কোন বিষয়েই তিনি বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন বলে মনে হয় না। সর্বশেষে মক্কায় গিয়ে বার বছর জ্ঞান সাধনায় মগ্ন থাকেন। তবে তার জ্ঞান সাধনার বিষয় আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন ছিল না বরং সনাতন প্রাচ্য বিদ্যা। তাই তিনি শাহ ওলিউল্লাহর মতাদর্শের উপর নতুন করে পড়াশুনা করেন। এই গবেষণায় নতুন কোন জ্ঞান মাত্রা সংযোজিত হয়েছে বলে মনে করা যায় না। দীর্ঘ দু'যুগেরও বেশী সময় উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছেন। অতঃপর ভারতে তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিক ব্যক্তির সহায়তায় দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে ফিরে এসে তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেননি, আবার কোন দল মতের সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে বরং স্বকীয় উদ্যোগে 'যমুনা নর্মদা সিন্ধ সাগর পার্টি' গঠন করে তাঁর কর্মতৎপরতা চালিয়ে যান। বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত তাঁর সম্পর্কে তথ্যরাজীর নির্মোহ বা নিরপেক্ষভাবে সমন্বয় সাধনাই এ গবেষণার মূল সুর।

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাই প্রথম পরিশিষ্টে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা, দ্বিতীয় পরিশিষ্টে তাঁর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা এবং তৃতীয় পরিশিষ্টে উপমহাদেশীয় মুসলমানদের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর মতামত তুলে ধরা হয়েছে। আধুনিক গবেষকরা হয়ত সৃজনশীলভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে পারবেন।

এ অভিসন্দর্ভে বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ব্যক্তিত্ব মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অবদান সম্পর্কে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এর দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের কিছু অধ্যায় বাংলা ভাষাভাষীর জানার অবকাশ হবে। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে জানার অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি করলে এ ক্ষুদ্র প্রয়াত স্বার্থক হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ কামাল হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় উপমহাদেশের বিশ শতকের প্রথমার্ধের ক্রান্তিলগ্নে ঘটনা বহুল যুগ সন্ধিক্ষণের এক ব্যক্তি সিন্ধীকে আজকের আকাশ সংস্কৃতির যুগে এবং বিশেষ ভাবে মুক্ত বাজারের দিনে আধুনিক ঐতিহাসিকরা কীরূপ দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখবেন? অধ্যাপক কার ক্রোচের সাথে সুর মিলিয়ে বলেন যে, ঐতিহাসিক তার আপন যুগের চিন্তা ভাবনার নিরিখে এবং নিজের চোখ ও মন দিয়ে দেখবেন।[১] প্রসংগত কার আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি মনে করেন কোন ব্যক্তির ইতিহাস রচনা করতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে ব্যক্তিটি কতটুকু ব্যক্তিসত্তা, আর কতটুকু সামাজিক সত্তা।

"খ"

মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আর একটি অতি জরুরী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ইতিহাস বোধের সমৃদ্ধি ঘটাতে হলে, সর্বপ্রথম যে কাজটি করা দরকার তা হলো আমাদের দেশে ইতিহাস অনুশীলনের গতানুগতিক পথ এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করা- অথচ এটা হবে সৃষ্টিশীল এবং গঠনমূলক। ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে যে পথ পরিক্রম করা হয় - নানা ঐতিহাসিক বাস্তব অবস্থায় সেদিনের মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক নেতা মুসলমান অভিজাত শ্রেণী তৎকালীন কতিপয় হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাদের সাথে এক রকম পাল্লা দিয়েই ইতিহাস বিকৃতির পথ ধরেন। ভুল্লে চলবে না এর নেপথ্যে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। তাই তারা ঘটনা প্রবাহের শিকার। এতে সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ইতিহাস বিজ্ঞান। যা সংঘটিত হয়েছে তা উল্টানোর কোন প্রয়োজন নেই, তবে যে অবস্থার প্রেক্ষিতে তা সংঘটিত হয়েছিল - সে অবস্থা না থাকায় ঐতিহাসিক চিন্তনের বস্তু নিষ্ঠতার পথ গ্রহণ করা যাবেনা কেন? এতে উপমহাদেশের অসংখ্য ভাবী সমস্যার পথ মসৃণ হতে পারে এবং ভবিষ্যৎ শুভতর হতে পারে; ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতা সর্বদা ভবিষ্যতেই নিহিত থাকে।

প্রাসঙ্গিক ভাবে ভেবে দেখতে হবে ইতিহাসের সাথে ধর্মের সম্পর্কের স্বরূপ কী? ইতিহাস মানব সমাজের বিকাশ ধারা এবং যাবতীয় মানবীয় ইহলৌকিক কর্মকান্ডের দলীল; তার উত্থান পতন, তার জয় পরাজয়, তার উন্নতি অবনতি অর্থাৎ তার পার্থিব জীবনের সব কিছুয়ই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এরূপ ইতিহাসের ধারণার সাথে ধর্মীয় চেতনার সংশ্লিষ্টতার প্রশ্ন কি অবান্তর নয়? মানুষের ইহলৌকিক কর্ম-কান্ডের ব্যাখ্যার নিরন্তর অতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রয়োজন বা ঐশী শক্তির উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা দিয়ে বাস্তব জীবনের বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে বস্তুগত জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বার একেবারে রূদ্ধ হয়ে পড়ে নাকি?

প্রসঙ্গাগত উল্লেখ্য যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে যেমন ইতিহাস অনুশীলন সম্ভব নয়, তেমনি একইভাবে ইতিহাস কোনক্রমেই ধর্মকে উপক্ষো করে চলতে পারে না। ইতিহাস যেহেতু মানব কর্মকান্ডের দলিল তাই স্বাভ্যাবিকভাবে ধর্ম এক পর্যায়ে ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। প্রকৃতি পরিবেশ পাঠ করতে তাকে এমন একটা পরিস্থিতির অধ্যায়ন করতে হয়, যখন মানব সমাজে ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে, এবং কি পরিবেশে তার বিকাশ ঘটে মানব সভ্যতার বিকাশে এর কোন অবদান আছে কিনা, এবং কখন ও কীভাবে তা মানব সমাজের অগ্রগতিতে

Dhaka University Institutional Repository

সক্রিয় হয় অথবা কখন বাধা হয় – এসব বিষয়ের উপর গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তাই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, ধর্মকে বর্জন করে নয়, বরং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন করেই ইতিহাস চর্চার দর্শন হিসাবে তা বর্জন করতে হয়। ঐতিহাসিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় এক পর্যায়ে ধর্মকে গণ জীবনের ইতিহাস আলোচনা হতে মুক্ত হয়ে ইতিহাসকে *ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। দাস তন্ত্রের বিরুদ্ধে* খ্রিস্টানদের বিদ্রোহ, মক্কার সামাজিক বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ইসলামের যে বিদ্রোহ প্রথমে দেখা দেয় এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে হলেও সমাজের অগ্রগতি দান করে এবং যা ঐতিহ্যে পরিণত হয়– তার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করতে হয়। ধর্ম যখন কায়েমী স্বার্থে প্রয়োগ করা হয় তখন তার আর প্রগতিশীল ভূমিকা থাকে না বরং তা চরম প্রতিক্রিয়া মূলক হতে পারে।[২]

"গ"

প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, পলাশীর মর্মবস্তুতে নিহিত ছিল অপূর্ব নয়া যুগের আগমন বার্তা – যার রূপ কাঠামোর বাস্তবতা ছিল ভবিষ্যতের বুকে এবং এটা হল এক নয়া অর্থনীতির অর্থাৎ মার্কানটাইলিজম যা বিশ্ব সভ্যতার বিকাশের বিশেষ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে।

পলাশীর পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশ বারবার বহিঃশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল ও পরাজিত হয়েছিল – এবং তাদের আগমন হয় স্থলপথে এবং তারা বলিয়ান ছিল প্রধানত অশ্বশক্তিতে। অষ্টাদশ শতকের ঘটনার নায়ক ছিল ইউরোপীয়রা – তারা এসেছিল জল পথ ধরে এবং তাদের প্রধান শক্তি ছিল নৌশক্তি এবং এ নৌশক্তি বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। উক্ত বহিঃশক্তি গুলোর পথের ও শক্তি কাঠামোর ভিন্নতাই নির্দেশ করেছিল ভাবী যুগের ঐতিহাসিক গতি ও প্রকৃতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিজয়ী শক্তিদের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল দেশ বিজয়ের মাধ্যমে আলেকজান্ডারদের পক্ষে দাসশ্রম সংগ্রহ – তারপর অন্যসব পাওনা। মধ্যযুগ তথা সামন্ত তন্ত্রী যুগে বিজয়ী শক্তির প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজ্য গঠন করে পরাভূত দেশের ভূসম্পত্তির উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে রাজস্বের পাহাড় সৃষ্টি করা এবং তাজমহল–ময়ুর সিংহাসনের বিলাসিতা উপভোগ করা, তারপর অন্যান্য প্রাপ্যের হিসাব। ইতিহাস এই মৌলিক কাল বিভাজন এবং প্রত্যেক ঐতিহাসিক কালের মূল্যবোধ অনুধাবনের মধ্যে ইতিহাসবোধ নির্ভর করে।[৩]

সতের শতকে ইউরোপীয়দের প্রাচ্যদেশে আগমন হয় মুখ্যত বাণিজ্যিক স্বার্থে, তাদের বাণিজ্যিক পুঁজির বিকাশের সাথে এবং এই বাণিজ্যিক পুঁজির স্বার্থে প্রয়োজন হল উপনিবেশ গঠন করা। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতায় পূর্বের দিগ্বিজয়ীদের মধ্যে উদ্বাস্ত মনোভঙ্গি দেখা গেলেও তাদের মধ্যে প্রধানত স্থায়ী অভিবাসী মনোভঙ্গি ছিল প্রবল, মুখ্য। কিন্তু ইউরোপীয়দের মধ্যে উদ্বাস্ত মনোভঙ্গিই ছিল মুখ্য। বিজিত দেশকে অর্থনৈতিক শোষণ দ্বারা স্বদেশকে সমৃদ্ধ করাই ছিল তাদের স্থির মূল লক্ষ্য। এই দু'যুগের দুটি প্রধান মূল্যাবোধ সম্পর্কে সচেতনতাই হল আধুনিক ইতিহাস অনুশীলনের প্রথম সবক।

আধুনিক ইউরোপে এরূপ মনোভঙ্গি উদ্ভাবনের রহস্য কী? এ রহস্য উদঘাটিত করতে হবে তাদের আর্থ–সামাজিক পরিবর্তনের ধারার মধ্যে। এই পদ্ধতি হল আজকের ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

চর্চার একমাত্র পথ। সনাতন ও মধ্যযুগে আরব তুর্কী জাতির চাপের মুখে ইউরোপ মরিয়া হয়ে মুক্তির পথের সন্ধানে ছিল। আরবদের দখলে ছিল সিসিলি, ভূমধ্যসাগর ও গ্রিস; এবং পূর্ব ইউরোপ ব্যাপক অঞ্চল তুর্কীদের করতলগত হয়। ভূমধ্যসাগর তুর্কীদ্বীপে পরিণত হয়।[৪] এরূপ অবস্থায় ইউরোপের জাতীয় মুক্তির দুটি ধারা প্রবাহিত হয়। প্রথম ধারার প্রথম প্রকাশ ঘটে ব্যার্থ ক্রুসেডে। *পরবর্তী কালে সাফল্যের সাথে ক্রুসেডীয় মনোভঙ্গির পুনারাবৃত্তি ঘটে স্পেনীয়-পর্তুগীজদের মধ্যে।*[৫] তারা সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করে আরবদের কবল হতে আইবেরীয় উপদ্বীপের স্বাধীনতা অর্জন করে। তারা নতুন সামরিক কৌশল আয়ত্ব করে; নৌশক্তিতে বলিয়ান হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভৌগলিক আবিষক্রিয়ায় নেতৃত্ব প্রদান করে; প্রাচ্যের সম্পদ আহরণের জন্য প্রাচ্য দেশে পর্তুগীজরা উপনিবেশ গঠনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে; ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে স্পেন আত্মপ্রকাশ করে, তাদের প্রেরণার উৎস ছিল ক্যাথলিক ধর্ম।[৬] অবশ্য তাদের চিন্তা চেতনায় কখনও অভিনবত্ব ছিলনা। তারা ছিল পুনরত্থানবাদী শক্তি। তাই তাদের প্রাধান্য স্থায়ী হয়নি।

ইউরোপে অন্য শক্তির উদ্ভবের ফলে স্পেন ইউরোপীয় ইতিহাসের রঙ্গা মঞ্চ হতে দ্রুত বিদায় গ্রহণ করে। সেই সাথে ইউরোপ হতে পশ্চাদমুখী ঐতিহ্য বাদী চেতনার পরিসমাপ্তি ঘটে। আধুনিক ইউরোপের মুক্তির দ্বিতীয় ধারার নেতৃত্ব দেয় ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড। এই পথে তাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মৌলিক রূপান্তর ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর হতে ইউরোপে এক নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিকশিত হলে ইউরোপে সামন্ততন্ত্র একটি বিশেষরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এবং স্বাভাবিকভাবে সমগ্র ইউরোপে একটি সুনির্দিষ্ট জীবন বোধ গড়ে ওঠে। সামন্ততন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিরোধের বিকাশের ফলে তার অবক্ষয় দেখা দেয়। সামন্ততন্ত্রের গর্ভে জন্ম নেয় বণিকতন্ত্র। বণিক তন্ত্রের প্রথম জয়যাত্রার সূচনা হয় ইতালির জেনোয়া, পিসা, ভেনিস ইত্যাদি স্বাধীন নগর রাষ্ট্রে। ইউরোপীয় মূল ভূখন্ডে বণিক পুঁজির সঞ্চালন হয় হ্যানসিয়াটিক লীগে, শিল্পী ও বণিকদের গিল্ড প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। শহুরে সম্পত্তির সম্পর্ক হতে উদ্ভুত ধারনার সাথে গড়ে ওঠে এক নতুন মূল্যবোধ। নয়া অগ্রগামী সামাজিক শক্তি বণিক শ্রেণীর বিকাশের প্রচন্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিষ্ঠিত সামন্ত মূল্যবোধ। ঐ বাধা অপসারণের জন্য ইউরোপীয় মানস পটে বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং সূচনা হয় রেনেসাঁস আন্দোলন।[৭] এই রেনেসাঁস আন্দোলন হতে যে জীবন জিজ্ঞাসার উদ্ভব তাই ছিল তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। এর পরিণতিতে ইউরোপীয় মানস পরিমন্ডল হতে সামন্ততন্ত্রের সৃষ্ট ধর্মীয় কুসংস্কার অনেকাংশে দূরিভূত হয়। তাদের মধ্যে ইহলৌকিক চেতনায় এক নতুন ব্যঞ্জনা আসে। তাদের উন্নত চেতনা ছিল তাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির মাপকাঠি। তাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সাথে জীবন যাত্রার নয়া চাহিদা বৃদ্ধি পায়; সুস্বাদু খাদ্য, ঔষধ, পচনশীল প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংরক্ষণের তাগিদে প্রাচ্য মসলা ও প্রাচ্যের বিলাস দ্রব্যের চাহিদা ইউরোপের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। আরবদের সংস্পর্শে এসে ইতালির বণিক সমাজ ইতোপূর্বে প্রাচ্যের প্রাচুর্য সম্পর্কে সচেতন হয়, তদুপরি সমগ্র ইউরোপ তাদের পর্যটকদের নিকট হতে প্রাচ্য বিলাস দ্রব্যের সন্ধান পায়; কিন্তু প্রাচ্যের সাথে সরাসরি যোগাযোগের বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় উসমানী সাম্রাজ্য। এ কারণে উদীয়মান ইউরোপ ভূমধ্যসাগর হতে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে তাদের দৃষ্টি ফেরায়। তারা আরবদের নিকট

Dhaka University Institutional Repository

হতে প্রাপ্য দিক দর্শন যন্ত্রের ব্যবহার আয়ত্ব করে। উন্নত মানের জাহাজ নির্মান কৌশল এবং লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহারে মনোযোগী হয়। তারা দ্রুত ভৌগলিক আবিস্কিয়ার আন্দোলন শুরু করে। এসব অভূতপূর্ব ঘটনার ফলে সূচনা হয় সতের শতকের বিশ্ব বাণিজ্যতন্ত্র ও বিশ্ব বাণিজ্যবিপ্লব। বণিকতন্ত্রের বিকাশের সাথে ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক বিরোধ নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। ইউরোপে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং স্বাধীন কৃষক সমাজের অভ্যুদয়ে ইউরোপের অভ্যন্তরে বাণিজ্যতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে ও কুটির শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ, মুদ্রা অর্থনীতির ব্যাপক প্রচলন এবং পণ্য উৎপাদনের যথেষ্ট অগ্রগতি হতে বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রচন্ড গতিবেগ সৃষ্টি করে; পুনশ্চ তেজী বৈদেশিক বাণিজ্য ইউরোপীয় সমাজ বিকাশ ধারা প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। পুরনো সামজে প্রচন্ড অবক্ষয় দেখা দেয়; নয়া পথে সমাজ সংগঠন, অর্থনৈতিক রাজনৈকি ক্ষেত্রে নয়া প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। আগেকার আন্তঃ ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে নয়া বাণিজ্যিক ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিকাশ ঘটে। এভাবে এক নয়াযুগের প্রারম্ভ। বস্তুত সতের শতাব্দী হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয় ইতিহাস এক নাগাড় বৈষয়িক ও মানসিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সচল থাকায় ইউরোপীয় আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে; এই পর্যায়ে ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের চূড়ান্ত অবক্ষয় – বাণিজ্যতন্ত্রের উদ্ভব এবং বিশ্ববাণিজ্য বিপ্লব সম্পন্ন হয়।

"ঘ"

ইউরোপীয় সমাজ সমূহে উল্লেখিত প্রগতিশীল রূপান্তর চলাকালে প্রাচ্যদেশে কেন্দ্রিভূত বিশাল উসমানী স্বৈরতন্ত্রে আরম্ভ হয় অবক্ষয়ের পালা, মহামতি সুলাইমানের মৃত্যুর পর হতে উসমানী সাম্রাজ্যে সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সামরিক দুর্বলতা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইউরোপীয় আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের সাথে উসমানী সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের কি কোন যোগ সূত্র লক্ষ্য করা যায়? বস্তবাদী ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অনুসারে যে কোন বস্তুর রূপান্তরে তার অভ্যন্তরীণ কারণ যা মৌলিক ও মুখ্য; তবে বাহ্যিক কারণ তার বিকাশের শক্তি হিসেবে কাজ করে। তাই উসমানী সাম্রাজ্যের বাস্তব অবস্থায় রূপান্তরের বিষয় ইউরোপীয় ঐতিহাসিক গতিধারা যদি বহিঃ কারণ হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।[৮] একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় সমসাময়িক ইউরোপে আর্থ-সামাজিক বিপ্লবের কয়েকটি সাধারণ ফল- উসমানী সাম্রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমত, আলচ্য সময় থেকে বিশ্ব-ইতিহাসে নৌশক্তি নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়। নৌশক্তির সাথে বাণিজ্যিক শক্তি ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্ব বাণিজ্যের নব দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার সাথে প্রাচীন বাণিজ্য পথ ভূমধ্যসাগর হতে আটলান্টিক মহাসাগরে স্থানান্তর হয়। বাণিজ্য পথের এরূপ পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ভাবে উসমানী অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলে। দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় বাণিজ্য পুঁজির সাথে সদ্য প্রাপ্ত আমেরিকার স্বর্ণ-রৌপ্য জোয়ার উসমানী সাম্রাজ্যের গভীরে প্রবেশ করে; ফলে সাম্রাজ্যের প্রচন্ড মুদ্রাস্ফিতি, দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি এবং এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। তৃতীয়ত, ইউরোপীয় সমাজ বিপ্লবের ফলে তার রণনীতি ও রণকৌশলে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। যুদ্ধের সাথে নয়া প্রযুক্তি সংযুক্ত হয়, যুদ্ধ হয়ে ওঠে ব্যয় বহুল এবং কৃতবিদ্যার কসরত। নয়া পরিস্থিতিতে উসমানী অশ্বারোহী সিপাহীরা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিদিন অকেজো হয়ে পড়ে। চতুর্থত, উসমানী সাম্রাজ্যে ইউরোপীয় বণিক পুঁজির অনুপ্রবেশ ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ফলে আনাতোলিয়ার অনাবাদী ভূমি নিঃশেষ হয়।[৯] অধ্যাপক ক্যাডি আর একটি গুরুতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে পর্তুগীজদের হাতে ভারতীয় কালিকট বন্দরের পতন ঘটলেই উসমানী সাম্রাজ্যের প্রাচ্য বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হলে তার অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের গতি বৃদ্ধি করে।

এসময় হতে ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদেরকে সুলাইমান প্রদত্ত নানাবিধ বাণিজ্যিক সুবিধার বিষবৃক্ষ গজাতে থাকে এবং ইউরোপের সাথে উসমানী বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিবিড় হতে থাকে।[১০] এর ফলে উসমানী সাম্রাজ্য আর্থ-সামাজিক সংকট তীব্র হতে তীব্রতর হয়। এ অবক্ষয় উসমানী সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং তা তৎকালীন মুসলিম দেশ সমূহের সর্বত্রই ক্রিয়াশীল ছিল। অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় মোগল সাম্রাজের চরম পরিণতিতে ১৭৫৭ সালে পলাশীর ঘটনা ঘটে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এবং বিশেষ করে তার অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস তৎকালীন বিশ্ব সভ্যতার প্রেক্ষাপটে অনুশীলন না করে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোন হতে বিশ্লেষণ করলে ইতিহাস বিকৃত হতে বাধ্য। চটকদার কথার আড়ালে থাকবে পাক ইডিওলজি মার খাবে আর্থ-সামাজিক ভৌগলিক বিশ্লেষণ। ১৯৬৩ সালে ওয়াশিংটন ডি.সি হতে প্রকাশিত হাফিজ মালিক বিরচিত Moslem Nationalism in India & Pakistan গ্রন্থটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে এ গ্রন্থের স্বরূপ এর অন্তর্নিহিত বিরোধ। এর অনৈতিহাসিক approach কোন ব্যক্তির নিকট ধরা পড়বে। Hans Kohn উক্ত বইয়ের ভূমিকায় দুটি তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করেছেন।

নয়াযুগের পতাকা নিয়ে ইউরোপ প্রাচ্যের দেশে দেশে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে। মুসলিম বিশ্বের সংকট প্রতিদিন ঘনিভূত হলেও তার কি কোন প্রতিক্রিয়ার আশা করা যায়নি? তৎকালীন অষ্টাদশ শতকে মুসলিম বিশ্বের দু'প্রান্ত হতে একই ধরণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের মাতৃভূমি আরবের পশ্চাদপদ নজদ প্রদেশ হতে উসমানী সাম্রাজ্যের প্রতি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ এসেছিল। এ চ্যালেঞ্জ এসেছিল সনাতন ধর্মীয় শিক্ষার সুপন্ডিত মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াবের নিকট হতে। তিনি (১৭০৩-১৭৯২) ইহলোক ত্যাগ করার পূর্বে উসমানী সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং সর্বত্রই তাঁর চোখে উদ্ভাসিত হয় সাম্রাজ্যের প্রচন্ড অবক্ষয়ের চিত্র, চরম দারিদ্রতা, সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা। তার এই ভ্রমনের কিছুদিন পর জনৈক উসমানী বুদ্ধিজীবী জিয়া পাশাও উসমানী সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করে একই চিত্র দেখে এক মর্মস্পর্শী বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। জিয়া পাশা ইউরোপ ভ্রমণ করে এসময় লক্ষ্য করেন; নতুন প্রাণ চাঞ্চল্য, অকল্পনীয় মানব জীবনের স্বাচ্ছন্দ। অবশ্য তিনি স্বদেশের অবস্থার প্রতিকারের বিষয় আলোচনা করেননি।

ইবনে ওয়াহাব উদীয়মান ইউরোপ ভ্রমনের সুযোগ পাননি। ফলে উভয় দেশের জীবন ধারার উপর কোন তুলনামূলক পর্যালোচনারও সুযোগ তাঁর ছিল না। সনাতনী শিক্ষায় পারদর্শী, ধর্মে নিবেদিত প্রাণ পন্ডিত হিসেবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অমুসলমানদের নিকট হতে তেমন

 Dhaka University Institutional Repository

কিছু শেখার নেই। তিনি কোরআন ও সুন্নতের আলোকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবনতির কারণ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, মুসলমানরা ইসলামের মৌল নীতি হতে বহু দুরে অবস্থান করে কুসংস্কারচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় তাদের উপর খোদাই গজব পড়েছে, তারা পীর, কবর পূজারী রহস্যবাদী সুফীবাদের নিষ্ক্রিয়তার শিকারে পরিণত হচ্ছে। তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে সকল *নামধারী মুসলীম জনগণকে মৌল ইসলামে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান। তার বিশ্বাস ছিল মূল* ইসলামের রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তাদের পার্থিব দুরবস্থার অবসান ঘটবে ও আল্লার গজব হতে মুক্তি পাবে। খোলাফায়ে রাশেদীনই হবে তাদের সামাজিক জীবনে সঠিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় প্রাথমিক যুগের জিহাদ সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অনুসরণ করতে হবে এবং দ্বিতীয় জাহেলিয়া যুগের অবসান ঘটাতে হবে।[১১]

ঐতিহাসিক বিচারে ওহাবী আন্দোলন ছিল পুনরুজ্জীবন বাদী (Revivalist)। এ আন্দোলনে ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ছিল প্রচন্ড এবং সংস্কারের উদ্দেশ্য– নয়া *পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো নয়। সকল ধরনের নতুনত্ব বা বিদায়াৎ অস্বীকার করে* ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের জীবন প্রত্যাবর্তন করা। ঐতিহাসিক ইসলামে কি এসব কথার কোন সঠিক প্রমাণ আছে? তা হলে মহানবীর মহাপ্রয়ানের পর হতে তথাকথিত মডেল সমাজে এত সমস্যা কেন? তারাও কি ধর্ম পরিহার করেছিলেন? এসব অতিকথন বই কিছু নয় – এগুলো ঠিক ইসলামের পর্যায়ে পড়ে না।

১. নয়া যুগের নয়া ঐতিহাসিক চিন্তনের উদ্ভব বিকাশ ও প্রাচ্য দেশে এর প্রতিক্রিয়াঃ

ভারতীয় উপমহাদেশের একদা মহাশক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্য আঠার শতকে কেবল মহা অবক্ষয়ের কবলে নিপতিত হয়; অথবা বিচ্ছিন্নতা ও পতনের দিকে দ্রুত ধাবমান হয় বল্লে সম্ভবত বিশ্বপরিসরে তৎকালীন ঐ উপমহাদেশের ইতিহাসের বাস্তব অবস্থার পুরোপুরি উপস্থাপন হয়না। তৎকালীন ভারতীয় ঘটনা প্রবাহ নতুন নতুন উপাদানে পরিপুষ্ট হয়ে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, আধুনিক ঐতিহাসিকদের অন্তদৃষ্টি সেদিকে উৎক্ষেপন না করে কি কোন বিকল্প পথ থাকতে পারে? ইতো পূর্বেই উল্লিখিত ঘটনার রেশ ধরে কি বলা যায় যে, ষোড়শ–সতের শতকেই বিশ্ব পরিসরে যে নয়া ঐতিহাসিক প্রবণতা লক্ষনীয় হয়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতকে তা প্রবল হতে প্রবলতর রূপে ভারতীয় ঘটনা প্রবাহের উপর আছড়ে পড়ছিল। এই বাস্তবতা উপেক্ষা করে এদেশের ব্যক্তি, জাতি, সংস্কৃতির ইতিহাসের উপর আলোকপাত করা কি সঠিক পথ? বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ষোড়শ শতক হতে অষ্টাদশ শতকের সেই ঐতিহাসিক প্রবণতাটা কী? তাহল প্রচন্ড ক্ষয়িষ্ণু ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের কি যাদুঘরে ঠাইনেয়ার দিন সমাগত? এবং তদস্থলে বিশ্বপরিসরে উদীয়মান বণিক তান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কি গৃহীত হবে? এটাই ছিল সেদিনের মূল ঐতিহাসিক প্রশ্ন। অষ্টাদশ শতকে কোন দেশ ও জাতীকে কেবল ক্ষুদ্র ভৌগলিক বা সংস্কৃতির গন্ডিতে সীমাবন্ধ করে বুঝার দিন কি প্রায় শেষ হয়ে আসেনি? বিশ্ব সভার কোন ঘটনা বিভিন্ন দেশের ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করছিল – সেটা কি আর উপেক্ষা করা ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব? কিন্তু বিশ শতকেও এই উপমহাদেশে সেই অসম্ভব কাজে হাত

Dhaka University Institutional Repository

বাড়িয়েছেন পাকিস্তানী মতাদর্শে দিক্ষিত ঐতিহাসিকরা। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট উপেক্ষা করে উনিশ শতকের ঘটনা প্রবাহ উপস্থাপন না করে সংকীর্ণ সনাতনী ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পটভূমি রচনা করার কৌশল অবলম্বন করে হাফিজ মালিক বিরচিত ১৯৬৩ সালে ওয়াশিংটন হতে প্রকাশিত Moslem Nationalism in India and Pakistan গ্রন্থটি এরূপ ইতিহাস রচনার একটি মডেল হিসেবেই গণ্য। এতে সমকালের ইতিহাস চিন্তনের কোন উপাদান নেই।

১৭৫৭ সালের পলাশীর ঘটনা কোন আকস্মিক অনাকাঙ্খিত, অনৈতিহাসিক বা স্বতঃস্ফূর্ত মামুলী ঘটনা ছিল না। অথবা কতিপয় স্বার্থানেষীদের তাৎক্ষণিক ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি নয়, বরং ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার সতের শতকের শেষ পাদে হুগলী নদীর তীরে কৌশলপূর্ণ স্থানে কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠা করার পর হতে তাদের শক্তি ভিত্তি তৈরী করতে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল তারই বাস্তব রূপ নেয় ১৭৫৭ সালে পলাশীতে।[১২] এর তাৎক্ষণিক ফল হল সুবেহ বাঙালা কেবল কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়নি, বিদেশে বিভূঞে তাঁদের লালিত স্বপ্ন বাণিজ্যিক রাষ্ট্র গঠনের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এর মধ্যে নিহিত ছিল এর সুদূর প্রসারী তাৎপর্য-এর স্বার্থকতা এবং সমগ্র উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ।

কোম্পানীর তাৎক্ষণিক প্রধান কাজ কি ছিল? পলাশীর পর কোম্পানী কেবল বাংলার অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক এবং রাজনীতিতে প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠা করেনি; বরং বহি বিশ্বের বিভিন্ন জনতা ও জাতির সাথে বাংলার সম্পর্ক নির্ধারণ করে নেয়। ১৭৫৭ সালেই নবপ্রতিষ্ঠিত নবাবের নিকট ডাচ কোম্পানী ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করলে কোম্পানী তাদেরকে বিদারা যুদ্ধে পরাজিত করে ডাচদের উপর এক সন্ধি চাপিয়ে দিয়ে ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে হটিয়ে দিয়ে বাংলার অর্থনীতিতে ইংরেজ কোম্পানীর একাচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এর পূর্বেই যে আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী, ফরাসী কোম্পানী বাংলা হতে বিতাড়িত হয়। ১৭৬৫ সালে মোগল সম্রাট, অযোধ্যার নবাব এবং বাংলার মীর কাসেম-এর ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের ধ্বংস স্তুপে কুখ্যাত ইলাহাবাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে মোগল সাম্রাজ্যও কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।[১৩]

১৭৯৯ সালে মহিশূরের টিপু সুলতানের নিহত হওয়ার পর ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি বাস্তবে কি আর রইল? হায়দারাবাদ মূলত ইংরেজ রেসিডেন্ট কর্তৃতে সু-নিয়ন্ত্রিত। এর পরও অবশ্য মারাঠারা কোম্পানীর অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠলে দিল্লীর মারাঠা যুদ্ধের (১৮০৩-১৮০৫) মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য সকল প্রতিরোধ শক্তি নির্মুলিত হয়। বস্তুত ১৮০৩ সালে দিল্লী যুদ্ধে গোয়ালিয়রের পরাজয়ই ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহৎ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। উনিশ শতকের উষালগ্নে কলকাতা হতে দিল্লী পর্যন্ত কোম্পানী একমাত্র পরাক্রমশালী রাজনৈতিক শক্তি।[১৪] ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে রনজিত সিং (১৭৮০-১৮৩৯) কোম্পানীর সাথে শান্তি চুক্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।[১৫] প্রসঙ্গত পুনশ্চ উল্লেখ্য ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় উপমহাদেশে এক বাণিজ্যতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তলন করে ভারতীয় মোগল সামন্ততন্ত্রের সন্ধ্যা কাল হয়ে ওঠে প্রত্যাসন্ন। এই বাস্তব অবস্থা সরকারি স্বীকৃত না হলে উনিশ শতকের প্রথম হতে ভরতীয় ঘটনা প্রবাহের গতি প্রকৃতি, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং সঠিক মূল্যায়ন হবে অসম্ভব। তাই বড় প্রশ্ন: ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস অনুশীলনের সঠিক পথ কি আছে? ব্রিটিশ ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস কি ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের ছায়া না? কোম্পানীর সাথে এদেশের সম্পর্কের প্রকৃতি ও রাষ্ট্রীয় চরিত্র বিশ্লেষণে সাধারণত গতানুগতিক পন্থাই অবলম্বন করা হয়। অথচ কোম্পানীর কার্যকলাপ, রীতিনীতি তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য না হলে কোম্পানীর এদেশের রণনীতি ও রণকৌশলের প্রকৃতিই অস্পষ্ট থেকে যায়।[১৬]

১৭৫৭-১৮৫৭ এই একশ বছরের কাল বিভাগ বাংলা তথা ইংল্যান্ডের ইতিহাসে বিশেষ স্বাতন্ত্রের নির্দেশ করে। পলাশী উত্তর বাংলা বিশ্ব বাণিজ্যতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষার লেবরেটরিতে পরিণত হয়। এই ঐতিহাসিক কালে কোম্পানীর বঙ্গ ভারত প্রশাসনে পরপর তিনটি রণনীতি ও রণকৌশল স্থিরিকৃত হয় এবং এর সাফল্য ছিল আশা ব্যঞ্জক এবং ফলপ্রসূ। আঠার ও উনিশ শতক ধরে বিলেতের ইতিহাসে তিনটি আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক স্তর পেরিয়ে বিশ শতকে প্রবেশ করে; প্রথমত, একচেটিয়া বণিক পূঁজি উদ্ভব-বিকাশ, দ্বিতীয়ত, শিল্প পুঁজি উন্মেষ ও অবাধ বাণিজ্যের প্রশ্ন; তৃতীয়ত, শিল্পপুঁজির লগ্নি পুঁজির উন্নয়ন।[১৭] এর প্রতিটি স্তরে বিলেতে আর্থ-রাজনীতিতে যে বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে তা নয়, তারই প্রভাব প্রক্রিয়া ছায়াপাত করে এবং উল্লেখ্য নীতি পর্যায়ক্রমে অবলম্বন করা হয়। কি ভুল বুঝিলিরে রাম? বিলেতের বণিকপুঁজির বিকাশের স্বার্থেই পলাশী সংঘটিত হয়। তবে পলাশী উত্তরকালে ক্লাইভ প্রজন্মে অবাধ লুন্ঠন, দুর্নীতি ও ব্যবসা সামর্থবোধক হয়ে পড়ে। এর পরিণতিতে ছিয়াত্তরের মহা মনন্তর, অগনিত প্রাণ হানী তদুপরি অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার ভয়াবহতা সম্পর্কে বিলেতের কমন্স সভায় ওয়াল পোলের মন্তব্য খুবই তাপর্যপূর্ণ ও প্রনিধানযোগ্য। এরূপ অবস্থার পরিণতির কথা ভেবে কোম্পানী পরিচালনা মন্ডলী ও সরকারের সম্বিত ফেরে। তাদের লুন্ঠনের সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্ত দিয়েই হামজা আলাভী[১৮] কোম্পানী বাংলার অর্থনৈতিক নিষ্কাশন থিসিস খাড়া করেছেন। রজনী পামদত্ত এ সাথে এটাও উল্লেখ করেন যে, ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লব পরবর্তী প্রায় একশ বছর ইংল্যান্ডে কৃষি ও শিল্প বিপ্লব সূচনা না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে একচেটিয়া বণিক শ্রেণীতন্ত্রী ধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত ছিল এবং ইংল্যান্ডের কৃষি অর্থনীতির প্রাধান্য থাকলেও সর্বত্র বিশ্ব বাণিজ্যের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। স্বদেশে পশমি ও বস্ত্র শিল্পের জাতীয় গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।[১৯] ইংল্যান্ডের এরূপ আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনশীল অবস্থায় কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের বিরুদ্ধে অবাধ বাণিজ্যনীতির দাবি জোরদার হয়। বাংলাকে রপ্তানীকারক দেশ হতে আমদানি কারক দেশে পরিণত করার নীতি ইংল্যান্ডের জাতীয়নীতিতে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে এটা তৎকালীন ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ হুইগ-টোরী পার্টিদ্বয়ের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বহিঃপ্রকাশ ছিল না বরং তৎকালীন ইংল্যান্ডে এটা ছিল প্রতিষ্ঠিত বণিক পুঁজির সাথে উদীয়মান শিল্প পুঁজির মধ্যকার এক নব দ্বন্দ্বের প্রকাশ মাত্র। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে আঠার শতকের মাঝামাঝি ইংল্যান্ডের সমাজ বিপ্লব সংঘটন নির্ভর করছিল তাদের উৎপাদন পদ্ধতিতে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার উপর; আর তাদের শিল্প বিপ্লবের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পুঁজি যোগানে আমেরিকান অথবা আফ্রিকার সম্পদ আদৌ যথেষ্ট ছিল না। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড তাদের অর্থায়নে ব্যর্থ হয়। পলাশীর ঘটনার পর তাদের অর্থায়ন সমস্যার সমাধান হয়। বাংলার লুন্ঠিত অর্থই ব্রিটিশ শিল্প বিপ্লবের সাফল্যের মূলে ছিল।[২০] যদিও পলাশীর মূল লক্ষ্য ছিল বণিক পুঁজির বিকাশ; কিন্তু বাস্তবে এ কাজ করতে গিয়ে

 Dhaka University Institutional Repository

কোম্পানীর শাসনে একটি মূল প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্ন হল বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজ ব্যাবস্থার সাথে ইংল্যান্ডে কয়েক শতাব্দী ধরে যে বাণিজ্যিক বিধি বিধান বিকশিত হয়, তার সাথে পলাশী উত্তর বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার খাপ খাওয়ানো যায় কিভাবে? তাই বাংলায় ব্রিটিশ বণিক পুঁজির বিকাশের স্বার্থে এদেশের সনাতন স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের *ধ্বংসের জন্য ক) ব্যক্তি মালিকানার ভিত্তিতে ভূমীনীতি গ্রহণ, খ) মুদ্রা খাজনার ব্যাপক প্রচলন* করা।[২১] বিদেশী স্বার্থে ও বিদেশী শক্তি কর্তৃক দেশের বাস্তব ভিত্তিক এরূপ পরিবর্তনে এদেশের অগ্রগামী সমাজ তাই বারবার ভাব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দীর্ঘদিন ধরে এদেশের স্বকীয় সত্তা বিকশিত হওয়ার সুযোগ মিলেনি; তাই এর বিকাশ ধারা অস্বাভাবিক, অস্বচ্ছ এবং কখন এতে ছন্দপত্তনও পরিলক্ষিত হয়। এরূপ বিকাশমান বাস্তবতায় হেস্টিংস কোম্পানীর প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ করে এবং বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক নীতির রণ কৌশল ও সংস্কৃতিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন – যা সমগ্র উনিশ শতক ধরে বঙ্গীয় মানস পরিবর্তনে এত দৃঢ় হয় যে, কেউ ঐ বৃত্ত হতে বের হতে পারেননি। তদুপরি প্রাচ্যবিদদের ঐতিহাসিক গবেষণায় দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে মারাত্মক কাল বিভাজন চালু হয়, যার পরিণতিতে ইউরোপীয় রেনেসাঁসে প্রগতিশীল ভাবাদর্শের পরিবর্তে পশ্চাৎমুখী পুনরুজ্জীবন বাদ প্রাধান্য লাভ করে এবং Revivalism বঙ্গীয় মানস পটের প্রধান দিকে পরিণত হয়। এ কারণে ইতিহাসবোধ এবং জীবন চর্চায় বঙ্কিম চাটুর্জ্য এবং সৈয়দ আমীর আলীর একই মুদ্রার এপিট ওপিট বৈ কিছু নয়।[২২]

উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে বিলেতে শিল্প বিপ্লবে আরও অগ্রগতি হওয়ায় এবং ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কার সফল হওয়ায় হেস্টিংস কালের শেষ হয়; তবে ইঙ্গ-বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সহযোগিতার নীতির আবেদন আর জোরালো থাকেনি। এসময় পাশ্চত্য শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজন হয় এবং কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার ও ১৮১৩-১৮৩৩ সালের সনদ শিথিল হওয়ায় অনেক বেসরকারী ইংরেজ এদেশের উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত হতে পারছিল না বলে কলকাতায় অনেক ইংরেজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। জর্জ টমসনের প্রচেষ্টায় ইঙ্গ-বঙ্গীয় সহযোগিতার নীতি বাস্তব রূপ নেয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামদুলাল, আশুতোষ দে, মতিলাল শীল, রাম গোপাল ঘোষ ও প্যারিচাঁদ মিত্রসহ তৎকালীন বাংলার অনেক সুসন্তান এ নীতির প্রবক্তা ছিলেন। ১৮৪৭ সালে বাণিজ্য সংকট দেখা দিলে উক্তনীতি অকেজো হয়ে পড়ে। বস্তুত ইংরেজ ব্যাবসায়ীদের দেশীয় বণিকশ্রেণী অংশীদার হওয়ায় স্বাধীন বণিক শ্রেণীতে ওঠতে পারেনি- তাই সমাজ বিকাশে তাদের প্রগতিশীল ভূমিকা দেখা যায় না।[২৩]

কোম্পানী শাসনের পতনের পূর্ব হতে এদেশের ব্রিটিশ শিল্পপুঁজীর অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। এসময় রেল সড়ক নির্মাণ, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা এবং পাটকল স্থাপনের মাধ্যমে আরও এক নতুন যুগের সূচনা হয়। লক্ষ্য করার বিষয়- শিল্প পুঁজির অনুপ্রবেশের সাথে বুর্জোয়া সম্পদ অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতায় ও তার সংরক্ষণ ইত্যাকার নতুন নতুন মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। এদেশে পাশ্চত্য শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা একটি চূড়ান্ত রূপ নেয়। এসময় হতে নতুন উদ্যোগে দ্রুততার সাথে বাংলায় একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে। এরা প্রায় সবাই ভূমিজ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত; এরাই বঙ্গীয় ভদ্রলোক। এদের সবাই হিন্দু সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষ এবং এই সাথে বঙ্গীয় সংস্কৃতি বিনির্মানের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়।[২৪]

১৮৬০– ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত সময় কালকে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল কর্মের স্বর্ণযুগ বলা হয়। ব্রিটিশ প্রাচ্য বিদদের আবিস্কৃত ও প্রাচীন দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য নতুন ভাবে বঙ্গীয় সমাজেও উদ্ভাসিত হয়। (এসময়কে রেনেসাঁস কাল বললে তাঁর মর্মবস্তু বিকৃত হয়)।

বাংলার উক্ত সৃষ্টিশীল যুগে আর একটি নতুন চিন্তার উন্মেষ হয়। ইংরেজ বল প্রয়োগ করে ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা প্রথম আধুনিক অর্থনৈতিক সূত্রকে *ঐ ঐক্যের সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচনায় আনে। কিন্তু তার পশ্চাতে কি কোন দেশীয়* উপাদান ছিল? কেশব সেন ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের দেশীয় উপাদানের তাত্ত্বিক বীজ বপনের প্রয়াস চালান; দুর্ভাগ্যবশত ব্রহ্ম সমাজের অন্তঃদ্বন্দ্বে বঙ্গীয় চেতনার অধিকতর অগ্রগামী সংস্কার সম্ভব হয়নি– যা উনিশ শতকে প্রাচীন কালের অশোকী, মধ্যযুগের ইলিয়াস শাহী, হোসেন শাহী এবং আকবরী চেতনাকে আঠার শতকী ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক রূপ দিয়ে নয়া ভারতের যে সোনালী স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছিলেন তার সলিল সমাধী হয়।[২৫]

বাংলায় এই সৃষ্টিশীল কর্মযুগেই শিক্ষিত ভদ্রলোকের কর্ম সংস্থানের প্রশ্ন প্রকট হয়? তাদের মতামত প্রকাশের বাধা, শিক্ষা সংকোচন আরো কত কিছু আরোপ করা হয়। এছিল আর এক ধরনের বাস্তবতা। কিন্তু ভদ্রলোক সমাজের অগ্রগতির মূলবিষয়টা কি তারা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন? গ্রাম বাঁচলে তাদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হতে পারে – একথা তাদের মাথায় কখনো ঢোকেনি। সম্ভবত তখনো তাদের চিন্তনে ঔপনিবেশিক শক্তির স্বরূপই উদ্ঘাটিত হয়নি। তথাপিও সেদিনের বাংলা সাহিত্য, জাতীয় সংগীত, হিন্দু মেলা, বাংলার জাতীয় নাট্যশালা, 'বঙ্গাদর্শন' এর মধ্যদিয়ে এক ধরণের জাতীয় চেতনার প্রকাশ বেদনা অনুভূত হয়েছিল। তাই এরই এক প্রকাশ রূপ পায় সুরেন্দ্রনাথ বাড়ুজ্যের ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৭৩) এবং শিশির কুমার ঘোষের ভারতীয় লীগ গঠনে। যতই প্রাথমিক পর্যায়ের হোক না কেন এতে যুক্ত হয় বঙ্গীয় চেতনার নবতর বৈশিষ্ট্য। এ ভাবনার অন্তর্ভুক্ত ছিল সর্ব ভারতীয় চেতনা এবং এর বীজমন্ত্র ছিল আর্থ–রাজনৈতিক চিন্তন। এটাই ছিল তৎকালের উচ্চতর বঙ্গীয় চেতনা। এতদিন শিক্ষিত বাঙালীর তথাকথিত নবচেতনা বৃত্তাবদ্ধছিল অমূলক অনৈতিহাসিক হিন্দু জাতীয়তাবাদে। অথচ ঐ সর্ব ভারতীয় চেতনার মূল প্রেরণা ছিল কেশব সেনের অসাম্প্রদায়িক চিন্তনে।[২৬]

পুনশ্চ বলতে হয় যে, ১৭৫৭ হতে ১৮৫৭ এই দীর্ঘ একশ বছর ছিল ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসন আমলে বাংলায় উদীয়মান বিশ্ব বাণিজ্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, বিকাশের নানা স্তরের পরীক্ষা– নিরীক্ষার এবং কোম্পানী শাসনের পতনেরও যুগ। বাংলায়–কোম্পানীর শাসন অভিজ্ঞতা অন্যত্র খুব সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করায় এসময়ের বাংলার আর্থ–সামাজিক বিকাশ ধারা হতে ভারতের বিশেষভাবে উত্তর ভারতে বিকাশ ধারা ভিন্নরূপ ধারণ করে। আর্থ–সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলা হতে উত্তর ভারতের পার্থক্য খুবই লক্ষনীয় হলেও গবেষকরা সাধারণত ঐ পার্থক্যের উপর গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না, তাই না, হান্টার সাহেব খুব সচেতন ভাবেই এ পার্থক্যটি উপেক্ষা করেই কয়েকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনৈতিহাসিক কতকগুলো তথ্য ভাবাবেগময় ভাষার পরিবেশন করে ঐতিহাসিক সত্য বলে চালিয়েছেন।[২৭] ভারতীয় মুসলমানদের পতনের

 Dhaka University Institutional Repository

জন্য সব দোষ হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপিয়েছেন; W.C.Smith তার Modern Islam In Indian গ্রন্থে অবশ্য এ পার্থক্যটি অনুধাবন করেছেন এবং এর ভিন্ন ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।[২৮]

উত্তর ভারতে বঙ্গ ভারতের কোম্পানীর প্রত্যক্ষ শাসন আমল ১৮০৩-১৮৫৭ও একটি তাৎপর্যপূর্ণ যুগ সন্ধিক্ষণকাল। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, ১৭৬৫ সালে ইলাহাবাদ চুক্তি দ্বারা মোগল সম্রাটের দেওয়ানী অধিকার কোম্পানী সরকারের হাতে হস্তান্তর করা হয়। এর ফলে দিল্লী ও বঙ্গো নবাব সরকার কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। এখানে ১৭৯৩ সালের বাংলার ভূমি ব্যবস্থা ভূমি রাজস্ব নীতি এখানে প্রয়োগ না করায় উত্তর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বিকাশ ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। গ্রাম বাংলার কৃষক, কারিগর শ্রেণীর কৃষি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তাঁদের অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত থাকে এবং তাঁদের ঐ অস্তিত্বের সংগ্রামের পরিণতি হয় বাংলার নীল বিদ্রোহ; এবং তা কোম্পানী শাসনের অবসনের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়; উল্লেখ্য এখানকার তাদের আন্দোলন ছিল আইনী ও নিয়মতান্ত্রিক। তখন কলকাতায় ভূমিজ মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষা সংস্কৃতি ও সামাজিক সংস্কারে এক নয়া দিগন্ত সৃষ্টি করে। এর আগে তাদের শ্রেণীগত আর্থোউন্নয়নের ও আধুনিকতার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এতটা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের কোন তাপ লাগেনি। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল নির্বিকার। গ্রাম বাংলায় ৯৫% কৃষক ভূমিহীন ভূমিদাস ছিল এবং কিছু জমিদার, সুদখোর মহাজন। হিন্দু জমিদাররা প্রধানত শহরবাসী অনুপস্থিত জমিদার- তালুকের ভূমি উন্নয়নের প্রতি কোন নজর ছিলনা। জনতা তাই সামন্ত শোষণে নিপতিত হয়; তাদের আত্মরক্ষার জন্য সমগ্র সময়টুকুতে কৃষক বিদ্রোহ লেগে থাকে।[২৯] কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে ভূমিজ মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠে; এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল প্রধানত হিন্দু এবং উচ্চবংশের। ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্য হতে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেনি। পুনশ্চ এ ভাবে শহরের আর্থ-সামাজিক বিকাশ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে অসম বিকাশ ঘটে।

ভিন্ন চিত্র দেখতে পাওয়া যায় উত্তর ভারত-দিল্লী ও অযোধ্যায়। সর্বত্র প্রচন্ড অবক্ষয় দেখা দেয়; এমতবস্থায় ১৭৬৭ সাল হতে কোম্পানীর হাতে মোঘল দেওয়ানী হস্তান্তরের পর *সামন্ত্রতান্ত্রিক শোষণের সাথে নতুন অর্থনৈতিক প্রচন্ড শোষণই যে তাদের সংকট বৃদ্ধির মূল* কারণ; সে ব্যপারে উত্তর ভারতের আম জনতা উপলব্ধি না করতে পারলেও ১৮০৩ সালে দিল্লীযুদ্ধে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার পরাজয় কি দেশবাসীর নিকট চোখ খুলে দেওয়ার মত এক বড় ঘটনা নয়? ৮৩ বছরের অন্ধ অথর্ব মোগল সম্রাটের কোম্পানীর আশ্রয় নেয়ার আশা কি কোন গভীর তাৎপর্য ছিল না? কলকাতা হতে দিল্লী পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন এখন অপারাজেয়- তাকি কাউকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে? কোম্পানীর দাপটেই উত্তর পশ্চিম ভারতের রণজিত সিং (১৭৮০-১৮৩৯) ও চুক্তিবদ্ধ হতে কি বাধ্য হয়নি? এ কারণে ১৮০৩ হতে - ১৮৫৭ এই কাল পর্বটি উত্তর ভারতের বাস্তব অবস্থার নিরিখেই বিচার্য। এখানে কোম্পানী সরকার কি তার কৌশল হিসেবে মোগল সরকারকে নামকাওয়াস্তে বাঁচিয়ে রাখেনি? এ বাস্তবতা কি অর্থহীন?

দিল্লী ও অযোধ্যার নগর শহরে ক্ষয়িষ্ণু মোগল আভিজাত্য কি নিশ্চিহ্ন হয়েছিল? হ্যাঁ অবশ্যই তাদের পূর্বের জৌলস ছিল না সত্য; কিন্তু তার ছায়াতো ছিল বিদ্যমান। সামন্ত *পরিবারের অনেকে দিল্লী কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করে মোগলাই সামন্ত দরবার ত্যাগ করে*

Dhaka University Institutional Repository

কোম্পানীর নয়া রাজস্ব বিভাগে চাকরি নিচ্ছে, তার বড় উদাহরণ সৈয়দ আহম্মদ স্বয়ং। তাঁদের সকলের চোখ কান বন্ধ থাকেনি। নতুনের কেতন দেখতে পেরেছে অনেকে; সামন্ত পরিবার হতে কিছু কিছু আধুনিক মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর বিকাশ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এখানেই বঙ্গীয় মুসলিম এবং উত্তর ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের বিকাশ ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ দু'অঞ্চলের আর্থ-*সামাজিক ক্ষেত্রের আর একটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করে, যা পরবর্তী* ভারতীয় ঐতিহাসিক বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ঐ দু' এলাকার মধ্যকার পার্থক্য গড়ে উঠে ইতিহাসের জের হিসেবে; উনিশ শতকের প্রথম লোকগণনার উপাত্ত হতে বাংলার জনসংখ্যার মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সর্বজন স্বীকৃত এবং ধরে নেয়া যায় অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ হতে তাদের এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কলকাতা নগর গড়ার পর হতে বাংলায় বিদেশী কোম্পানীদের প্রভাবে ক্রমবর্দ্ধমান বাঙলায় বাণিজ্যের বিকাশ ঘটতে থাকার ঐতিহাসিক ফল হিসেবে এর আর্থ-সামাজিক বিকাশে এক নয়া বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাংলায় কিছু নতুন সামাজিক শক্তির বিকাশ হয়। কোম্পানী সমূহের সহযোগী শক্তি হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায় হতে বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, গোমস্তা ব্যবসায়ী সমাজই হল ঐ নয়া সামাজিক শক্তি। মাজহারুল হক, এম.এন ভট্টাচার্য সর্বপরি আব্দুল করিমের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের গবেষণায় তা স্পষ্ট হয়। তদুপরি করিম রহিমের গবেষনায় আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মুর্শিদকুলি খার ও নবাবী বাংলায় যে ভূমি শাসন ও ভূমি রাজস্বনীতি অনুসরণ করা হত তাতে এদেশের অনেক ভূস্বামী শ্রেণী, ইজারাদার, রাজস্ব আদায় কারিদের মধ্যে ৯৯% ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক এবং মুদ্রা ব্যবসায়ীরা যারা দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রন করতেন বিশেষভাবে শেঠেরা সবাই ছিলেন হিন্দু। তদুপরি নবাবী বাংলার সাথে দিল্লীর সম্পর্ক ছিল এনেকাংশে রহস্যবৃত্ত; অভ্যন্তরীন প্রশাসনে মুর্শিদকুলী খান অন্যান্য নবাবরা পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করলেও বিদেশনীতির ক্ষেত্রে সে স্বাধীনতা ছিলনা বলেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ফররুখশিয়ার ১৭১৭ সালের এক মারাত্মক ফরমান দিয়ে মুর্শিদ কুলী খার শক্তি খর্ব করা হয়। ফরমানকে পলাশীর ঘটনার আইনী সমর্থন হিসেবে ব্যবহার করা হয়; দ্বিতীয় মারাত্মক সামাজিক ফল হল দিল্লী হতে আগত মুসলমান অভিজাতদের প্রভাব বৃদ্ধির উৎস মুখ বন্ধ হয়; তাদের স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের যোগ্য ব্যক্তি দিয়ে পূরণ করলে তারা প্রভাবশালী হয়ে যায়। কোম্পানী কলকাতায় তাদের শক্তি এভাবে বৃদ্ধি করে এবং তারাও বাংলার রাজনীতিতে একটি পার্টির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

হিন্দু সমাজের ঐ উদীয়মান বণিক ধনিক শ্রেণী উনিশ শতকের প্রারম্ভেই জমিদার মহাজন, সুবিধাভোগী হিসেবে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ভূমিজ মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রধান সামাজিক শক্তি হিসেবে কলকাতায় ভদ্রলোকদের উত্থান হয়। অথচ বাংলার মুসলিম অভিজাতদের সলিল সমাধী হয়। ঐ ঐতিহাসিক প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে হান্টার যে পুস্তক লিখেছেন তাই হয়ে গেল পাক আদর্শে বিশ্বাসী মুসলিম গবেষকদের প্রধান বাইবেল। এজন্য মোহর আলী, হাফিজ মালিক, কোরাইশী শুধু বাংলারই নয় বরং সর্ব ভারতীয় মুসলমানদের পতনের সব দোষ চাপাচ্ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর। অথচ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে উত্তর ভারতের কণ্ঠস্বর ছিল মুসলিম সামন্তরা যদিও তারা ক্ষয়িষ্ণু; অথচ সংখ্যা লঘিষ্ঠ। হিন্দু সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই উত্তর ভারতে বাংলার মত অবশ্য উল্টোভাবে এক অসম বিকাশ ঘটে। বাংলা ও উত্তর ভারতে এ দু'ধরনের আঞ্চলিক সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

বিকাশ কি মারাত্মক বাস্তব ও ভাব বিপর্যয় ঘটাতে পারে তা স্পষ্ট হতে থাকে উনিশ শতকের শেষার্ধ হতে, উপমহাদেশ এর মারাত্মক ফলাফল ভোগ করে।

উত্তর ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হতে আর একটি ঐতিহাসিক বিকাশ স্পষ্ট হতে থাকে – তাহল দেশের প্রচলিত সনাতনী শিক্ষা ব্যবস্থা হতে অবশ্য আলেম সমাজের নবউত্থান ঘটে; দীর্ঘ অবক্ষয়ের যুগে ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম দেশে সামন্তদের মধ্য হতে জনতার কোন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিল না। এই অভাবটির শূণ্য পূরণ করে আলেম সমাজ। উল্লেখ্য অষ্টাদশ শতকে উসমানী সাম্রাজ্যের প্রচন্ড অবক্ষয়ের সময় জেনেসারীর পতনে ধর্মীয় – মহন্ত সমাজ হতে প্রথম শায়খুল ইসলাম পদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে মুসলিম সমাজে মোহন্তরা একটি সামাজিক শক্তিরূপে উত্থিত হতে থাকে।[৩০] একই অবস্থা ভারতে ঘটে। শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলবীর নেতৃত্বে ভারতীয় তৎকালীন উলামা ও মাশায়েরদের (ইসলামী মোহন্তদের) এ উল্লেখ ঘটে।

১৮০৩ এর পর অনেকের নিকট এটা স্পষ্ট হতে লাগল মোগল সাম্রাজ্যের ছায়াটুকু রক্ষা হবার নয়– বিশেষভাবে যখন দেখা যাচ্ছে সামন্তদের অনেকে বাস্তব অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর দিকে অগ্রসর হতে চায়। মুসলিম সমাজের বিবেক আলেম সমাজতো নিরব থাকতে পারে না।

দিল্লীর শাহ ওলীউল্লাহ (১৭০৩–১৭৬২) ভারতীয় ইসলাম এবং মুসলিম সমাজকে সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এবং মুসলিম সমাজের সর্বপ্রকার কুসংস্কার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধর্মীয় সংস্কারের দিকে একটি বৌদ্ধিক আন্দোলনে মনোযোগ দেন। মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৮০৩ সালেই আব্দুল আজীজ আরও অগ্রগামী কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে একটি ফতোয়া জারী করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে হিন্দুস্থান এখন দারুল হরব; দারুল ইসলাম নয়। তাঁর ঐ ফতোয়ায় তিনি বলেন যে, দিল্লীতে প্রকৃত মুসলিম কতৃত্ব নেই। প্রকৃত শক্তি এখন খ্রিস্টান কর্মকর্তাদের হাতে (এখানে তিনি কোম্পানী সরকারকে খ্রিস্টান সরকার বলেছেন এবং এটাই তার মধ্যে ভাব বিপর্যয়ের লক্ষণ), তাদেরকে বাধা দানকারী কোন শক্তি নেই; The promulgation of the commands of kufir names that in administration and justice in matter of law and order, in the domain of trade, finance and collection of vanues - everywhere the kuffar are in power. Yes, there are certain Islamic rituals e.g. Friday Id prayers, adhan and cow slanghter, with which they brook no interter ference; but the very rool of all there rituals is of no value to them no Muslim or any dhimmi can enter into the city or its suburbs but with their parmin. অবশ্যই তাঁদের নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাউকে এরূপ যাতায়াত অনুমোদন করে মাত্র; কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যথা শুজাউল মুলক অথবা বিলায়েতী বেগমদের জন্য তাদের অনুমতি ব্যতীত দিল্লী ভ্রমণ করতে পারেন না। হায়দারাবাদ, রামপুর, লাক্ষ্ণৌ ইত্যাদি প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলি স্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে দেয়া হয়েছে কেননা তারা সবাই কোম্পানী কর্তৃত্বের প্রতি অনুগত্য স্বীকার করছে।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে উল্লিখিত ফতোয়ার ভাষা, ভাব, চেতনা, ইতিহাস বোধ – সবকিছুই মধ্যযুগের এবং তৎকালীন অবস্থায় বিশ্লেষণ করে উক্ত ঘোষণা। তাই এ যুগের যুগভাবনার আলোকে ফতোয়াটি সারমর্ম উদ্ধার ও মূল্যায়ন খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। শাহ আব্দুল আজীজ তাঁর মহান পিতার অনুসারে এ ফতোয়া জারী করেছেন বল্লে সম্ভবত ঠিক হয় না, বরং সে যুগের উদীয়মান মুসলিম সমাজের সবার কথাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে বলেই অসংখ্য আলেম তার সাথে সহমত প্রকাশ করেছেন। একবিংশ শতকের বাস্তবতার আলোকে কী বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার দরকার নেই? মধ্যযুগে ধর্মীয় ভাষার প্রয়োগের ফলে কি এর মূল মর্মটি উদ্ধার করা যাবে না? তা ধর্মাশ্রিত হল কেন? বাস্তবে তাইতো হবে – মধ্যযুগের ভাষাই ধর্ম; কিন্তু তাই বলে তার কী কোন মর্মার্থ নেই? এবং আজকের আলোকে কী তা উদ্ধার করা সম্ভব নয়?

মনে হচ্ছে ফতোয়ার ভাষা অনেক কথা বলেছে। যার বাস্তবতা সেদিনে ধরা পড়েনি; বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, তিনি কেবল মুসলিমদের বাস্তব অবস্থার কথা বলেননি, বরং সকল দেশবাসীর – রাজা প্রজা, হিন্দু-মুসলিম সকলের কথাইতো বলেছেন; এতেই তাঁর পক্ষে বাস্তবতা ধরা পড়েছে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলতে হয়, শাহ আব্দুল আজিজের জীবন কালে (১৭৪৬-১৮২৪) মারাঠা শক্তি মোগল সম্রাটের আশ্রয় দাতা হিসেবে দিল্লী শাসন করত; চতুর্দ্দিকে অচিন্তনীয় অথ্যাচার – লুটতরাজ চালাত তখন কেন শাহ সাহেব এরূপ কোন ফতোয়া জারী করেননি কেন? এরকি এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নয়? যে, তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা ভেবেছিলেন যে মারাঠীদের উত্থান বা দিল্লীজয় বাস্তবে সাময়িক, যে কোন দেশে এরূপ উত্থান খুব অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু তার অবসানও ঘটতে পারে; কিন্তু ১৮০৩ এর ঘটনা কোন সাময়িক ব্যাপার নয় এবং এটা ছিল কোম্পানীর Conquest, Consolidetion and development এর নিশ্চিত প্রারম্ভ। ফতোয়ার বক্তব্যে তা আদৌ অস্পষ্ট নয়; কোম্পানীর বিজয় কোনক্রমেই তাৎক্ষণিক নয়; মহিসুর, অযোধ্যা ও রহিলাখন্ডের ইংরেজ তৎপরতাই প্রমাণ করে। তাই এরূপ শত্রুর সর্বাত্মক মোকাবেলার জন্য শুধু মুসলিম নয় তার জিম্মীদেরকে প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ অপরিহার্য্য। বিশেষভাবে মাতৃভূমির (যদিও তখন ওয়াতনের অবিধা সম্প্রসারিত হয়নি) সকলের মঙ্গালের, শান্তির জন্য সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। বিশ শতকে মাতৃভূমি, মানবাধীকার আর্থ-সামাজিক বিকাশের সাথে এরূপ মূল্যবোধের বিকাশ হয়। এমতাবস্থায় শাহ শাহেব বেঁচে থাকলে সেরূপ উপযুক্ত ভাষায় ফতোয়া রচনা করতেন।[৩২]

তিনি কেবল সর্ব সাধারণের অসাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানাননি, বরং প্রাথমিক পর্যায়ে সহজলভ্য কৌশল আয়ত্ব করার জন্য তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তাঁর যোগ্য ভাবশিষ্য সৈয়দ আহমদকে (১৭৮৩-১৮৩১) রাজপুতনার টঙ্ক আমীর আলী খানের শিবিরে যোগদান করতে বলেন; সেদিন তিনি মারাঠা প্রধান জসবন্তরাও হলকারের সাথে একত্রে ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদ টঙ্ক ৭ বছর অভিজ্ঞতার পর ১৮১৭ সালে আমীর আলী খান ব্রিটিশের সাথে শান্তি চুক্তি করার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তিনি শিবির ত্যাগ করে দিল্লী চলে আসেন। এভাবে প্রাথমিক রণকৌশল ব্যর্থ হয়। প্রশ্ন ওঠে তবে কি যুদ্ধবাজ সামন্তদের অধীনে এ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরোধযুদ্ধ পরিচালনা করা যাবে না? তবে কী জনযুদ্ধের আহ্বান জানাতে হবে? সৈয়দ আহমদ বেরেলবী এর পর গণফ্রন্ট ত্যাগ করে ইংরেজ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন ত্যাগ করে শিখ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন কেন?

তাঁর প্রচন্ড শিখ বিরোধী কর্মকান্ডের যথার্থ ন্যায় সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কি? কখন, কী পরিস্থিতিতে এবং কেন এরূপ কৌশল অবলম্বন করেন তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন নেই? তাঁর ঐ শিখ বিরোধী কর্মকান্ডের পশ্চাতে কি ইংরেজদের কোন সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র থাকতে পারে? এ প্রসঙ্গে হান্টার যে কথা বলেন তা একটু ভেবে দেখার দরকার আছে : They perpetrated endless depredation and massacere upon their Hindu Neighbor before we annexed the Panjab, annually recuriting their camp with Muhamadhan zealots from British Districts. No precantion were taken to prevent our subjects flowing to Fanatic colony which spents its furry on the Sikhs on our annexation of the Punjab the fanatic furry was Transfrred to their sucessess.[৩৩] তবে তাঁর এরূপ হিন্দু বিরোধী কার্যকলাপ কি ইংরেজদের পরোক্ষ সম্মতি প্রমাণ হয় না?

১৭৫৭-১৮৫৭ পর্যন্ত বাংলায় নয়া বণিকশ্রেণী শাসন ব্যবস্থায় বাংলার ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিবেশে, তার আর্থ-সামাজিক বিকাশের গতি প্রকৃতি ও উদ্ভূত মানসিক রূপান্তরের ধারা সম্পর্কে ইতপূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, নবাবী যুগেই যারা বাস্তব অবস্থার নয়া বাণিজ্যতন্ত্রের যুগবাণী উপলব্ধি করতে পেরেছিল তারাই পলাশীউত্তর কালে উনিশ শতকের প্রথম দশকেই নয়া বাস্তবতার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে এবং তারাই ভূমিজ মধ্যবিত্ত হিন্দু ভদ্রলোক হিসেবে এক প্রভাবশালী সামাজিক শক্তি হয়ে ওঠে। যারা যুগ চেতনায় সাড়া দিতে পারেনি তারা ইতিহাসের বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যায়; এটাই ইতিহাসের ধারা। এতে কারও কিছু করার থাকে না। এ বিশ্লেষণটি নতুন হলেও এটিকে কি অবহেলা করা যায়? এই ইঙ্গিত অনুধাবনের মধ্যে নিহিত আছে ইতিহাস বোধের স্বার্থকতা।

উত্তর ভারতে তৎকালীন নয়া বাস্তবতার প্রভাবে ১৭৬৫-১৮০৩- ১৮৫৭ সালে তার আর্থ-সামাজিক বিকাশক্রম বাঙলা হতে ভিন্ন পথে চালিত হয় একথা সর্বজন বিদিত। প্রসঙ্গটি পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। নানা ঐতিহাসিক কারণে মোগল সাম্রাজ্য দীর্ঘ অবক্ষয় কাল অতিবাহিত করে। বণিক শাসনের পূর্ব হতে অনেক দিন ধরে মোগল সাম্রাজ্য অবনতির পথে ছিল, কিন্তু তার সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বিন্যাস, মূল্যবোধ সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত টিকেছিল – এসময় কোন নয়া সামাজিক শ্রেণীর বিকাশ হয়নি।

আপামর জনতাকে প্রতিরোধ যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সৈয়দ আহমদ বেরেলবী সর্বত্র জন সংযোগের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তার সাফল্য ছিল প্রচন্ড। হান্টারের ভাষায় কলকাতা হতে দিল্লী-যেন বিদ্রোহী ক্যাম্পে পরিণত হয়েছিল। তাঁর এই প্রচার অভিযানের সাফল্য কার্যকর করার কি ব্যবস্থা নিবেন সে সম্পর্কে কোন কিছু জানা না গেলেও তিনি ১৮২২ সালে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্য মক্কায় গমন করেন এবং ১৮২৪ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে

Dhaka University Institutional Repository

পেশওয়ার সীমান্তে পাহারীদের মধ্যে পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধের সূত্রপাত করেন। হান্টার সে কথাই বলেন। কিন্তু কেন তাঁর পূর্বে সিদ্ধান্ত এরূপ পরিবর্তন হল? কেন পূর্বের রণকৌশলের পরিবর্তন করলেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদের রাশ টানলেন?

হান্টারের বক্তব্যে মনে হয় তিনি আরবে ওহাবী কৌশলের সাফল্য দেখেই তিনি ঐ কৌশল অবলম্বন করেন; এজন্য তাঁকে নব দীক্ষিত ওহাবী বলে অভিহিত করা হয়। তিনি কি সত্যই ওহাবী ছিলেন? কে.এম. আশরাফ Muslim Revivalin and Revolt in 1851 প্রবন্ধে বলেন The Term Wahabi is certainly in accunate in a much as the political objectives of the so called India wahabi and their social outlook in general were drived not from doctrine of Abdul Wahab of Nazd; but for the teaching of Shah Walliullah at Delhi.[৩৪] মাওলানা হুসাইয়েন আহমদ মাদানী তাঁর নকশে হায়াত দ্বিতীয় খন্ডে ওয়াহাবীদেরকে ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধ যোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তিনি লিখেছেন যে, সৈয়দ আহমদ রাজা হিন্দুরাজ সিন্দিয়া যিনি সে সময় গোয়ালিয়রের দাওলত রায় সিন্দিয়ার মন্ত্রী এবং শ্যালক, এবং সিন্দিয়ার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা গোলাম হায়দার খানকে এ সম্পর্কে পত্র লেখেন। এবং এ পত্রে ব্রিটিশ বিতাড়নের কথাই ছিল।[৩৫] মাদানীর বক্তব্য সঠিক হলে বেরেলবী এরূপ অযথা হিন্দু বিরোধী তৎপরতার ব্যাখ্যা কি? এটা কি ভাব বিপর্যয়ের লক্ষণ?

২. সিন্ধীর জীবন ও সময়, ভারতীয় প্রেক্ষাপট:

১৮৫৭ সালের পূর্বে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে কোম্পানী শাসনাধীন বাংলা ও উত্তর ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ধারায় যে বড় ধরনের পার্থক্য গড়ে উঠেছিল - যা ইতপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, এবং তা অনুভব করার মধ্যেই তৎকালীন ভারতের ঐতিহাসিক মর্মবস্তু উদ্ধারের একমাত্র পথ। মোটাদাগের ঐ পার্থক্য অনুধাবন না করলে কেন প্রধানত দিল্লী কেন্দ্রিক সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হল, অথচ এর তাপ ঝঞ্ঝা বাংলা কেন অনুভব করল না? তার কি কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সম্ভব? উনিশ শতকের প্রথমার্ধ কিন্তু পল্লী বাংলা নিরব নিথর ছিল না সমগ্র পল্লী বাংলা কৃষি বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গে আন্দলিত ছিল।[৩৬] এই কৃষি বিদ্রোহ এক পর্যায়ে মহানীল বিদ্রোহে (১৯৫৯-৬১) রূপ নেয়।[৩৭] উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বাংলার আর্থ-সামাজিক বিকাশে কোম্পানী সরকার এতই হীনবল, নিস্তেজ হয়ে এসেছিল যে, ঐ বিপ্লবের ধাক্কায় কোম্পানী শাসনের অবসান হয়; অবশ্য কোম্পানী শাসনের অবসানে সিপাহী বিপ্লবের একটা ভূমিকা কেউ অস্বীকার করে না। উভয় অঞ্চলে একই আর্থ-সামাজিক পার্থক্যের কারণে বাংলায় বেদাত বিদ্রোহী আন্দোলন জোরদার না হয়ে ফরায়েজী বিপ্লবে আর্থ-সামাজিক উপাদান প্রাধান্য পায়। ক্যান্টওয়েল স্মিথ তাই বলেন। ১৮৩১ সালে বালাকোট ট্রাজেডি উত্তর বাংলায় উত্তর ভারতের সিত্তানের তথাকথিত ধর্মীয় সংস্কারের প্লাবন প্রবাহিত করার সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, হান্টারের বক্তব্যের মধ্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে C.W. Smith একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা

Dhaka University Institutional Repository

অনেক পরিমানে Subjective - objective নয়। বাংলার মুসলমানরা চিরকালই প্রাকৃতিক কারণে খুব ধর্ম পরায়ন।[৩৮] তারা সহজে বাস্তবের মুখামুখি কৃষি বিপ্লব সৃষ্টি করে। এ কারণেই বাঙলায় বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ভাব বিপর্যয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে অনৈতিহাসিক বেদাতী আচরণের বিরুদ্ধে উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রচার অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় সারা বাংলায় আনপড় মোল্লা ও মুনশী ভূমিকা অবশ্যই স্মরণীয়। কেরামত আলী জৌনপুরীর কার্যকলাপ অবশ্যই বিবেচনায় আনা দরকার; বাংলা সমাজে ফুরফুরার পীরের প্রতিষ্ঠাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সম্ভবত দু ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। প্রথমত, মুসলিম সমাজে বিদাতের রিবুদ্ধে জিহাদ – এর অন্তর্বস্ত কিন্তু বিদাত উচ্ছেদ নয় এবং যা করা খুব সম্ভব ছিল না,- তবে মুসলিম সাধারণের মধ্যে অমুসলিম আচরণের বিরুদ্ধে বিষ উদগারণ এবং সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র চেতনা বৃদ্ধিতে মক্ষম ছিল – এটাই উদীয়মান বাংলার মধ্যবিত্তদের জন্য মুখরোচক ছিল। দ্বিতীয়ত বাংলার উদীয়মান শিক্ষিত সমাজকে ব্রিটিশ রাজনৈতিক সহযোগীতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উপরে উল্লেখিত মৌলিক পার্থক্যটুকু গড়ে উঠেছিল বলেই বিপ্লবউত্তর উত্তর ভারতে শিক্ষা-সাংস্কৃতি সংক্রান্ত বিখ্যাত দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। একটি বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দ, দ্বিতীয়টি, আলীগড় আন্দোলন।

সিপাহী বিপ্লবের কারণ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ নিরর্থক। এর বিভিন্নমুখী কারণ থাকতেই পারে, তবে প্রথম একটি কারণ অবশ্যই মূল ও প্রধান হবে, যদিও পরবর্তী পর্যায়ে তা গৌনকারণে পরিণত হতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সর্বস্তরের জনতার বিরাটাংশের সমর্থন ব্যতীত এরূপ সর্বাত্মক রূপ দিতে পারেনি। ১৮০৪ সালে দিল্লীতে কোম্পানী শাসন পুরোপুরি প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উত্তর ভারতে দেওয়ানী পরিচালনার জন্য স্থানীয় মুসলিম শিক্ষিতদের সহযোগিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল – এবং দেশীয় শিক্ষিত জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য দিল্লী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল সরকার কার্যকর না থাকলেও উত্তর ভারতে মুসলিম ক্ষয়িষ্ণু অভিজাতের অসংখ্য ফিউডাল জায়গীর, মদদে-মোয়াশ ইত্যকার খুদে স্টেট ছিল – এরা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি। এবং তাদের অনেকেই নয়া ব্যবস্থায় স্থান করে নেয়। স্যার সৈয়দের পরিবার একটি বড় নির্ভুল উদাহরণ। ওদের ক্ষয়িষ্ণু দরবারে মোগলাই অপসংস্কৃতির অনেক খানি বেঁচে ছিল, গজল, নৃত্য, গীতি, কাব্যচর্চার সবই ছিল বলেই ঐ যুগের উর্দু ভাষার নয়া বিকাশ ঘটে; এ যুগের শ্রেষ্ঠ কলাকার ছিলেন গালিব; বস্তুত তিনি ছিলেন উত্তর ভারতের মধ্যযুগের অবসান ও নয়া যুগের সূচিকালে মধ্যবর্তী স্থানে – তার কাব্যে এর যথেষ্ঠ প্রমাণ আছে। জনতা অনুধাবন করতে পারছিলো না যে, তাদের সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যাচ্ছে অথচ নতুন সমাজ গড়ার প্রক্রিয়া দ্রুত গড়ছিলনা। উল্লেখ্য এসময় বাংলায় নয়া সমাজ কাঠামো দ্রুত গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছিল। এখানে একঝাঁক হিন্দু কোম্পানীর দালালী, মুৎসুদ্দীগিরি বেণিয়াগিরি করে যে নয়া সামাজিক শক্তির পাত্তা দিচ্ছিলেন।[৩৯] আর এখানে একটা গতিশীল অবস্থা বিদ্যমান ছিল। বাংলায় মার্কানটাইলিজম চালু ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর ভারতে কোম্পানীর পূর্ণ শাসন প্রবর্তিত হলে সবাই অবশ্য খুশী হতে পারেনি। সামগ্রীকভাবে কোম্পানীর বণিকতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নগ্ন শাসন ও শোষণের সাথে দেশীয় সামন্ত শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আম জনতার অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। স্বাভাবিক কারণে বিক্ষুব্দ জনতার নেতৃত্ব চলে যায় অসন্তুষ্ট ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণীর হাতে। ইতিহাসিক *বিচারে এরা বিনা প্রতিবাদে কোম্পানীর শাসন মানবে কেন? তাই প্রথম সুযোগেই বিপ্লবে* তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণই ছিল স্বাভাবিক; এই স্বতঃস্ফূর্ত সরব প্রতিবাদ; এবং প্রারম্ভে এটা সুচিন্তিত সুসংগঠিত ছিল না, জনতার অংশগ্রহণ ছিল সহায়ক ভূমিকা মাত্র। এসব দুর্বলতা সত্বেও এটা ছিল প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বিদ্রোহের পরিসমাপ্তির পর তাদের উপর কোম্পানী সরকারের অকথ্য নির্যাতন নেমে আসে। উত্তর ভারতের জন্য সুখময় বিষয় ছিল দুপক্ষের বাড়াবাড়ি যিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন অথচ তিনি ছিলেন কোম্পানী সরকারের একজন বিশ্বস্ত সুহৃদ, মেধাবী সহযোগী কর্মকর্তা অভিজাত শ্রেণী হতে আগত এবং যার আন্তরিক সহযোগীতায় বিপ্লবের আগুন হতে অনেক ইংরেজ প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল – তিনিই স্যার সৈয়দ আহম্মেদ খান। স্বদেশী অভিজাত সামন্তদের উপর ইংরেজ অত্যাচার অন্তত সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য তিনি তাঁর স্বদেশী সহকর্মীদের নিয়ে কাজে ঝাপিয়ে পড়েন। বিদ্রোহের প্রকৃত কারণের উপর আলোপাত করে আসবাবে বাগাওয়াত গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। সরকারের সাথে দেশবাসীর সহযোগীতার আশ্বাস দেয়ার কার্যাক্রম হাতে নেন। বিদ্রোহী ও সরকারের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝির অবসানের জন্য আর একটি কার্যক্রম হাতে নেন।

প্রসঙ্গাক্রমে উল্লেখ্য যে ইংল্যান্ডে ধনতন্ত্রের সূচনালগ্নে বণিক তান্ত্রিক একচেটিয়া বাদের বিরুদ্ধে অবাধ বাণিজ্যতন্ত্র বা বাজার অর্থনীতির মধ্যে রাজনৈতিক মহাবিতর্ক হয়, বাজার অর্থনীতির পক্ষে ইংল্যান্ডের প্রবল জনমত সংগঠিত হতে থাকে। একারণে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ১৮১৩ সালে এবং ১৮৩৩ সালে কোম্পানী সনদে বিপুলভাবে সংশোধনী কার্যক্রম চালু হয় – এর সাথে মুক্ত বুদ্ধির উন্মেষ ঘটতে থাকে। তাই প্রথম পুঁজিবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু হয়। বাংলায় সহমরণসহ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। এসময় খ্রীষ্টান যাযকরা তাদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। দুঃখের বিষয় এই সাংস্কৃতিক বিষয়টি আসে খ্রীষ্টান ধর্মের নামে। আরও উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ইউরোপে এবং বিশেষভাবে ইংল্যান্ডে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ফলে খ্রীষ্টান ধর্ম মূল সামন্ততান্ত্রিক অবস্থান হতে অনেক সংশোধিত হয়, এবং মুক্ত বিচার পদ্ধতি গ্রহণ করে। এরূপ পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে দেশ, ধর্ম, সমাজের সংহতি অগ্রগতির লক্ষ্যে ঘরগোছানর কাজের সাথে নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৮১৭ সাল হতে শুরু করেন রামমোহন রায়। বাংলা আলোড়িত হয়ে ওঠে এবং ইয়াং বেঙ্গাল বিদ্রোহ হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং তত্ত্ববোধনী যুগের সূচনা হয়; বাংলা ভাষা, সাংস্কৃতিক বিকাশের অতিশুভ সূচনা হয় – দেশে যুগ যুগ ধরে চালু সামন্ত্রতান্ত্রিক মূল্যবোধকে নয়া চেতনার নামে খাপ খাওয়ানো যায় এই ছিল তত্ত্ববোধনী যুগের মূল সুর। সংক্ষেপে গোপাল হালদারের ভাষায় সাহিত্যে ইতিহাসের রূপরেখা দ্বিতীয় খন্ডে এসব কথার

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টান ধর্মের আগ্রাসন স্তব্ধ করার পথ অবলম্বন করা হয় এবং বঙ্গীয় জাতি সত্তার বিকাশের সূচি পর্ব এসে যায়।

উত্তর ভারতে পুঁজিবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন উনিশ শতকের ত্রিশের দশক হতে শুরু হয়। ১৮৫৭'র ঘটনার পর স্যার সৈয়দ আহমদ হাড়ে হাড়ে অনুধাবন করেন যে এটা আর একটা বিপদ। হেস্টিংসের সাংস্কৃতিক নীতির মূল সুর ধর্মীয় সহনশীলতা, মুক্ত আলোচনা ও বিচার বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে খ্রীষ্টান মিশনারীরা কোম্পানীর সহনশীলতার বিপরীতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন পরিচালনা করেন। সরকারী অনুমোদন না থাকলেও কর্মকর্তাদের কেউ কেউ তা অপচ্ছন্দ করত না। রামমোহনের আন্দোলনের সূচনার প্রায় ৫০ বছর পর ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ ইসলামের আধুনিকী করণের এবং সনাতনী সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় তত্ত্বকে নয়া যুগচেতনার সাথে খাপ খাওয়ানোর সর্বাত্মক ব্যাবস্তা গ্রহণ করেন। ধর্মের আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করেন যে ইসলাম সরকার বিরোধী হয় না এবং সহযোগীতা করে।

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল উত্তর ভারতীয় উদীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের স্বার্থে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্বীয় সমর্থন জোগান। একাজ সমাধা করতেই গড়ে ওঠে বিখ্যাত আলীগড় আন্দোলন। আলীগড় আন্দোলনের মর্মবস্তু হল: বিট্রিশ শাসনের সাথে ভারতীয় মুসলমানদের সর্বাত্মক সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করা; বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় যেমন সহযোগিতা করেছিল কোম্পানীর সাথে; মুসলিমদের কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের মনে যেন কোন প্রকার সন্দেহ না জাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্যে দর্শনের ব্যাপক প্রসার ঘটানো এবং সেজন্য ইংরেজী স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা; এসব উদ্দেশ্যে সাধনে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে এক ঝাঁক নামিদামী তরুণ যে আন্দোলন করেন-তাই আলীগড় আন্দোলন। সম্ভবত ইসলামের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসানের লক্ষ্যে এবং নয়া যুগ চেতনার সমর্থনে আলীগড় আন্দোলনই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ একটি আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বললে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। এমনভাবে ইতিপূর্বে ইসলামের ইতিহাসে নয়াযুগ ও নয়া বাস্তবতার সাথে খাপ খাওয়ানো কোন পূর্নাঙ্গ আন্দোলন লক্ষ্য করা যায় না।

দেওবন্দী আন্দোলন ঃ

ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে আগমন এবং অষ্টাদশ শতকে ইসলামী বিশ্বের প্রচন্ড অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে শাহ ওলীউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২) সতর্ক বানী উচ্চারণ করেন এবং দেশে সনাতনী জ্ঞান শক্তি বিস্তারে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তদপুত্র আব্দুল আজীজ, মহান পিতার বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ হতে যে মমার্থ উদ্ধার করেন, তা বাস্তবায়নের জন্য এবং উদীয়মান বিদেশী শক্তিকে ঠেকানোর জন্য দেশকে দারুল হারব বলে ফতোয়া দেন, এবং দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে তার মোকাবেলার নির্দেশনা দেন। এই ফতোয়ার বাস্তবায়নের পদক্ষেপ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন সৈয়দ আহমদ বেরেলবী এবং ইসমাইল শহীদ; কিন্তু নির্দেশনায় সঠিক পথে পরিচালিত না হয়ে কিছু বিভ্রান্তি আসে এবং যার পরিণতি হয় ১৮৩১ সালে বালাকোটের

Dhaka University Institutional Repository

ট্রাজেডিতে। তবে আন্দোলনের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটেনি। আব্দুল আজিজের উত্তরসূরী মাওলানা ইসাহাক (১৭৭২-১৮৪৬) তা চালু রাখেন। তিনি আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল অবলম্বন করেন। তার নীতিদ্বয় হল, ক) ভারতে হানাফী মজহাব দৃঢ়তার সাথে জারী রাখা, খ) দেশের স্বাধীনতার জন্য উসমানী শক্তির সাহায্য ও সমর্থন আদায় করা। ১৮৪১ সালে তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন, তবে দিল্লী ত্যাগ করার পূর্বে আন্দোলন অব্যাহত রাখতে চার সদস্যের একটি বোর্ড গঠন করেন। এ চার জন হলেন : বিখ্যাত মামলুক আলী, বোর্ডের সভাপতি, ২) কুতুবুদ্দীন দেহলবী, ৩) মোজাফ্ফর হোসেন এবং ৪) আব্দুল গণি। এরা সবাই দিল্লীর বিখ্যাত সনাতনী পন্ডিত। দিল্লী কলেজের শিক্ষক মামলুক আলীর শিষ্য হলেন মোহাম্মদ কাসেম নানতবী, রশীদ আহম্মেদ গংগুহী। এদের মূল কেন্দ্র ছিল শ্যামলী। উল্লেখ্য শ্যামলী ছিল সিপাহী বিপ্লব চলাকালে একটি মুক্ত এলাকা এবং নানতবী শ্যামলীর একজন সাহসী বুদ্ধিজীবী সৈনিক।[৪০]

সিপাহী বিপ্লব পর্যদুস্ত হলে নয়া পরিস্থিতিতে নতুন করে তারা চিন্তা ভাবনা শুরু করে। মামলূক আলীর দিল্লী কলেজের বিখ্যাত শিষ্য স্যার সৈয়দ আহমদ- যিনি পারিবারিক সূত্রে ছিলেন কোম্পানী সরকারের সহযোগী। নয়া বাস্তবতার খতিয়ান করেই আলীগড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এবং ভারতীয় মুসলমানদের জন্য কোম্পানী সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি অবলম্বনের পথ ও প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। মামলূকের অন্য শিষ্য কাসেম নানতবী সৈয়দ আহমদের নয়া যুগ চেতনার সাথে খাপ খাওয়ানোর পথ পরিহার করে কোম্পানী সরকারকে সম্পূর্ণ উৎখত করে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করেই ইসলামের পূর্ব গৌরব উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে শাহ ওলীউল্লাহর ভাবাদর্শ বিকাশের জন্য দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ১৮৬৭ সালে। পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, আলীগড় আন্দোলন এবং দেওবন্দ আন্দোলনের মধ্যে ছিল একেবারে মৌলিক পার্থক্য। আলীগড় আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা; দেওবন্দের আদর্শ ছিল ব্রিটিশ শক্তির সাথে সর্বাত্মক অসহযোগিতা; ব্রিটিশ বিতাড়ণই একমাত্র লক্ষ্য; নয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শ পরিহার করা; সামন্ততান্ত্রিক সনাতনী ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এই হতে প্রতিয়মান হয় যে, গুরু মামলূকের চিন্তার দিগন্ত যতটুকু প্রসারিত ছিল কাসেমের ততটা ছিল না, নয়া যুগের বাস্তবতা ও গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না। কোন সন্দেহ নেই সনাতনী জ্ঞান শক্তি বৃদ্ধি এবং বাস্তব কৌশল অবলম্বনই ছিল নানতবীর প্রয়াস; তিনি সমসাময়িক ইউরোপ দেখেননি, সৈয়দ আহমদ এদেশে কোম্পানী সরকারের কার্যক্রম অবলম্বন করে যে জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন নানতবীর অবরুদ্ধ মনে তাও প্রবেশ করেনি। নানতবীর এক শিষ্য মাহমুদুল হাসান দেওবন্দের প্রথম ছাত্র এবং তিনি অধ্যয়ন শেষে দেওবন্দের হাল ধরেন। তিনি উত্তরাধীকারী সূত্রে প্রাপ্ত ভাবরাশী দেওবন্দে সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষার আলোকে উদ্দীপ্ত ও উদ্ভাসিত করার প্রগ্রামের সাথে বিদেশী শাসন হতে মুক্তি বিষয় গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেন এবং কিছু কিছু বাস্তব পদক্ষেপও নিতে শুরু করেন। তিনি একজন সাহসী মেধাবী দক্ষ শিষ্য পেয়ে গেলেন- তিনি হলেন মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী।[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মাহমুদুল হাসানের চিন্তা ভাবনা একটি পরিণতি লাভ করে ১৯০৮ সালে এবং তিনি উনিশ শতক পার করে বিশ শতকের প্রথম দশকে প্রবেশ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ জাতির সরাসরি শাসন এক নবরূপে বিকশিত হয়। শাসক ও শাসিতের মধ্যে চিন্তা-ভাবনায়, কার্যক্রমে নয়া অধ্যায়ের শুরু হয়। ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নয়া কৌশল গড়ে উঠে *উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে। এসময় বিশ্বপরিস্থিতিতে এক নবতর অবস্তার সৃষ্টি হয়।* এসময় অবাধ বাণিজ্যিক প্রতিযোগীতা এবং অর্থনৈতিক মন্দার ফলে একচেটিয়া শিল্প পুঁজিবাদের বিকাশ এবং ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয়ে ওঠে এ যুগের বৈশিষ্ট্য। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন অনুধাবন না করলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ঐতিহাসিক সারৎশর অনুধাবন করা যায় না। বিশ শতকের এই উদীয়মান পরিস্থিতিতে সরকারের পূর্ব গৃহীত ইঙ্গ-বঙ্গ সাংস্কৃতিক বা আর্থ-বাণিজ্যিক সহযোগিতার নীতি অচল হয়ে পড়ে, ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সংস্কারবাদী রাজনৈতিক সহযোগিতা প্রশস্থ পথ বলেই বিবেচিত হয়।

ইংল্যান্ডে হুইগ ও টোরী দলদ্বয় প্রত্যাসন্ন সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য আপন আপন ঘরগুছিয়ে তাদের দলীয় মতাদর্শ ও কর্মসূচি নির্ধারণ করে। ফলোশ্রুতিতে উভয় দলের মধ্যে বাংলায় উদীয়মান আলোক প্রাপ্ত জনগণকে বিপ্লবের পথ রুদ্ধ করে উদার সংস্কার রাজনৈতিক সহযোগীতায় হয়ে ওঠে তাদের জাতীয় দর্শন এবং বাংলার উদীয়মান সাংস্কৃতিক ধারার যে *সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্রবোধ জাগ্রত হচ্ছিল* তাতে কত সূক্ষ্ম ও নিপুণ ভাবে কাজে লাগিয়ে 'ভাগকর ও শাসনকর' নীতির প্রয়োগ করা যায় এই পর্বেই প্রথমেই সে চিন্তার বীজ সন্তর্পণে রোপন করা হয়। আর একাজের জন্য সময় ছিল অনুকূলে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলায় শিক্ষিত সমাজের বিকাশের সাথে সাথে তাদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নটি জড়িয়ে ছিল।[৪২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলার শিক্ষিত সমাজ বিকাশের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমত, এ শিক্ষিত সমাজ প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চ বর্ণ হতে গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকের সত্তর দশকের পূর্বে বঙ্গীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্য হতে কোন শিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠেনি। হিন্দু শিক্ষিত সমাজের সংকট কাল হতে একটি মুসলিম শিক্ষিত সমাজ বিকাশোন্মুখ হয়।[৪৩] উদীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্তরা কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে পারছিলো না। উনিশ শতকের শেষ তিন দশকের এ বাস্তব অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলায় ধর্মগত এবং বিশেষ করে দু'প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যেকার অসম বিকাশের মধ্যেই বঙ্গ ভারতের ট্রাজেডি মূল রহস্য নিহিত ছিল। সর্বাধিক বিচারে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার মুসলিম আশরাফদের জাগরণের সূচনা লগ্নটি ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় বঙ্গ ভারতের তাদের অস্তিত্ব নির্বিঘ্ন রাখার জন্য বাংলায় তাদের পূর্বনীতির সাথে আর একটি উপযোগী নতুন নীতি গ্রহণের সময়। এরূপ বাস্তবতায় ঔপনিবেশিক শক্তি আপন আত্মরক্ষার জন্য উদীয়মান এদেশ বাসীকে অধিকতর দায়িত্বশীল করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের আওতা ভুক্ত করা। আইন পরিষদ ব্যতীত কলকাতা পৌরসভা জেলাবোর্ড এবং লোকাল বোর্ড গঠন করে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ও প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এতে শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে জনসেবার নামে রাজনৈতিক মর্যাদার

Dhaka University Institutional Repository

দ্বার উন্মুক্ত হবে। এতে অর্থনৈতিক অসম বিকাশের সাথে রাজনৈতিক অসম বিকাশের পথ উন্মুক্ত হবে।[৪৪]

একই সময়কালপর্বে বাংলার বিপরীত অবস্থা ঘটে উত্তর ভারতে। এখানে উদীয়মান হিন্দু মধ্য বিত্তরা প্রতিষ্ঠিত মুসলিম মধ্যবিত্তদের সাথে টিকে উঠতে পারছিলনা বলেই তারা হিন্দি ভাষার ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং উর্দু ভাষার জোর বিরোধীতা করে – অতএব উনিশ শতকের ষাটের দশকে উর্দু হিন্দি বিবাদের সূত্রপাত হয়। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার তার অস্তিত্বের জন্য দেশকে বিপ্লবের হাত হতে সংস্কার বাদী পথে নেয়ার জন্য স্থানীয় শাসন প্রবর্তন করলে উত্তর ভারতে মুসলিম মধ্যবিত্তরা এর গণতান্ত্রিকতায় সংখ্যা লঘিষ্ঠতা ও গরিষ্ঠতার ভয়ে ভীষণ আতঙ্কিত হয় এবং তাদের নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সম্পর্কে উদ্বীগ্ন হয়। এটাই একমাত্র কারণ যে, প্রধান ভারতীয় মুসলিম সুহৃদ, নবচেতনায় মুসলিম অগ্রদূত, উদারচিত্ত স্যার সৈয়দের মধ্যে ঐ অশুভ আতঙ্ক এতই প্রবল হয় যে, ঔপনিবেশিক সরকারের আকাঙ্খিত ও অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে[৪৫] অত্যান্ত সন্দেহের চোখে দেখেন। মুসলিমদেরকে কংগ্রেসের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখার পক্ষপাতি ছিলেন না। (তাঁর উপর প্রিন্সিপাল বেকের প্রভাবই কারণ?) মুসলিম সুহৃদ হওয়া আদৌ কোন অন্যায় নয় বরং ভাল, তবে সেই সাথে স্বদেশ ভারত সুহৃদ হওয়াটাই তাঁরমত প্রজ্ঞাবান মানুষের উপযুক্ত কাজ। যে কোন হিসেবে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন অবশ্যই গণতন্ত্রের দিকেই পদক্ষেপ, তাই প্রগতিশীল[৪৬] প্রয়োগে সতর্ক হলে এর ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন হতে পারে – আর এই পথই সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রিতি ও সমঝোতা বৃদ্ধির একমাত্র পথ। দেশ যতই গণতন্ত্রের দিকে যাবে দেশ ততই সুখী ও সমৃদ্ধ হবে। তিনি সম্ভবত সেদিন উপলব্ধি করতে পারেননি যে তাঁর সেই ভীতপ্রদ শিক্ষা মহান ঐতিহ্যবাহী উদার ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হীনমন্যতার বীজ রোপিত হবে এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব এত দীর্ঘস্থায়ী হবে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে স্বাধীন ভারতে মুসলিমরা সবরকম ঝড় ঝাপটা তুচ্ছ জ্ঞান করে ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে হতে সে হীন মন্যতা পরাভূত হচ্ছে – সকলের সাথে মাথা উঁচু করে তারা গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সমৃদ্ধ দেশ গড়ার কাজে কারও থেকে পিছিয়ে নেই। সমস্যা থাকতে পারে তবে সমাধানও আছে।

উনিশ শতক পেরিয়ে ভারতীয়রা বিশ শতকে পদার্পণ করেই এক নবতর বিশ্বসভ্যতার গন্ধ পেতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর কী মহিমা? ক্ষুদ্রদেশ জাপান ১৯০৫ সালে শক্তিধর জার রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাভূত করে। জার্মানী ইটালি বিশ্বসভ্যতার নেতৃত্বে আসার পায়তারা করছে। তাই বিশ্ব জনগণ মুক্তির জন্য বিপ্লবের পথ ধরছে। উদীয়মান ভারত বাসী কেন পিছিয়ে থাকবে? তারাও বিশ্বসভ্যতার অংশীদার কেন হবে না? কেন তারা ইয়াং ইটালী হতে পারবে না? এরূপ উদীয়মান পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি অবশ্যই কিছু করতে চায়। কূটনীতি বিশারদ তীব্র মেধাবী আজন্ম স্বপ্নচারী সাহসী ঝানু সাম্রাজ্যবাদী কার্জন এক কলমের খোচায় ভারতবাসীকে নামিয়ে দিল এক মহা আবর্তে। সুশাসন ন্যায় বিচারের নামে প্রশাসনিক সংস্কারের নামে বঙ্গ প্রদেশকে ১৯০৫ সালে ভাগ করেদিল।[৪৭] ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠন ঢাকা–কলকাতার অসম বিকাশের মধ্যে সমতা আনা ছিল খুবই সহজ কাজ; কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তি তা করবে কেন? তাতে খাটি বঙ্গীয় জাতি সত্তা বিকশিত হতে দেবে কেন? কার্জনের

Dhaka University Institutional Repository

লোভনীয় প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন কাশ্মীর, মূলত লবণ ব্যবসায়ী ব্রিটিশ সৃষ্ট ঢাকার নবাব পরিবার। নবাব পরিবারের পশ্চাতে সমবেত হল আনপড় মোল্লা সমাজ যারা দীন-দুনিয়া সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু বিভেদমূলক ক্ষয়িষ্ণু মোগলাই সংস্কৃতির দক্ষ প্রচারক, যাদেরকে পথ দেখান বেরেলীর ডান পন্থী প্রতি বিপ্লবী কেরামত আলী জৈনপুরী– এবং সহায়তা দেন ফুরফুরার পীর দস্তগীর।

হিন্দু ভদ্রলোকরা প্রমাদ গুনলেন তবে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সুখের বিষয় মুসলিম সম্প্রদায়ের দেশ প্রেমিক শিক্ষিত, কিছু ব্যারিস্টার উকিল এমনকি কিছু উদার জমিদার ভদ্রলোকেরা সমর্থন করে, তবে তাদের হালে পানি পায়নি। ভাবাবেগ যেখনে প্রধান, জ্ঞান সেখানে অচল? বোম্বের শ্রমিক আন্দোলন এগুতে পারেনি, বাংলার অগ্রগামী তরুণরা অনুশীলন করবেন, যুগান্তর আনবেন! সব ব্যর্থ? না এই সর্বপ্রথম বিশ শতকের প্রথম দশকেই সচেতন ভাবে জাতীয়তাবাদী চরিত্রের স্বদেশী আন্দোলন আসে; স্বদেশী শিক্ষাঙ্গান সৃষ্টি হয়।[৪৮] কিন্তু এতে এসেছিল কিছু অবিবেচিত বিষয়, কিছু ভ্রান্তি। ত্রুটি বিচ্যুতি গুলো অমিত সরকারদের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে। তাতে কি? বলতেই হবে এগুলো ছিল জাতীয়তাবাদের প্রারাম্ভিকা। যখন কোন কাজ হচ্ছিলনা কতিপয় দুঃসাহসী ব্যক্তি বিপ্লবের হাতিয়ার হাতে তুলে নেয়। মনে হচ্ছে বিপ্লব সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান না থাকায় যে কাজ করা হল তা ছিল কাঁচা সন্ত্রাসবাদ। তবুও তারা মহান দেশপ্রেমিক ও আন্তরিক। সেদিন তাদের মূল্যায়ন হয়নি সত্য, এখন তারা জাতীয় বীরের মর্যাদায় সমাসীন।[৪৯]

সাম্রাজ্য নিবিঘ্ন রাখার জন্য পথ আবিষ্কারের দরকার। এবার একজন কূটকৌশলী দক্ষ সহযোগী এগিয়ে এলেন; তিনি মহামান্য আগাখান এবং তাঁর ভাবশিষ্য বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী। ইতিমধ্যে আলীগড় কলেজের প্রিন্সিপাল বেক সাহেবের পরামর্শে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাম্রাজ্য বাদী বিভেদনীতি প্রচারের জন্য একটি মহা সুযোগ হয়ে গেছে। ঐতিহাসিকভাবে অবশ্য পিছিয়ে পড়া সমাজের মঙ্গালের জন্য সংগঠিত প্রচেষ্টা কখনই নিন্দনীয় হতে পারে না, বরং প্রশংসনীয়, যদি তা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। দেন দরবার করে সিমলা ডেপুটেশনের ব্যবস্থা হয়। মর্লে-মিন্টোর সংস্কারের মহা নোসখা ভারতীয়দের উপর চাপান গেল। উদ্দেশ্য গণতন্ত্রে উত্তরণ নয় – সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করা হল; হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্তদের মধ্যকার বিভেদ মেটানোর নামে কেউ কারও নিকটবর্তী হবে না, অথচ বিভেদ থাকবে, কায়েমী স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকবে, তবে জন সাধারনের অগোচরে– এতে ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি স্থায়ী হবে, শাসকরা আরামে থাকবে।

৩) সিন্ধী ও কাবুল মিশন; এক নয়া পথের যাত্রীঃ

কিন্তু মানুষ যা চায় তা কি সব পায়? বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পরপর দুটো ঘটনা ঘটে যায়; ক) বলকান যুদ্ধ; ২) প্রথম মহাযুদ্ধ। প্রথম ঘটনাটি ভারতীয় অভিজাত মুসলমানদের ভীষণভাবে স্পর্শ করে। তাদের অভিজাত শ্রেণীর একটা প্রধান অংশ অতি দেশীবাদে (Extre Territorialism) অহেতুক বিশ্বাসী ছিল, এটা তাদের মধ্যে ভাব বিপর্যয়ের একটা বড় লক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

তারা উসমানীদের পাশে দাঁড়াতে এবং সাহায্য করতে চায়; কিন্তু কীভাবে? বিশ্বে লগ্নিপুঁজির সৌজন্যে ধনতন্ত্র যে সাম্রাজ্যবাদী রূপ নিয়েছে – তারা ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা চরমে পৌছে গেছে। এসব বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত না করেই, না বুঝেই ইসলামী উম্মাহ প্যান-ইসলামের ঘাড়ে চড়ে। রোগটি ভারতীয় মুসলিম অভিজাতদের *পূর্ব হতে মর্জ্জায় ঢুকে পড়ে। কাজেই তারা নিরাশ হয়েছে; তবে বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি তাদের* মোহ কাটতে শুরু হয়। এটা ছিল মন্দের ভাল। সৈয়দ আহমদের ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার নীতি যেটা মুসলিমলীগের আদর্শ, তা প্রশ্ন বিদ্ধ হওয়ায়– সাময়িকভাবে মুসলিমলীগ পিছে হটে যায়। অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় বুদ্ধিজীবীরা লীগনীতি সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে– এতে ভারতীয় মুসলিম সমাজে নয়া চেতনার আভাস মেলে।[৫০]

প্রথম মহাযুদ্ধে দেশে ব্রিটিশ চান্ডু শাসন প্রবর্তিত হয়; দেশে উঠতি ক্ষুদ্র বুর্জোয়া শ্রেণী বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে এতে লাভ হল স্বদেশী যুগের তুলনায় তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা একটু দৃঢ় হয়; দেশের বাস্তব অবস্থায় এটা কম কথা নয়। অনেক তরুণ দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে ভারতমাতার মুক্তির সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে। গদর আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।[৫১] ভারত ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে এরূপ অবস্থায় দেওবন্দের মহান ব্যক্তি মাহমুদুল হাসান সন্ত র্পনে মাতৃভূমির মুক্তির সাথে মুসলিম সমাজের মঙ্গল কামনায় উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে কাবুল মিশনে প্রেরণ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনিশ্চিত উদ্ভ্রান্ত রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে রাজনৈতিক অঙ্গনে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর পদচারণা ছিল যেমন চমকপ্রদ্দ তেমনি আশা ব্যাঞ্জক। সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার অর্ধ শতাব্দী পর মাতৃভূমি উপমহাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির স্বপ্নের আশার বর্তিকা নিয়ে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ১৯১৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সিন্ধীর কাবুল গমন যেমন ছিল রোমাঞ্চকর কাহিনী, তেমনি দেশের মুক্তি সংগ্রামে এক নয়া দিগন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এটা কিন্তু আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এ পথে কেবল *তিনিই একা পা বাড়াননি। অনেক হিন্দু-মুসলিম তরুণ এখন এজন্য স্মরণীয়।*

ব্রিটিশ ভারতের মুক্তি সংগ্রামে কেবল নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির কথাই প্রধানত বলা হয়ে থাকে এবং বাস্তবে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেসের অহিংসা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে– তা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু এই পদ্ধতি গ্রহণ করার পশ্চাতে সশস্ত্র বিপ্লবের পদ্ধতির অবদানে কোন গৌরব নেই সে মূল্যায়নও আদৌ যথার্থ নয়। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধানরূপ হল নিয়মতান্ত্রিক এবং চীনে সশস্ত্র বিপ্লবই ছিল তার প্রধান রূপ; চিনে সশস্ত্র বিপ্লবের তত্ত্ব ও অনুশীলন যেভাবে বিকশিত হয়েছিল, ভারতীয় উপমহাদেশে তা হয়নি। এটা সম্ভাবত এদেশের ঐতিহাসিক বিকাশক্রমেরই ফল। সমগ্র চীন কখনই ভারতের মত পূর্ণ ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত হয়নি, এর আংশিক ঐপনিবেশিক হলেও কেন্দ্র আধা উপনিবেশে পরিণত হয়। চীনে ছিল নানা ঔপনিবেশিক শক্তির সমাবেশ, ভারতে ছিল একমাত্র ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং এখানে প্রথম ব্রিটিশ বণিকপুঁজি বিকশিত হয় এবং কোম্পানী শাসনাধীনে তা শিল্পপুঁজি ও পরে লগ্নিপুঁজি, সাম্রাজ্য বাদী রূপে বিকশিত হয় এবং তা এত নিখুৎ পদ্ধতিতে বিকশিত হয় যা দেশের মধ্যবিত্তদেরকে বিপ্লবের পথ পরিহার করে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সহযোগিতা ও সংস্কারের পথ প্রশস্থ করা হয়– এতে ইংরেজদের শাসন সৈকর্যের প্রমাণ মেলে। সকল বিদ্রোহী তৎপরতা দক্ষতার সাথে নির্বাপিত করা সম্ভব হয়। প্রথম মহাযুদ্ধকালে সিন্ধীর কাবুল মিশন ব্যর্থ হয়; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন নেতাজী সুভাষ বসুর জয় হিন্দু বিপ্লব ব্যর্থ হয়।

সিন্ধী ছিলেন মূলত দেওবন্দী চিন্তা ধারার বাহক। এ চিন্তা ধারার মর্মবস্তু ছিল : তুর্কী সেনা বাহিনী কাবুলের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ ভারতে আক্রমণ পরিচালনা, একই সাথে দেশের অভ্যন্তরে গণ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ভারত হতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটান; তুর্কী অভিযান পরিচালনার জন্য ভারতীয় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত উপজাতি পাহাড়ী এলাকায় একটি মুক্ত অঞ্চল গঠন, কাবুলে অস্থায়ী ভারতীয় সরকার বিষয়টি সঠিক পথে নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য কাবুল সরকারের সহানুভূতি সদিচ্ছাও অনুমোদন লাভ করা।

এই কাবুল মিশনের ব্যার্থতার সাথে দেওবন্দী চিন্তাধারার অথবা মিশন প্রতিনিধির ব্যক্তিগত ব্যর্থতা একাকার করা চলে কি? সম্ভবত মিশনের সাফল্য বা ব্যর্থতা কোনটাই বিবেচ্য নয়। এই মিশনের পশ্চাতে যে মতাদর্শগত প্রশ্ন এবং যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল সেটাই মূল বিবেচ্য। দেশ মাতৃকার জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তিই ছিল দেওবন্দী চিন্তাধারার উৎস মুখ। আলীগড়ের চিন্তাধারায় এটা ছিল বিপরীত স্রোত। তাই তাদের রণনীতি ছিল সঠিক, তাতে কোন অস্পষ্টতা, আবিলাস, দিধাচিত্ততার অবকাশ ছিল না। শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে স্বাধীনতা অর্জন একটি রণনীতিগত প্রশ্ন। এর রণকৌশল সম্পর্কে আজকের চোখ দিয়েই বাস্তবতার নিরিখে বিচার্য।

ঐতিহাসিক বিচারে উনিশ শতকের সত্তরের দশক হতে প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪–১৮) সমাপ্তি পর্যন্ত আর একটি অন্তবর্তীকালীন ঐতিহাসিক যুগপর্ব বলে মেনে নেয়ায়ই যুক্তি সংঙ্গত। বিশ শতকের প্রারম্ভিকা মূলত উনিশ শতকের জের। উদীয়মান ইউরোপ তখন কেবল বিশ্বনিয়–ন্তার ভূমিকায় অবতরণ করেনি বরং তাদের প্রভাবে এশিয়া আফ্রিকার আনাচে কানাচে সর্বত্র নয়া ধনতান্ত্রিক আর্থ–সামাজিক, সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সবক গ্রহণ করছে। এটা একটা অভূতপূর্ব অবস্থা। এরূপ পরিস্থিতিতে রণকৌশলগত প্রশ্নটাই সর্বাগ্রে গণ্য। সভ্যতার ঐতিহাসিক নিরিখে ভারতীয় মধ্যযুগ তথা সনাতন সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার রূপান্তর (যতটুকু হোক না কেন) এবং নয়া সভ্যতা, সংস্কৃতির উদ্বোধনের সৃষ্টি এক যুগ সন্ধিক্ষণ; আধ্যাতিক রহস্যবাদী চেতনার দিনশেষ। এরূপ অবস্থায় ইতিহাসের রায়– মধ্যবিত্তের বিকাশোন্মুখিতার দিকে, বিপ্লবের লক্ষ্য এই বাস্তব–তার লক্ষ্যের পরিপূরক হতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক রণকৌশলই গ্রহণ যোগ্য। একই সাথে নেতৃত্বের প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ গণ মানুষের আকাঙ্খা প্রতিফলিত হতে হবে এমন কৌশলের প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ ফরাসী বিপ্লবের কথাই বলা যেতে পারে। এটা ছিল সামন্ত একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া বিপ্লব। কিন্তু এর সাফল্যে ছিল কৃষক শ্রমিকের অগ্রগামী অবদান।

উল্লিখিত ভারতের অভিনব পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের শেষার্ধ হতে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জন, দেশের সংঘাত ও ঐক্য বিধান ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল একমাত্র কাম্য, তবে ঘড়ির কাটা পিছিয়ে দিয়ে নয়। বরং এগিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের কৃষক

Dhaka University Institutional Repository

এবং কারিগর শ্রেণী বাঁচলেই মধ্যবিত্তের বিকাশের পথ মসৃণ হয়– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউরোপের নয়া আর্থ-সামাজিক রূপান্তর এবং বিপ্লব বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রয়োজন ছিল চমৎকার বিপ্লবীতত্ত্ব ও তার সঠিক অনুশীলণ। চীন সঠিক তত্ত্ব সঠিক প্রয়োগ ও সঠিক অনুশীলন করে জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করে তা কোনক্রমেই *সমাজতান্ত্রিক নয়।*

আজকের একবিংশ শতাবদীর আকাশ সংস্কৃতির যুগে সবিনয়ে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় – সন্দেহ নেই দেওবন্দ চিন্তাধারায় দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনের রণনীতি সঠিক, কিন্তু তার বাস্তবায়নের রণকৌশল কি বাস্তব সম্মত ছিল? তার পশ্চাতে কী 'রহস্যবাদী' চেতনা কার্যকর ছিলনা? তাঁরা কি আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় উসমানী শক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিল? তারা কি জানত উনিশ শতকে প্রধানত বলকান এলাকা ঘিরে ইউরোপীয় রাজনীতিতে Eastern Question বা প্রাচ্য সমস্যা কি?[৫২] সরাসরি উসমানী সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে রুশ- ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে আর্থ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তারা কি সে সম্পর্কে কোনরকম জ্ঞান রাখতেন? তারা কি উসমানী সাম্রাজ্যকে ইউরোপের 'রুগ্ন মানুষ' বলে অভিহিত করত না? এবং তাকে কি ভাগাভাগিকরে নিজেদের মধ্যে বন্টনের প্রস্তাব ছিল না? তারা কাবুলের প্রকৃত অবস্থা কী; কাবুল যে তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘুটি এবং সাম্রাজ্য বাদীদের দয়ায় বেঁচে আছে – একথা তারা অনুধাবন কেন করতে পারলনা?

আত্মশক্তির উদ্বোধন – আধুনিক সভ্যতার মূলকথা। দেওবন্দী চেতনায় আত্মশক্তির (আধ্যাত্মিক শক্তি না) প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ না করে প্রথমেই ভ্রান্ত পথে পা রেখেছিলেন নিছক প্যান-ইসলামী ভাবোচ্ছাস ও আবেগের ঝোঁকে উসমানী সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর করেছিল। এটা একটা ঐতিহাসিক ভ্রান্তি; অষ্টাদশ শতকের প্রথম হতে দিল্লী চিন্তা ধারা এ রোগেই আক্রান্ত ছিল। অথচ গভীরভাবে দেখলে দেখা যায় যে তারা অনেকাংশে ভারতীয় স্বকীয়তার কথা ভাবছেন বলেই কোরানের ফার্সি ও উর্দ্দু অনুবাদ করার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন এবং ওলিউল্লাহ তো নিজস্ব ইলমুল কালাম নয়া ভারতীয় তর্কবিদ্যা গড়তে চাচ্ছেন। – কিন্তু তা বিকশিত হলনা। কারণ দিন বদলে গেছে। আধুনিক চোখে কাবুল মিশনের মত একটি অতীতের এরূপ মূল্যায়ন এর অর্থ কোনক্রমে সেদিনের ঐ মহান ব্যক্তিত্বের অবমূল্যায়ন নয়। তিনি সেদিনের সামাজিক সত্ত্বার একজন হয়েও এবং আধুনিক আন্দোলনের কার্যকৌশল হতে দুরে অবস্থান করেও অনেক অগ্রগামী চিন্তা করতে পেরেছিলেন। এতেই তার মাহত্ম। যদি তার মূল চেতনা বিকশিত হতে পারতো, তাহলে ব্রিটিশ উপনিবেশীক দুরদর্শী বৌদ্দিক সতর্ক ও সজাগ পদক্ষেপ ভারতীয় বিপ্লবকে সংস্কারের পথে প্রবাহিত করতে পারতো না। এটাই অতীতের ঘটনার প্রকৃত ঐতিহাসিক মুল্যায়ণ। বস্তুত ইতিহাস একযুগের এমন বিষয়ের নথি যা অন্য যুগেও উল্লেখযোগ্য। বর্তমানের আলোকেই অতীত বোধগম্য হয় এবং বর্তমান কেবল অতীতের আলোকেই পুরোপুরি বুঝা যায়। অতীতের সমাজ বুঝতে মানুষকে সক্ষম করা এবং বর্তমান সমাজের উপর তার দখল বাড়ায় – এই হল ইতিহাসের দ্বিমুখী কার্যধারা।[৫৩]

কাবুল মিশন প্রেরণের পর মাহমুদুল হাসান দ্রুত একটা বড় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার সর্ব প্রথম স্বপ্ন দ্রষ্টা ছিলেন আব্দুল আজীজ

Dhaka University Institutional Repository

দেহলবী। ১৮০৪ সালে দিল্লী যুদ্ধের পর সামন্ত মধ্য শ্রেণীর মধ্য হতে জনগণের পক্ষে কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ শুনা যায়নি। দিল্লীর সনাতনী জ্ঞান চর্চায় নিবেদিত শাহ ওলীউল্লাহর পুত্র অগ্রগামী হয়ে সামনে এসে জিহাদের ফতোয়া জারী করেন। এই ফতোয়ায় জিম্মীদেরকে সাথে নিয়ে কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে শামিল হওয়ার আহ্বান ছিল। মাহমুদুল হাসান *তাঁর গুরুদেবের ফতোয়ায় মর্মার্থকে সম্প্রসারিত করতে পেরেছিলেন। মোগল সরকারের* অনুপস্থিতিতে সকল জিম্মী পূর্ণ নাগরিক। সকল নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ চালানোই ছিল ঐ ফতোয়ার মর্মবস্তু।

সিন্ধীর প্রতি মাহমুদুল হাসানের নির্দেশ ছিল কাবুলে উপস্থিত সব ভারতীয় জঙ্গীদের নিয়ে একটি অস্থায়ী জাতীয় ভারত সরকার গঠন। উল্লেখ্য এই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ ভারতের বাইরে একটি অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন ছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। সিন্ধীর গঠিত কাবুলে অস্থায়ী ভারত সরকারের সভাপতি ছিলেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, অধ্যাপক বরকতউল্লাহ প্রধানমন্ত্রী এবং সিন্ধী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।[৫৪] স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের বেশ কিছু তরুণ বুদ্ধিজীবি মাতৃভূমির মুক্তির চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েন। তাদেরই একজন মহেন্দ্র প্রতাপ। মুক্তির সন্ধানে তিনি ইটালী, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স ভ্রমণ করে জেনেভায় ভরতীয় বিপ্লবী হরদয়ালের সাথে পরিচিত হন।[৫৫] হরদয়াল জার্মান কনসালের সাথে মহেন্দ্রকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং উভয়ই বার্লিনে পৌঁছান। হরদয়াল মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকতুল্লাহকে কাবুলে প্রেরণ করেন। এভাবে কাবুলের অস্থায়ী সরকারের সাথে বার্লিন সরকারের কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হরদয়াল বার্লিন থেকে কাবুলের অস্থায়ী সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ কূটনৈতিক সম্পর্কটি অনেক খানিক আকস্মিকভাবেই দ্রুত গড়ে ওঠে। বৃহৎ শক্তির সাথে লড়তে হলে এরূপ শক্তির সাহায্য ও সহানুভূতির প্রয়োজন অনস্বীকার্য এবং এরূপ পদক্ষেপ সময়উপযোগী বলে মনে হয়, তবে আধুনিক বাস্তবতায় মনে হচ্ছে অস্থায়ী সরকারকে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে অগ্রসর হওয়ার দরকার ছিল। তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতি– মিত্রপক্ষ ও অক্ষ শক্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল – কে কতটুকু এবং কীভাবে সাহায্য করতে পারে সে হিসাবটি অস্থায়ী সরকার কি করতে পেরেছিল? অস্থায়ী সরকার সম্ভবত ব্রিটিশ ভারতের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা ভালভাবে জানত বলেও মনে হয় না। রাজনীতিতে ভাবালুতা উচ্ছ্বাসের কোন স্থান নেই। ঐ কূটকৌশল খুব কাজে এসেছিল বলে কোন প্রমাণ নেই। এসব বিচ্যুতি সত্ত্বেও যে কাজটি করা হয়েছিল তার পশ্চাতে সদিচ্ছা, আন্তরিকতা ও দেশ প্রেমই ছিল বড় কথা।

৪. সিন্ধী ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ:

প্রথম জীবনে সিন্ধী আদৌ জাতীয়তাবাদী ছিলেন না বরং প্যান–ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাসী। নিঃসন্দেহ আবাল্য তিনি স্বাধীনতাকামী এবং ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন। এটা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। 'পাঞ্জাব বিপ্লব' (১৮৪৬–৪৯) এর বেদনা দায়ক কাহিনী তার মনে স্থায়ী রেখাপাত করে।[৫৬] ছাত্রজীবনে দেওবন্দী চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় ইসলাম এবং ব্রিটিশ বিরোধীতার সাথে তার ধর্মীয় চেতনা একই সুরতালে বাধা পড়ে। এ চেতনা যতই প্রখর হয় ততই তিনি একই সাথে উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু–মুসলিম ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া ভারতের মুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

অসম্ভব। এ বিশ্বাস তাঁর আমৃত্যু অটুট ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি উপলবিব্ধ করতে পারেননি যে, প্যান-ইসলাম এবং ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ মূল বৈশিষ্ট্যের দিক হতে স্ববিরোধী – কখন কখন বিশেষ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হলেও হতে পারে, তবে তাহা সাময়িক ব্যাপার, স্থায়ী নয়।

উসমানী সাম্রাজ্যের বাস্তব অবস্থাটি কী ছিল? ১৭৭৪ সালে রাশিয়া কুচাক কাইনাওয়াজীর মত অবমাননাকর চুক্তি তার উপর চাপিয়ে তাকে অবক্ষয়ের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দেয়। ফরাসী বিপ্লবকালে সেলিমের নেজামে জদীদ পরিকল্পনা, সুলতান মাহমুদের প্রশাসনিক সংস্কার এবং সর্বোপরি আব্দুল মজিদের অকার্যকর তানজিমাত যুগের প্রস্তাবনা তার আর্থ-রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা এবং ইউরোপীয় শক্তির অধীন আধা উপনিবেশবাদ – আধা সামন্ত তন্ত্রে নিপতিত হওয়ার উজ্জ্বল লক্ষণ। তার প্যান উসমানিজম, প্যান ইসলামীজম গ্রহণের প্রচেস্টা নয়া জীবন সংস্কার করতে পারেনি বলে যুবতুর্কী আন্দোলন এবং অবশেষে বিশ্বরাজনীতির আবর্তে পড়ে জার্মন পক্ষে যোগদান এবং অবশেষে মহাপরাজয় বরণ ছিল তার ঐতিহাসিক নিয়তি। সনাতনী বিদ্যাপিঠে এসব ঘটনা প্রবাহের কোন পরিচয় ছিল না।

ইসলামী উম্মা যে নিছক কল্পনার ফানুস – উবায়দুল্লাহ সিন্ধী কাবুলে পৌছোনোর পরই টের পেলেন। মাহমুদুল হাসান যখন হেজাজে গিয়েছিলেন মক্কার শরিফ হোসেনের নেতৃত্বে *তুর্কী সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে মক্কার জাতীয়তাবাদ সংগঠিত হয়। শরিফ বাহিনী মাহমুদুল* হাসানকে গ্রেফতার করে।

সশস্ত্র বিপ্লবের রণকৌশল কাবুল মিশনে প্রতিফলিত হয়নি। বিপ্লবের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বিপ্লবের শত্রু-মিত্র, পক্ষ-বিপক্ষ সম্যাক উপলব্ধি, নিখুত জ্ঞান। বিপ্লব সংঘটনের জন্য নির্ভর করতে হয় আত্মশক্তির উপর। আত্মশক্তির উদ্ভাবনে প্রধানত নির্ভর করতে হয় স্বদেশ বাসীর উপর। স্বদেশের আপামর জনতা হয় মূল শক্তি। এই মূল শক্তিকেই উজ্জীবিত, সংগঠিত, সচেতন করে তুলতে হয়; তাদের জাগরণে বান্ধব কর্মসূচির প্রয়োজন। এরূপ সুশিক্ষিত, সংগঠিত বাহিনী নিয়ে দেশের কৌশলগত সুনির্বাচিত স্থানে মুক্ত এলাকা গঠন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। বাইরের বন্ধু শক্তির সন্ধানও জরুরী এবং সতর্কতার সাথে তাদের সাহায্য গ্রহণ নীতি অবলম্বন করতে হয় এবং মুক্ত এলাকা হতে দেশের অভ্যন্তরে গণ অভ্যুত্থানের প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে হয়।

মাহমুদ হাসান ছিলেন সমগ্র ভারত বিপ্লবের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা; কিন্তু তার সতীর্থগণের প্রায় সকলের জীবন বাধা ছিল মোটামুটি সামন্ত স্বার্থের সহায়ক শক্তিরূপে – তাই তাদের কৃষক জনতার স্বার্থ রক্ষার কোন শ্লোগান ছিল না, কর্মসূচি ছিল না; তাদের পথ ছিল আত্মহননের। দেশ ছেড়ে কোথায় হিজরত করবে? এসব দুর্বলতা সত্ত্বে তার মূল চেতনার প্রতি সাধুবাদ।

কাবুলে প্রথম সিন্ধীর মধ্যে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদী চেতনার সূচনা হলেও আরও অনেক পরে তাঁর মনে স্থিরতা পায়। কাবুলে অবস্থান কালে কাবুলে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা তিনি গঠন করেন এবং ঐতিহাসিকভাবে এটাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা ছিল। ১৯২২ সালের শেষে কাবুল ত্যাগ করে সোবিয়েত

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়নে প্রায় সাত মাস ছিলেন অবশ্য ভারতীয় কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে। এখানে তাঁর মানসিক প্রবনতা খুব স্পষ্টভাবে ধরা না পড়লেও সামান্য হলেও সমাজবাদের প্রভাব পড়েছিল।[৫৭] আঙ্কারায় প্রায় তিন বছর অবস্থান করেন। তুরস্কে এ সময় কামাল পাশার নেতৃত্বে সচেতনভাবে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদী স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়। উল্লেখ্য এটাই প্রাচ্যের সর্বপ্রথম *জাতীয়তাবদী রাষ্ট্র এবং লেলিন তাঁর কার্যকলাপকে কামালবাদী বলে আখ্যায়িত করেন।* তুরস্কে অবস্থানকালে তাঁর মন হতে খেলাফতের মিথ এবং প্যান ইসলামের মায়া মরিচিকার অবসান হয়। সম্ভবত এখানেই তাঁর মধ্যে কল্পিত প্যান ইসলামী ভাবমূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়- এরপর আমৃত্যু তাঁর মধ্যে প্যান ইসলামের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি।

১৯২৫ সালে সিন্ধী হিজাজে গমন করেন। এসময় মক্কায় মোতামারে আলমে ইসলাম – সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে কয়েকজন ভারতীয় পন্ডিতদের যোগদানের কথা ছিল। তিনি তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতেই আসেন। এসময় মক্কায় শরিফ হোসেনের আরব জাতীয়তাবাদ উৎখাত হলেও নজদী ওয়াহাবীরা এখানে আরব জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। মক্কার এই নাজুক পরিস্থিতিতে সম্ভবত নজদী সরকারকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি কোনক্রমেই প্যান ইসলামী নন। তিনি কোন রাজনীতিও করেন না – এভাবে এখানে দীর্ঘ বার বছর নিরাপদ জীবন যাপন করার সুযোগ পান।[৫৮] কাবুল মিশন একটি ব্যর্থ অতীত; দেশে ফেরার কোন পথ নেই, যোগাযোগহীন বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ ব্যক্তি তিনি, একজন উম্মুল অভিবাসীর জীবনের মধ্যপথে তার মনে যে প্রবল ঝড় উঠেছিল সে কথা তিনি উল্লেখ না করলেও তা সহজে অনুমেয়। তাঁর অস্থির মানসিক অবস্থায় কি স্থিতিশীলতা আসতে পারে? তবে তিনি মানসিক ভারসাম্য কিন্তু হারাননি। মক্কায় স্বদেশী পন্ডিত আব্দুল ওয়াহাব দেহলবী, আব্দুল মজিদ দেহলবীদের সাথে আলোচনার পর পুনরায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার জীবনে ফিরে আসার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এছাড়া তাঁর পক্ষে অন্য কিছু করার পথ ছিলনা।

বিশ্বরাজনৈতিক কূটনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা, সোভিয়েত ইউনিয়নে নয়া সমাজ বিপ্লবের অভিজ্ঞান, তুরস্কে কামালবাদের অভিজ্ঞতা, ইউরোপ হতে সংগৃহীত নয়া জ্ঞানভান্ডার – *তিনি চাইলেই কি ভুলতে পারবেন? জীবনবাদী তিনি; বেঁচে তাকে থাকতেই হবে।* জীবনের অভিনব অভিজ্ঞতার আলোকে কি সনাতনী জ্ঞান চর্চায় আত্ম নিয়োগ করতে পারবেন? তাঁর মধ্যে সৃষ্ট অন্তরদৃষ্টি দিয়ে শাহ ওলীউল্লাহর দর্শন চর্চাই তাঁর একান্ত কাম্য হয়ে ওঠে। প্রথমেই অনেক দিন পর পুনঃপাঠ করেন ওলীউল্লাহর হুজ্জতুল্লাহেল বালেগা। দ্রুত ওলীউল্লাহ দর্শন আয়ত্ব করেন এবং মক্কাতে ওলীউল্লাহ দর্শন কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং কেন্দ্রে নিয়মিত ওলীউল্লাহ দর্শন পাঠ দিতে থাকেন। তাঁর নয়া যুগ চেতনার সাথে সনাতনী জ্ঞান চর্চায় কি তিনি সুষম সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন? এভাবে কেটে যায় বার বছর।

১৯৩৬ হতে ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস সহ অনেক মহল তাঁর মত একজন সাহসী সেনানী, প্রজ্ঞাবান অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ, রাজনৈতিক বিশারদ, সুপন্ডিত লেখককে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকে এবং তাঁর শিষ্যভ্রাতা মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর অনুরোধে তাঁর মন স্থির করতে সাহায্য করে বলে মনে হয়।[৫৯] ১৯৩০ সালে প্রবাসে লেখা তাঁর 'যাতি ডায়েরী' যা তাঁর প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। যাতি ডায়েরীর একস্থানে তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর প্রিয় কর্ম হবে এদেশে শাহ ওলীউল্লাহর দর্শন জনপ্রিয় করা এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল উচ্চশিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মানুষ যত কথাই ভাবে, কিন্তু সব কি করা যায়; বিমূর্ত ভাবনার সাথে বাস্তবতার কি সবসময় মিলন হয়?

১৯৩৯ সালে সিন্ধী দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর বয়স সত্তর ছুঁই ছুঁই (১৮৭২-১৯৩৯)। দীর্ঘদিন নির্বাসন জীবন কাটিয়ে দেশের মাটি যখন স্পর্শ করেন তখন নিশ্চয় রোমাঞ্চ অনুভব করেন, তা সহজে অনুমেয়। দেশের প্রতি মায়া দেশের প্রতি তাঁর ঋণ কীরূপে পরিশোধ করবেন? কিছু করার প্রবল আকাঙ্খা থাকলেও ইতিমধ্যে তাঁর প্রাণশক্তি যে অনেকখানি নিঃশেষিত। মুচলেখা না দিয়েও দেশে ফিরতে পারেনি। অনেকেই তাই অনেক কিছু ভাবতে পারে। তিনিও কি আস্থার সংকটে পড়বেন? এম.এন রায় দেশে ফিরে কি করেছেন? তিনি কি কোথাও দাঁড়াতে পেরেছেন? অনেক জীবনে এটা একটা বাস্তবতা।

সিন্ধী দেশে ফিরলেন বটে, কিন্তু দু'মহাযুদ্ধে অন্তবর্তী কালীন সময়ে দেশের ঘটনা প্রবাহের সাথে তিনি আদৌ পরিচিত ছিলেন না; খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ এবং এর হঠাৎ স্তব্ধ হওয়ার প্রবল প্রতিক্রিয়া, গান্ধিজীর উত্থান ও তাঁর প্রতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টির চ্যালেঞ্জ, সাইমন কমিশন, জিন্নার বিলাত গমন, আইন অমান্য আন্দোলন, গোলটেবিল বৈঠক, ১৯৩৫ সালের ভারত আইন ইত্যাদির ঘটনায় দেশে এক নবতর বাস্তবতার মুখোমুখী।

সিন্ধী এখন একজন পরিবর্তিত ব্যক্তি; প্রথম জীবনে সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম অধিনায়ক; জীবন সায়াহ্নে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির একজন সোচ্চার প্রবক্তা, প্রথম জীবনে একজন প্যান-ইসলামবাদী, এখন তিনি একজন একান্ত জাতীয়তাবাদী। জীবনের প্রথমাংশ ও শেষাংশের পার্থক্য আকাশ পাতাল।

৫. জীবন সায়াহ্নে সিন্ধীর কিছু চিন্তা ভাবনা :

জীবন সায়াহ্নে মাত্র কয়েকটি বছর (১৯৩৯-১৯৪৪) মাতৃভূমির সংস্পর্শে কাটানর সৌভাগ্য হল। জীবনের প্রথম হতে আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ ব্যক্তিটি সব ঝড় ঝঞ্জার মধ্যেও আমৃত্যু জীবন বাদী ছিলেন – জীবন হতে পলায়ন করেননি; তার বৈচিত্রময় জীবনে আগাগোড়া মূল চেতনায়, চিন্তার একটিই অটুট ঐক্য সূত্র বর্তমান ছিল, কোথাও চিন্তার খেই হারিয়ে যায়নি। তাঁর চেতনায় মর্মবানী ছিল স্বদেশ ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তি; সেইসাথে তিনি যে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে আপনাকে অঙ্গীভূত করেছিলেন- অন্য কারও প্রতি সামান্যতম অবিচার না করে, তাদের সুখ-দুঃখে তাদের মঙ্গল কামনা করা। কিন্তু ঐ ঐতিহ্যবাহী সমাজের বাস্তব অবস্থা বিপর্যয় ঘটায় তাদের যে ভাব বিপর্যয় হয়- এবং সেটাই ইতিহাসের রায় – তাই তাঁদের উদ্ধার ও তাদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন শেষ জীবনে নেশায় পরিণত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্যে বাহুল্য থাকতে পারে; অহংবোধ থাকতে পারে, ভাষায় অতিরঞ্জণ থাকতে পারে- সেগুলো বাদ দিলে আগাগোড়া তার চিন্তা একই সুরে বাধা ছিল। তার চেতনার মূল সূত্রের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অন্যতম আদর্শ পুরুষ হয়ে বেঁচে থাকবেন– আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে।

করাচির জাহাজঘাটে তাঁকে সাদর অর্ভ্যথনা জ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন মতাদর্শের, বিভিন্ন স্তরের গণ মানুষের ঢল নেমেছিল। সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লা বখ্শ খান তাঁকে সুস্বাগত জানান। এতদিন পর দেশে এসেই তার সমস্যা হল; কার আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করবেন?[৬০] একটা কথা তিনি আদৌ অস্পষ্ট রাখেননি– তা হল তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল মুসলিমলীগের সাথে কোন সম্পর্ক নেই এবং তা রাখতেও চাননা। তাঁর সম্পর্ক আছে জাতীয় কংগ্রেসের সাথে; প্রবাসে তিনি কংগ্রেস শাখা গঠন করেন এবং রাশিয়ায় তিনি ছিলেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে। আদর্শগত কারণে তিনি কংগ্রেস পার্টি ত্যাগ করতে পারেননি।[৬১] কংগ্রেসীদের সাথে উঠা বসা আলাপ আলোচনা মত বিনিময় করতেন; যেহেতু তিনি কখন এরূপ রাজনৈতিক পার্টির সাথে কাজ করেননি, তাই তিনি পার্টি শৃঙ্খলা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন না। পার্টি নেতৃত্বের সমালোচনা করতেন, অথচ আমৃত্যু কংগ্রেসে ছিলেন– যদিও তিনি স্থপতির মর্যাদা লাভের সুযোগ পাননি। তিনি ভারত ছাড় আন্দোলন সমর্থন করতে পারেন না। এটা কি তাঁর সোভিয়েত প্রভাবের লক্ষণ?

ভারতীয় রাজনীতির একটি দুর্বলতার প্রতি তিনি খুব সজাগ এবং তা নিয়ে বেশ মাথা ঘামাতেন। এটা হল দেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িতকা। জীবনের প্রথম হতে যথার্থই তিনি বিশ্বাস করতেন যে এদেশের মুক্তির জন্য হিন্দু–মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই একমাত্র পথ। জীবন সায়াহ্নে দেশে ফিরে দেখলেন হিন্দু–মুসলমান মিলন সমস্যার সমাধান হয়নি। এই সমস্যা বারবার মাথায় পাক খেয়েছে এবং তিনি নিজের মত করে এ সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন –কোন বৌদ্ধিক চিন্তা কাঠামোতে এর উদ্ভব তার সমাধানের কথা ভাবেননি। এর পশ্চাতে যে দেশের আর্থ–সামাজিক অসম বিকাশে, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত, কায়েমী–স্বার্থের লিলাখেলা ইতাকার কত অস্বাস্থ্যকর উপাদান বিরাজমান – এর সমাধান কি মুখের কথায় হতে পারে? রাজনীতি হতে বিচ্ছিন্ন মানুষ কতদূর এ সম্পর্কে গভীরে যেতে পারে? আসলে একটি পরাধীন দেশের মূল রাজনীতি হবে দেশকে রাহু মুক্তকরা – তিনি সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ থেকেও সাময়িক চিন্তা হিসেবে সাম্প্রদায়িক হিন্দু–মুসলিম মিলন ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কিছু সমাধানের উদ্যোগ নিতে চাইতেন। প্রথমত, হিন্দু–মুসলিম অনৈক্যের মূল উৎপাটন করতে সকলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে– মধ্যযুগের ভারতীয় সুফীবাদের দিকে। ইবনুল আরবী ও সুহরওয়াদি সুফীদের মতামতের সারমর্ম হল অহদাতুল অজুদ বা সর্ব খোদা বাদ। সবাই এক আল্লাহর বান্দা কেন তাদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে উঠবে? অথচ এটাই হল ভারতীয় বেদান্তবাদের মূল কথা। বাদশাত আকবর ইবনুল আরাবী এবং বেদান্ত দর্শনের সংস্কার ও পূর্ণতা সাধন প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আকবরের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জীবন ধারার জন্য একটি রাজনৈতিক ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন। বাস্তব হতে দুরে মক্কায় বসে তিনি ভারতীয় পন্ডিত শাহ ওলীউল্লাহর দর্শনের এই সারমর্ম আবিষ্কার করেন; তাই তিনি ভেবেছিলেন ওলীউল্লাহ দর্শনের মাধ্যমে সনাতন ধর্মগুলোর মধ্যে একটি ঐক্যমত ও সেতু বন্ধন সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে মানবতার ক্রমাগত ইতিহাসের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এতে সকল ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পিপাসা নিবৃত করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

এসব চিন্তা সদ উদ্দেশ্য প্রণোদিত; কিন্তু ইতিহাস ও বাস্তবতা বিবর্জিত। মধ্যযুগে আকবর এবং আধুনিক যুগে রামমোহন একাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ইসলাম এবং হিন্দুত্ববাদ যতই মানবতার রঙে ভরে দেয়া যায় ধর্মের নামে কে তা গ্রহণ করবে? একথা সিন্ধী নিজেই উপলব্ধি করতেন বলে তিনি বলেন: প্রাচ্য সভ্যতা ধর্মভিত্তিক এবং আধুনিক পাশ্চত্য সভ্যতা ধর্ম নিরপেক্ষ, তাই *তা সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে।*[৬২] *পরলৌকিক চেতনা দিয়ে কি ইহলৌকিক বাস্তব* সমস্যার সমাধান হতে পারে? ওলীউল্লাহ দর্শন নিয়ে বেশি হইচই করেননি – যাহা অনেক ব্যক্তি তা ফাপিয়ে ফুলিয়ে বলেন।

তাঁর হিন্দু-মুসলিম মিলন সমস্যা হতে আর একটি তাৎক্ষণিক চিন্তার কথা ভেবেছিলেন। যদিও সে ব্যাপারে তিনি আদৌ একান্ত ছিলেন না। তিনি ভেবেছিলেন গঙ্গা যমুনা হল হিন্দু সভ্যতার উৎস মূল এবং সিন্ধু হল ভারতীয় ইসলামের সুতিকাগার; এ দু এলাকায় লোকদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করা সম্ভব হলে একটি জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারে।[৬৩] এই ভাবনা *হতে গঙ্গা যমুনা নর্মদা সিন্ধ স্যাগর প্যার্টি গঠনের চিন্তা করেছিলেন।* সবাই জানে এটা একটা কাগুজে পার্টি এবং এসব ভাবালুতা কোন সুচিন্তিত মতামত নয়। তাই এটাও সিন্ধীর মূল চেতনার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারে না।

ভারতের মুক্তি, স্বাধীনতা ও ঐক্য-সংহতি ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। যেভাবে এখানে অসম বিকাশ ঘটান হয়েছিল তাতে এর ঐক্যসংহতি বজায় রাখার ব্যাপারে তিনি সদা শঙ্কিত থাকতেন। তাই তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ঐক্যবদ্ধ ভারত রাখতে হলে কেন্দ্রে ফেডারেশন সরকার গঠন করতে হবে; যে অঞ্চলের অভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং তাদের তমাদ্দুনের দিক থেকে কাছাকাছি – সেই অঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্র স্টেটে পরিণত করতে হবে।[৬৪] তাঁর ফেডারেল পরিকল্পনা (সম্ভবত সোভিয়েত মডেলের প্রভাবে) একেবারে উদ্ভট নয়, তবে সেদিনের তুলনায় একটু বেশী অগ্রগামী। তাই কেউই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। এতে যে আদৌ কোন ইতিবাচক বিষয় ছিল না, তা নয়, বরং আধুনিক ভারত সেই পথেই যেতে চাচ্ছে।

ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ তাঁর মধ্যে দৃঢ়মূল ছিল এবং তাও ছিল পৈতৃক সূত্রে। তিনি ভারতীয় অভিজাত মুসলিম সমাজের একটি অংশের প্রচারনায় সাধারণ মুসলমান বিভ্রান্ত হয়ে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদের' ভ্রান্ত ধারণায় হাবুডুবু খেতে দেখে মর্মাহত হন এবং তাদের মধ্যে ঐ ভাব বিপর্যয়ের প্রতিবাদ করেন এবং তা করতে গিয়ে কিছু অবাস্তব অনৈতিহাসিক উচ্চারণ করেছেন এবং অতিশায়োক্তির আশ্রয় নিয়েছেন; এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁদেরকে সঠিক পথে আকর্ষণ করা, অন্য কিছু নয়।

১৯৩৩ প্রবাসে লিখিত 'যাতি ডায়রীতে' তিনি বলেন যে, হিন্দু যুবকরা এমত পোষণ করে যে, হিন্দুরাই মৌলিক ভারতীয় আর মুসলমানরা বহিরাগত বিজেতা জাতি। তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের একটি বড় অংশ Extre Territorialism এ বিশ্বাস করেন – এবং তাঁদের মুখ হতে এরকম উক্তি বেরিয়ে পড়াতে ইতিহাসের অনেক পাঠক একটি ভ্রান্ত ধারনার সমর্থন পেয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভারতের সাধারণ মুসলিম যারা সংখ্যায় অনেক অনেক বেশী – কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর লোকেরা পূর্ববর্তী হিন্দু সন্তান, তাই তারা

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকার সূত্রেই ভারতীয়। আর যেসব মুসলমান বিজেতা বেশে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তারাই প্রথম শ্রেণীর ভারতীয়।[৬৫]

ভারতীয় মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে অতিদেশীয়তার বিচ্যুতি লক্ষ্য করে তিনি মর্মাহত হন। এ বিচ্যুতির কারণের একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন তার নিজের মত করে। তিনি বলেন, ভারতের মুসলমানদের দৃষ্টি সবসময় বিদেশী সামরিক ও সাংস্কৃতিক সাহায্যের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা হতে এসেছে। অথচ কোন বহিরাগত পথ নির্দেশের উপর ভরসা বিষবৎ ত্যাজ্য। তিনি তার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হতে বলেন যে, একজন আরব যেমন আরব হওয়ার গৌরব বোধ করেন, তেমনি তিনি মুসলিম হওয়ারও গৌরব বোধ করেন। অথচ একজন ভারতীয় মুসলিম অন্য দেশে আরব ও ইরানে গেলে নিজেকে ভারতীয়তার প্রতি ঘৃণা বোধ করেন কেন? ভারতীয়তার সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই। তিনি আবেগ ভরে বলেন 'ভারতীয় মুসলমান' শব্দযুগলই ভ্রান্ত– এর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা ভারতীয় শব্দের আসল অর্থ হল মুসলমানরাই ভারতীয়। তাঁর মতে ভারতীয় হলো তারাই যারা ভারতের বিশৃঙ্খল, বিচ্ছন্নতা ও অস্থিরতা দূর করে শান্তি, ঐক্য–সংহতি সৃষ্টি করে সঠিক পথে এনে দিয়েছে। এই অর্থে আর্যরাই প্রথম ভরতীয় এবং মধ্যযুগে ঐ কাজ করে মুসলমানরাই প্রধান ভারতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। সিন্ধী মূলত থিওলজীর ছাত্র, আধুনিক ইতিহাস তাঁর জানার কথা নয়– তাই মুসলমানদের মধ্যে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ আবেগ সৃষ্টি করার জন্য একটি অন্যায় সিদ্ধান্ত টেনেছেন; মুসলমানরাই প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় এবং আর্যরা হল দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারতীয়।[৬৬] যা হোক তাঁর অনৈতিহাসিক বক্তব্য আমল দেয়ার দরকার নেই। ভারতীয় মুসলমান শব্দটিও অমূলক নয়; কলিমুল্লাহ এর দুটো পরিচয় ভারতীয়তা তার জাতীয় পরিচয়, এবং ইসলাম তার ধর্মীয় পরিচয়। হরিপদের ভারতীয়তা জাতীয় পরিচয়, হিন্দুত্ব তার ধর্মীয় পরিচয়। জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ইমানের অঙ্গ তাই কলিমুল্লাহ ভারতীয় মুসলমান হওয়ায় গর্ববোধ করেন। মাতৃভূমির রক্ষায় আত্মনিয়োগ করবেন – এটাই মূল ইসলামের শিক্ষা।

দীর্ঘদিন নির্বাসন জীবন যাপন করে সিন্ধী দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং জাহাজ ঘাটে সাদর সম্ভাসন জানানোর জন্য নানা দলমতের অসংখ্য লোক উপস্থিত হয়েছিলেন এবং প্রত্যেক দলই আশা করেছিল তিনি তাঁদের দলে যোগদান করবেন। কাউকে নিরাশ না করে একটি বিষয় জানিয়ে দেন যে তিনি মুসলিম লীগের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিটাই পছন্দ করেন এবং মুসলিম লীগের রাজনীতি মধ্যযুগের; এর সঙ্গে বর্তমানের কোন মিল নেই।[৬৭] ১৯৪১ সালের জুন মাসে মাদ্রাজ প্রদেশের কুম্বাকুনমে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আয়োজিত এক জনসভায় সভপতিত্ব করেন সিন্ধী। লাহর প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করে তিনি সকল মুসলমানদের ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখান করার পরামর্শ দেন।

লাহর প্রস্তাবের পর মুসলিমলীগ ভারতীয় মুসলীম সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এসব লক্ষণ দেখেও তিনি নীতির প্রশ্নে লাহোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মূল প্রশ্ন হল – ভারত ব্যবচ্ছেদ দ্বারা কী হিন্দু–মুসলিম তথা সাম্প্রদায়িক সমস্যার মিমাংসা হবে? তার ধারণা কখনই নয়; বরং অনেক অকল্পনীয় সমস্যা দেখা দেবে। এ প্রস্তাবে অবশ্য বেশ ভাল সংখ্যক মুসলিম জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী ও উঠতি মধ্যবিত্তরা উপকৃত হবে। ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

সুবিধাবাদী মুসলিমরা হয়ত পাকিস্তানে পাড়িজমাতে পারবেন এবং তাঁদের আরও ভাগ্য সু প্রসন্ন হতেও পারে। ভারত ব্যবচ্ছেদের পর নয়া পরিস্থিতিতে ভাগ্যবানেরা ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যাওয়ার সময় কী ঘৃণাক্ষরে ভাবতে পেরেছিলেন যখন চার কোটি মুসলমানদের কথা কি ভাবার অবসর হয়েছিল? তবে তাঁদের একজন বুদ্ধিজীবী ঐতিহাসিক ভেবেছিলেন, ভেবে বলেছিলেন যে, আগামী একশ বছরের কম সময়ে ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। (Ishtiyaq Hasain Quarishi, "The Foundation of Pakistani Culture, The Muslim War, XIIV, January, 1954)" কিন্তু ইতিহাসের রায় ছিল উল্টো। ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় থাকবে – এখন তারা চৌদ্দ কোটি। ভারত মাতার মুক্তি সংগ্রামে অসংখ্য গফফার খান অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীন গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গঠন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার জন্য অনেক আবুল কালাম আজাদ, হুমাউন কবীর, কিদওয়াই, আসফআলীগণ এগিয়ে এসেছেন। জাকির হোসেন আব্দুল কালাম, হুসাইন আহম্মদ মাদানী স্বাধীন ভারতের মুসলিম রত্ন। যারা ভারতের নাগরিক থাকবে তাদের জন্য এরা রচনা করেছিলেন ঐতিহ্য; এঁরাই তাদের আদর্শ নেতা। আবুল কালাম আজাদ, হুসাইন আহমদ মাদানীর সাথে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের ইতিহাসে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। মুসা আনসারী, 'বিশ শতকের ইতিহাস দর্শনে কার' এ 'ঐতিহাসিক ও তার তথ্য', ঢাকা- ২০০৭, পৃঃ ৮৬।

২। মুসা আনসারী, ইতিহাস: সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা 'এ প্রসঙ্গ: সংস্কৃতি ও সভ্যতা' ঢাকা-২০০৮, পৃঃ ১২৬-১২৯।

৩। মুসা আনসারী, 'ঐতিহাসিক কাল বিভাজন: একটি প্রস্তাবনা'। ঐ পৃঃ ৪৯-৫৪।

৪। P.K.Hitti, History of the Arabs, London-1951, P- 60-624.

৫। P.K.Hitti, ঐ, P- 519, 696, 93.

৬। Johone F. Cady, South East Asia: Historical Development, London.

৭। মুসা আনসারী, 'ইউরোপীয় রেনেসাঁসের উদ্ভব ও বিকাশক্রম'। ঐ পৃঃ ১৪০-১৫২।

৮। মুসা আনসারী, 'উসমানী সমাজ কাঠামোর রূপান্তর ধারা' ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনাতে, ঐ পৃঃ ১০২-১০৩।

৯। ঐ, পৃঃ ১০৩।

১০। মুসা আনসারী, আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা, ঢাকা-২০০৫, পৃঃ ২১৬-২১৭।

১১। মুসা আনসারী, ইতিহাস: সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা, ঢাকা-২০০৮, পৃঃ ১০৫-১০৬।

১২। মুসা আনসারী, প্রবন্ধ, পলাশীর শিকড় সন্ধানে, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা (জুন সংখ্যা, ১৯৯৫)।

১৩। R.P. Dutt. India Today and Tomorrow, Delhi-1955, P- 42.

১৪। Ziya-Ul-Hasan Faruqi, The Deoband School And The Demand For Pakistan, New York-1963, P-2.

১৫। R.C. Majumdar & other, An Advanced History of India. London-1953. P-736-740.

১৬। মুসা আনসারী, নিবন্ধমালা, এয়োদশ খন্ড, ২০০৫ (উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র), পৃঃ ১৫৫-১৬৭।

১৭। R.P. Dutt. প্রাগুক্ত, P-51.

১৮। Hamza Alavi, The Colonial Transformation in India in the Jurnal of social science Studies, Dhaka, N-7, July 1980, P-80.

১৯। মুসা আনসারী, নিবন্ধমালা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬।

২০। মুসা আনসারী, ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা, ঢাকা-১৯৯২, পৃঃ ১৫।

২১। মুসা আনসারী, নিবন্ধমালা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

২২। অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম মানস, কলকাতা-১৯৫৬, পৃঃ ৪৫।

২৩। মুসা আনসারী, নিবন্ধমালা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮-১৭০।

২৪। মুসা আনসারী, ঐ, পৃঃ ১৩৮।

২৫। মুসা আনসারী, ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা, ঢাকা-১৯৯২, পৃঃ ১৭৫।

২৬। মুসা আনসারী, প্রবন্ধ, বঙ্গ ভারতের ঐতিহাসিক জাগরণ, মুসলিম অবক্ষয় ও হিন্দু ভদ্রলোকদের ইতিহাসবোধ (ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা ২০০৫)।

২৭। মুসা আনসারী, ঐ, পৃঃ ১৪০-১৪২।

২৮। ড. আনিসুরজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা মুক্তধারা-১৯৮৩।

২৯। C.W. Smith, Modern Islam in India, London-1996, P-16.

৩০। সু-প্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ৭১।

৩১। Khalil Inaljik, The Ottaman Empire, London-1973, P-95.

৩২। W.W. Hunter, The Indian Muslims, 1945, P-119.

৩৩। W.W. Hunter, The Indian Muslims, 1945, P-11, 13.

৩৪। Dr. A.K.M. Ashraf, Muslim Revivalisval the Revolt of 1857 in Rebellion, 1757 ed. P.C. Joshi, People's Publishing House, Delhi, 1957.

৩৫। Faruqi, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭-৮।

৩৬। সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭-৭৯।

৩৭। মুসা আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৩।

৩৮। অসীম কুমার দাস গুপ্ত, প্রবন্ধ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৯৮৫।

৩৯। গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যে রূপরেখা, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃঃ ২২, ২৩।

৪০। Faruqi, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮-২৯।

৪১। History of the Freedom movement Vol-II, Part-II, Chapter-XII, Page-415।

৪২। বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ২৪৯, ২০০।

৪৩। M. Azijul Hoq, History of problems of Muslim community in Bengal, 1913, Page-36.

৪৪। মুসা আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬।

৪৫। সু প্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯২।

৪৬। R.C. Majumdar, History of the Freedom Movement in India, Chapter VIII, Page-386.

৪৭। R.C. Majumdar, প্রাগুক্ত, Page-1,12.

Dhaka University Institutional Repository

৪৮। R.C. Majumdar, প্রাগুক্ত, Page-129-143.

৪৯। R.C. Majumdar, প্রাগুক্ত, Page-387-397.

৫০। Faruqi, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯-৫০।

৫১। R.C. Majumdar, প্রাগুক্ত, Page-433, 435, 145.

৫২। Faruqi, প্রাগুক্ত, পৃঃ 51-52.

৫৩। মুসা আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭-১০২, ১০৭, ১০৮।

৫৪। R.C. Majumdar, প্রাগুক্ত, Page-393, 412, 433.

৫৫। R.C. Majumdar, প্রাগুক্ত, Page-305, 350.

৫৬। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি, যাতি ডায়েরী, সিন্ধ সাগর একাডেমী, করাচী-১৯৪৪, পৃঃ ৮০।

৫৭। মুহাম্মদ সারওয়ার, খুতবাত-এ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, সিন্ধ সাগর একাডেমী, করাচী-১৯৪৪, পৃঃ ৫৮-৬০।

৫৮। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২, ১১৪।

৫৯। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১, ৭২, ৭৩।

৬০। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১।

৬১। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩।

৬২। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৯।

৬৩। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৬।

৬৪। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি, শাহ অলীউল্লাহ আওর উনকা ফালসাফা, সিন্ধু সাগর একাডেমী, করাচি-১৯৪৪, পৃঃ ২১২-২১৫।

৬৫। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধিঃ জীবন ও কর্ম, ঢাকা-১৯৯২, এ পরিশিষ্ট্য তিন, পৃঃ ১০৪-১০৬।

৬৬। খুৎবাত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫-৮৬।

৬৭। খুৎবাত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়-

জীবনবৃত্তান্ত

ক) জন্ম ও বংশ পরিচয়:

ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানী[১] উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ মোতাবিক ১২৮৯ হিজরীর[২] ১২ মুহরম বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রির শেষভাগে সুবেহ্ সাদেকের আগে[৩] সিয়ালকোট জেলার (পাকিস্তান-পাঞ্জাব) মিঞাওয়ালী গ্রামে এক শিখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এটি ছিল মূলত একটি হিন্দু পরিবার।[৪] তাঁর (সিন্ধীর) বাল্য নাম (শিখনাম) বুটা সিং[৫] (Butta Singh)। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী বলেন, "সাধারণত আমি আমার নাম হযরত সোলেমান ফারসি (রহঃ)-এর অনুসরণে, 'উবায়দুল্লাহ্ ইবনুল ইসলাম' লিখি। কিন্তু কতিপয় আরব বন্ধুর অনুরোধে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবি আয়েশা লিখতে বাধ্য হই। আমি সংকল্প করেছিলাম, যদি কেউ এর অধিক ব্যাখ্যাযুক্ত নাম ব্যবহার করতে বলে, তবে আমি লিখব 'ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে রামা ইবনে রায়ঈ'। কারণ আমার পিতার নাম রাম সিংহ, দাদার নাম যশ্পত রায়, পিতামহের নাম গোলাব রায়।" গ্রামের বড় করকর্তা (মনসবদার) ছিলেন।[৬] সিন্ধীর পরিবারের মূল পেশা ছিল স্বর্ণের কারুকার্য বা স্বর্ণকারী। তবে দীর্ঘকাল থেকে ঐ পরিবারের অনেক লোক সরকারি চাকুরিও করতেন। আবার কোন কোন সদস্য মহাজনিও করতেন।[৭] তাঁর (সিন্ধীর) জন্মের চার মাস পূর্বেই পিতা রামসিং মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হিন্দু ধর্মান্তরিত শিখ। সিন্ধীর মাতামহের প্রেরণায় তাঁর পিতা শিখ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। জন্মের দু'বছর পর দাদা যশ্পত রায়ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। দাদার মৃত্যুর পর উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর মাতা তাঁকে নিয়ে পিত্রালয়ে (সিন্ধীর মাতুলালয়) চলে যান। তাঁর মামার বাড়ি ছিল একটি কট্টরপন্থী শিখ পরিবার।[৮] মাতামহের মৃত্যুর পর সিন্ধী ডেরাগাজী খান জেলার জামপুরে বসবাসকারী মামাদের নিকট চলে যান। তার দু'জন মামা ডেরাগাজী খান জেলার জামপুর এলাকার পাটোয়ারী ছিলেন।[৯]

খ) শিক্ষাগ্রহণ ও ধর্মান্তরনের ইতিহাস:

সিন্ধী ১৮৭৮ সালে ছয় বছর বয়সে সেখানকার (জামপুর এলাকার) উর্দু মডেল স্কুলে পড়াশোনা আরম্ভ করেন।[১০] ১৮৮০ সালে তিনি যখন ঐ মডেল স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে পড়ছিলেন, *তখন তিনি দু'বছর শিয়ালকোট জেলায় অবস্থান করেন। এ কারণে তাঁর পড়ালেখা এক বছর* পিছিয়ে যায়।[১১] সিন্ধী বলেন, "নয়তো প্রথম থেকেই আমাকে স্কুলের একজন বিশিষ্ট ছাত্র হিসাবে স্বীকার করা হতো।"[১২] সিন্ধী বাল্যকাল থেকেই ছিলেন অসাধারণ শিক্ষানুরাগী। নিজ ধর্মসহ অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকাদি অধ্যয়ন করার প্রতি তাঁর ছিল দারুন কৌতূহল ও বিপুল আগ্রহ।[১০]

ডেরাগাজী খান সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশের সন্নিহিত পাঞ্জাবের একটি জেলা। সিন্ধু এবং সীমান্তে মুসলমানরা অধিক ও সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা পীর ফকিরের প্রতি ভীষণ অনুরক্ত। শিক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

অশিক্ষিত পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই সুফী সাধকদের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের জন্য ছিল খুবই অনুপ্রাণিত। এ অঞ্চলে বহু বড় বড় সুফী দরবেশের আবির্ভাব ঘটেছে। এতদ্অঞ্চলের জন সাধারণের ওপর সুফী সাধকদের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল প্রচুর। এ জন্যেই জনসাধারণ সর্বদা শ্রদ্ধার সাথে তাদের কীর্তিকলাপ স্মরণ করত। আর এ পরিবেশেই শিখ বংশীয় *উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর শৈশবের দশ বারো বছর কেটে যায়। তাঁর পরিবারের সকলেই ছিল শিখ।* শিখদের গুরু বাবা নানক ছিলেন স্বয়ং একজন সাধু দরবেশ। তার শিক্ষা মুসলিম পীর দরবেশদের শিক্ষার সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। অবশ্য পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে ক্রমশ শিখদের ধর্ম ও সমাজের রূপ অনেকটা পরিবর্তন লাভ করে। তবে মোটামুটি ভাবে শিখদের ধর্মমত এবং সুফী দর্শনের মধ্যে কিছুটা মিল ছিল। এ সাদৃশ্যের ফলে সংখ্যা গুরু মুসলমান সমাজের সাথে শিখদের ভাব বিনিময় এবং মেলামেশার পথ অনেকটা উন্মুক্ত থাকে। তাই সিন্ধী সুযোগ পান মুসলমানদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার। ফলে পর ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব তার থেকে ধীরে ধীরে লোপ পায় এবং তিনি সুযোগ পান খুব নিকট থেকে মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম, আচার-আচরণগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবার ও বুঝবার।[১৪]

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ছাত্র অবস্থাতেই অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন।[১৫ক] ১৮৮৪ সালে বার বছর বয়সে সিন্ধী নিজ স্কুলের এক আর্য-সমাজপন্থী *বালকের নিকট থেকে 'পণ্ডিত মৌলবী'*[১৫খ] বলে কথিত উবায়দুল্লাহ্ রচিত 'তুহ্ফাতুল হিন্দ্' *ধার* নিয়ে বারবার পাঠ করতে থাকেন। 'তুহ্ফাতুল হিন্দ্' পাঠের ফলে সিন্ধীর মনে ধীরে ধীরে ইসলামের সত্যতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ঐ মডেল স্কুলের নিকটস্থ কোটলা মোগলান প্রাইমারি স্কুলের কিছু বন্ধু-বান্ধবও তাঁর জুটলো। তারাও সিন্ধীর ন্যায় 'তুহ্ফাতুল হিন্দ্' পড়তে উৎসুক ছিল। তিনি তাদের নিকট থেকে শাহ্ ইসমাঈল শহীদ রচিত 'তাক্বিয়াতুল্ ঈমান' নিয়ে পাঠ করেন। এই গ্রন্থ পাঠে তাঁর নিকট ইসলামী তাওহীদ ও পৌরাণিক শিরকের পার্থক্য ভালরূপে ধরা দেয়। এরপর তিনি এক পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থেকে ধার নিয়ে মৌলবী মুহাম্মদ লখনৌব রচিত, 'আহ্ওয়ালুল আখিরাত'ও পাঠ করেন। এই পড়াশোনার দরুণ তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটে।[১৬]

'আহ্ওয়ালুল আখিরাত' ও 'তুহ্ফাতুল হিন্দ্' গ্রন্থদ্বয়ের যে অধ্যায়ে নওমুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে লেখা হয়েছে, সিন্ধী তা বারবার অধ্যয়ন করেন।[১৭] এ দুটো গ্রন্থ অধ্যয়নই *তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।*[১৮] *আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, অহিংসা, সৎকর্মে আত্মনিয়োগ* ইত্যাদি বিষয় শিখ ধর্মের মূলমন্ত্র। ইসলামের সাথে শিখ ধর্মের এই সাদৃশ্যের ফলে মুসলমান সমাজের সাথে শিখদের ভাব বিনিময় ও মেলামেশার সহজ সুযোগ ছিল। তাই বালক সিন্ধী মুসলমানদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। তিনি মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্ম-কর্ম খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এসব ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে তাঁর মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেউ তাঁকে ইসলামের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাতে যায় নি। ইসলামের প্রতি প্রবল আকর্ষণেই একদিন তিনি ধর্ম, সমাজ, জাতি, স্বজন, সব বন্ধন ছিন্ন করে চুপ করে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে ১৫ বছর বয়সে ১৫ আগস্ট ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুর এক মুসলিম ধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

সাধকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন প্রকার মোহ, আকর্ষণ, প্রচার, প্রচারণা, ভয়-ভীতি ছাড়াই একান্ত সুস্থ পরিবেশে তিনি এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৯]

তিনি নামায শিক্ষা করেন এবং 'তুহ্ফাতুল হিন্দ্'-এর লেখকের নামানুসারে নিজের নাম স্থির করলেন 'উবায়দুল্লাহ'। নিজ বাসভূমি ত্যাগ করার সময় তাঁর সাথে আবদুল কাদের নামক কোটলা মোগলানের এক বন্ধু ছিল। তারা উভয়ে স্থানীয় আরবি মাদ্রাসার জনৈক ছাত্রসহ মোযাফ্ফর শাহ জেলার কোটলা রহমশাহে উপনীত হন।[২০] ১৩০৪ হিঃ ১৩ জিলহজ্ব মুতাবিক ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর (সিন্ধীর) সুন্নত খাতনা করানো হয়। এ ঘটনার কিছু দিন পর সিন্ধীর অভিভাবকগণ তাঁকে পূর্বের ধর্মে ফিরিয়ে নিতে চাইলে, তিনি সিন্ধুতে চলে যান এবং আরবি সর্ফ (শব্দ বিন্যাস)- এর কিতাবসমূহ ঐ ছাত্রের নিকট পথিমধ্যে অধ্যয়ন করেন।[২১]

গ) সিন্ধুতে বসতি স্থাপন ও শিক্ষাগ্রহণ:

একজন মুসলিম হিসাবে বহু দায়িত্ব বর্তায় উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী-এর ওপর। এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া ইল্মে অহী ব্যতীত তাঁর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই দ্বীন সম্পর্কে জানার এক অদম্য বাসনা নিয়ে[২২] উবায়দুল্লাহ সিন্ধুর ভরচণ্ডিওয়ালীর (শুক্কুর জেলা) তদানীন্তন বিখ্যাত মুর্শিদ হাফেয মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেবের নিকট গিয়ে তাঁর হাতে কাদেরী-রাশেদী তরীকায় বায়'আত হন এবং তাঁর সাহচর্যে চার মাস থাকেন।[২৩] সিন্ধী বলেন, "ফলে ইসলামী জীবন-পদ্ধতি আমার এমনি একটি স্বভাবে পরিণত হয়েছে যে, জন্মগত দিক থেকে একজন মুসলমানের যেমন হয়ে থাকে।"[২৪] একদিন সিদ্দীক সাহেব উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে সিন্ধী সম্পর্কে বললেন, "উবায়দুল্লাহ্ আল্লাহর জন্যই মা-বাপ ত্যাগ করেছে, এখন আমিই তাঁর মা-বাপ।" তদবধি উবায়দুল্লাহ্ তাঁকে ধর্মীয় পিতা বলে মনে করতেন।[২৫] ধর্মীয় পিতার দেশ সিন্ধুকে নিজ ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তিনি নিজের নামের সাথে সিন্ধী লিখতেন।[২৬]

ভরচন্ডি থেকে বিদায় হয়ে সিন্ধী উক্ত তালিবে ইলমের সাথে ভাওয়ালপুর এস্টেটের একটি গ্রাম্য মসজিদে গিয়ে উঠেন এবং সেখানে প্রাথমিক আরবি কিতাবসমূহ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি ভাওয়ালের দীনপুরে পৌঁছেন এবং সেখানে হাফিজ মুহাম্মদ সিদ্দীকের প্রথম খলীফা মাওলানা আবুস্ সিরাজ গোলাম মুহাম্মদ-এর নিকট অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থান করে মৌলবী আব্দুর কাদির-এর নিকট 'হিদায়াতুন নাহ্ব' পর্যন্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা আবুস্ সিরাজ চিঠির মাধ্যমে সিন্ধীর মাকে দীনপুরে ডেকে আনেন। তাঁর মা তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু সিন্ধী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন এবং ক্রমাগত বিচার-বিবেচনার পর ইসলামের যে পদ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে মনের শান্তির পথ খুঁজে পেলেন। সুতরাং আর পিছপা হলেন না।[২৭] ১৩০৫ সালের শাওয়াল মুতাবিক ১৮৮৮ সালের জুন-জুলাই মাসে তিনি দীনপুর থেকে কোটলা রহমশাহে পৌঁছেন এবং মৌলবী খোদা বখশের নিকট 'কাফিয়া' পড়েন। এখানেই তিনি নবাগত একজন ছাত্রের নিকট উত্তর ভারতের আরবি মাদ্রাসাসমূহের হাল-হকিকত জানতে পান এবং উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য মুযাফ্ফরগড়

Dhaka University Institutional Repository

রেলস্টেশন থেকে ট্রেনে সরাসরি দেওবন্দে উপনীত হন।[২৮] দেওবন্দেই তিনি মাহমুদ হাসান দেওবন্দীর স্বাক্ষাত পান। সিন্দু থেকে বিদায়কালে মুর্শিদ হাফিজ সিদ্দীক সিন্ধীর জন্য দু'আ করে বলেছিলেন, "খোদা যেন উবায়দুল্লাহ্কে সত্য-পথে দৃঢ়-সংকল্প আলেমের হাতে সোপর্দ করে।" এ সম্পর্কে সিন্ধী বলেন, "আমার ধারণা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁরই দু'আ কবুল করেছিলেন। এই জন্যই করুণাময় তাঁর অসীম অনুগ্রহে আমাকে হযরত মাওলানা শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান-এর খিদমতে পৌঁছিয়ে দেন।"[২৯]

ঘ) দেওবন্দ গমন ও শিক্ষাগ্রহণ:

১৩০৬ হিজরীর সফর মুতাবিক ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সিন্ধী সাহেব দেওবন্দের দারুল উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। আনুমানিক পাঁচ মাসে তিনি বিভিন্ন ওস্তাদের নিকট 'কুত্বী' পর্যন্ত তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ শেখেন এবং আরবি ব্যাকরণ গ্রন্থ 'শরহে জামী' মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ হাসানের নিকট পড়েন। সেখানে তিনি অন্য একজন বিজ্ঞ ওস্তাদের নিকট অধ্যয়ন পদ্ধতিও শিক্ষা করেন। তর্কশাস্ত্র ও দর্শনের গ্রন্থগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েক মাসের জন্য মাওলানা আহমদ হাসানের নিকট কানপুর মাদ্রাসায় যান। অতঃপর কয়েক মাস রামপুর আলিম মাদ্রাসায় মৌলবী নাযেরুদ্দীনের নিকট অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত দুই জায়গায় শিক্ষা শেষ করে তিনি ১৩০৭ হিজরীর সফর মুতাবিক ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দেওবন্দে ফিরে যান।[৩০] দেওবন্দে প্রত্যাবর্তনের পর সিন্ধী মাওলানা হাফিজ আহমদ ও প্রধান শিক্ষক সায়্যিদ আহমদ দেহলবীর নিকট বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করেন। শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান-এর নিকট তিনি 'জামে তিরমিযী' অধ্যয়ন করেন। শায়খুলহিন্দ তখন দেওবন্দের প্রধান পরিচালক ও ওস্তাদ। তিনি নওমুসলিম যুবক উবায়দুল্লাহর মধ্যে প্রতিভা, দৃঢ়তা ও বৈপ্লবিক মনের পরিচয় খুঁজে পান। তাই তাঁর দিকে আলাদা দৃষ্টি রাখেন।[৩১]

সিন্ধী বলেন, "সেই বছরই (১৮৮৯ সালে) আমি 'হেদায়ায় তাল্বীহ', (মুত্যাউয়্যাল), 'শরহি আকায়েদ' ও 'মুসাল্লেমুস্ সবুত' কিতাবের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং উচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হই। মোদাররিসে আউয়াল (প্রধান শিক্ষক) মাওলানা সাঈদ আহমদ দেহলবী সাহেব আমার উত্তরসমূহের খুবই প্রশংসা করেছেন। তিনি মন্তব্যও করেছেন- যদি ঠিকমত কিতাবাদি সরবরাহ করা হয়, তবে সে দ্বিতীয় আব্দুল আজিজ হবে। কয়েকজন বন্ধু আমার সম্পর্কে খোশ্খবরীপূর্ণ স্বপ্নও দেখেছিলেন। আমি নিজেও স্বপ্নে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ও ইমাম আবু হানিফার দর্শন লাভ করি। রমজান শরীফে 'অসূলে ফিকাহ' সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলাম। শায়খুলহিন্দ তা দেখে খুবই প্রীত হয়েছিলেন। এই পুস্তিকায় আমি কতিপয় মাস আমার ব্যাপারে 'জমহুরি আহলি ইল্ম'-এর বিপক্ষে প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানীদের মতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। যেমন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে 'মুতাশাহিবাতের' ব্যাখ্যা লাভ করাও সম্ভব হতে পারে। ইল্মের সত্যানুদানকারিগণ তা জানতে পারেন।"[৩২] সিন্ধী আরও বলেন, "এই বছর (১৮৮৯ সাল) শেষ হতে না হতেই আমি তফরীরে বয়যাবী ও

Dhaka University Institutional Repository

দওরায়ে হাদীসে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। অতঃপর 'আবু দাউদ শরীফ' অধ্যয়নের জন্য হযরত মওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর নিকট গাঙ্গুহ হাজির হই।[৩৩]

ঙ) চিকিৎসার জন্য দিল্লী গমন ও শিক্ষাগ্রহণ:

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর নিকট যাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে ওঠেন। তাই চিকিৎসার জন্য দিল্লী গমন করেন এবং হাকীম মাহমূদ খান-এর অধীনে চিকিৎসায় দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। সেখানে তিনি হাদীসের অন্যান্য কিতাবসমূহ মৌলবী আব্দুল করীম পাঞ্জাবীর নিকট অধ্যয়ন করেন। দিল্লীতে অবস্থান করার সময় দু'বার তিনি মাওলানা সায়্যিদ নাযীর হুসাইন এর হাদীসের দরসে শরীক হন এবং সহীহ্ বুখারী ও জমে তিরমিযীর দু'টি সবক তাঁর নিকট শ্রবণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।[৩৪] ঐ সময়ের দ্রুত অধ্যয়ন সম্পর্কে সিন্ধী বলেন, "আমার মনে পড়ে, 'সূনানে নাসায়ী' ও 'সূনানে ইবনে মাজা' শেষ করতে আমার মাত্র চার দিন করে সময় লেগেছিল। আর, 'সিরাজী' অধ্যয়ন শেষ করেছিলাম মাত্র দু'ঘন্টায়।"[৩৫]

চ) সিন্ধুতে প্রত্যাবর্তন ও বিবাহবন্ধন:

সোয়া দুই বছর দেওবন্দ ও দিল্লীতে শিক্ষা লাভের পর সিন্ধী ১৩০৮ হিজরীর ২০ জমাদিউস্সানী মুতাবিক ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লী থেকে সরাসরি ভরচণ্ডিতে ফিরে আসেন। প্রত্যাবর্তনের দশ দিন পূর্বে তাঁর মুর্শিদ হাফেয মুহাম্মদ সিদ্দীক ওফাত প্রাপ্ত হন।[৩৬] মুর্শিদের ইন্তেকালে তিনি ব্যথিত হন। এরই মধ্যে ১৩০৮ হিজরীর রজব মাসে হযরত শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দ থেকে সিন্ধীর জন্য হাদীস শিক্ষাদানের অনুমতি প্রেরণ করেন। এ অনুমতি দানের পর মৌলবী কামাল উদ্দীন তাঁর নিকট বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সূনানে আবূ দাউদ অধ্যয়ন করেন।[৩৭] ১৩০৯ হিজরীর শাওয়াল মুতাবিক ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাইয়ে সিন্ধী তাঁর মরহুম মুর্শিদের (হাফিজ মুহাম্মদ সিদ্দীক) অপর (২য়) খলীফা মাওলানা আবুল হাসান তাজ মাহমূদ-এর নিকট শুক্কুর জেলার ইমরোটে চলে যান। মাওলানা আবুল হাসান তাজ মাহমূদ তাঁর মুর্শিদের আদেশ-নির্দেশ নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন এবং মাওলানা সিন্ধীর সাথে পিতৃসুলভ আচরণ করতেন। মাওলানা তাজ মাহমূদ শুক্কুর ইসলামিয়া স্কুলের শিক্ষক মৌলবী মুহাম্মদ আযীম খান ইউসুফ জাই-এর কন্যার সাথে সিন্ধীর বিবাহ দেন। তিনি সিন্ধীর মাকেও সেখানে ডেকে নেন।[৩৮] মা বাকী জীবন সিন্ধীর সাথে কাটান এবং শিখ ধর্মেই অবিচল থাকেন।[৩৯] এ প্রসঙ্গে সিন্ধী বলেন, "তিনি (সিন্ধীর মা) শেষ পর্যন্ত আমার রীতিনীতি অনুযায়ীই কাল কাটিয়ে গেছেন।"[৪০] ওখানে সিন্ধী অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে বড় একটি গ্রন্থাগার সৃষ্টি করেন এবং ১৩১৫ হিজরী মুতাবিক ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই (মাওলানা আবুল হাসান তাজ মাহমূদ) খলীফার ছায়াতলে জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন।[৪১]

ইমরোটে থাকাকালে সিন্ধী হায়দারাবাদ জেলার গোঠ পীরঝাণ্ডায় মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন। সেখানে তাঁর মুর্শিদের (হাফেজ মুহাম্মদ সিদ্দীক) ৩য় খলীফা রাশেদী তরীকাপন্থী

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা রশীদুদ্দীনের বড় একটি ধর্মীয় গ্রন্থাগার ছিল। সিন্ধী সেখানে গিয়ে জ্ঞান সাধনা করতেন এবং গ্রন্থসমূহ ধার নিতেন। তিনি এই খলীফার 'কারামত লক্ষ্য করেন' এবং তার নিকট 'আসমা-এ- হুস্না' শিক্ষা করেন।[৪২] এ প্রসঙ্গে সিন্ধী বলেন, "আমার অধ্যয়ন ও জ্ঞান সাধনার বিষয়ে ঐ কৃতৃবখানা বিরাট ভূমিকা রেখেছে।"[৪৩] এছাড়া ঐ সময় তিনি মুর্শিদের ৪র্থ *খলীফা মাওলানা আবু তুরাব রাশেদুল্লাহ্র সাথে জ্ঞানমূলক আলোচনা করতেন।*[৪৪] *এ সময়* মাওলানা সিন্ধী কাদেরিয়া তরীকা এবং নকশে বন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরীকার আধ্যাত্মিক সাধনার নিয়ম-পদ্ধতি হাফিজ মুহাম্মদ সিদ্দীক-এর প্রধান খলীফা মাওলানা আবুস্ সিরাজ দীনপুরীর নিকট থেকে আয়ত্ত্ব করেন। সে জন্য তিনি দীনপুরেও যাতায়াত করতেন। এ প্রসংঙ্গে সিন্ধী বলেন, "আমার দুনিয়ার কোন প্রয়োজন ইমরোটে পূরণ করা সম্ভব না হলে তা দীনপুর থেকে অর্জন করে নিতাম। এভাবে আমাকে ইহকাল ও পরকালের কোন প্রয়োজনেই মুর্শিদের বাইরে যেতে হয়নি।"[৪৫]

ছ) পুনরায় দেওবন্দ গমন ও শিক্ষাগ্রহণ:

১৩১৫ হিজরী মুতাবিক ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধী পুনরায় দেওবন্দে গমন করেন। সাথে এত দিনকার অধ্যয়ন ও গবেষণার ফল স্বরূপ দু'টি পুস্তিকা লিখে নিয়ে যান।[৪৬] পুস্তিকা দুটির *একটি ছিল 'ইলমে হাদীস' সংক্রান্ত ও অপরটি ছিল 'হানাফী ফিকাহ্' শাস্ত্র সম্পর্কে।*[৪৭] দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে তিনি কোন কোন মাস'আলায় জমহুর আহলে ইলমের খেলাফ মুহাক্কিকগনের রায়কে প্রাধান্য দেন। শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান উভয় পুস্তিকা পছন্দ করেন।[৪৮] উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী এবার দেওবন্দে এসে দশ বারটি হাদীসের কিতাব মুখস্থ শুনিয়ে পুনরায় শায়খুলহিন্দের পক্ষথেকে হাদীস শিক্ষাদানের অনুমতি লাভ করেন।[৪৯] জিহাদের আলোচনা প্রসংঙ্গে সিন্ধী মাওলানা মাহমূদের নিকট তাঁর জিহাদ বাহিনী গঠনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি তা সমর্থন করেন; সেটাকে মুসলিম ঐক্যের বাহন বলে অভিহিত করেন; সেটা অব্যাহত রাখার উপদেশ দেন এবং সিন্ধীকে সংশোধনমূলক কিছুটা পরামর্শও প্রদান করেন। এভাবেই মাহমূদের সাথে সিন্ধীর শিক্ষাদানমূলক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[৫০]

এভাবে বিপ্লবী উস্তাদ হযরত শায়খুলহিন্দ এবং অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরামের প্রত্যক্ষ নেগরানীতে তিনি (সিন্ধী) হাদীছের কিতাবগুলো শেষ করেন।[৫১] সিন্ধী বলেন, "আল্লাহর *অসংখ্য রহমতের মধ্যে একটি বিরাট নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব হবে না, সেটি* হল- ফিকাহ ও হাদীসের গভীর জ্ঞান অনুসন্ধান ও পবিত্র কুরআনের তাফসীর বিষয়ে হযরত মাওলানা কাসিম দেওবন্দী থেকে আরম্ভ করে দিল্লীর ইমাম পর্যন্ত আলিমগণ আমার রাহ্বর হয়ে গেলেন। তাঁদেরকে আমি আমার ইমাম নির্বাচন করেছি। আমাকে ইলমী উন্নতির জন্য এই সিলসিলার বাইরে যেতে হয় নি। এর দ্বারা আমার প্রচেষ্টা সমূহ একটি নীতির মধ্যে শৃঙ্খলিত হয়। আমি ইসলামী দর্শনের যোগ্যতা অর্জন করি। আমি দিল্লীতে থাকাকালে 'কিবলানামা' অধ্যয়ন করি। গ্রন্থটির পরিচিতি আমার আত্মার সাথে বিজড়িত হয়। হাদীসের ব্যাখ্যা ও অনুসন্ধানে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থের পরিচয় শায়খুলহিন্দ করিয়ে দিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শেষমেষ এভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে আমার ভেতরে স্থিতিশীলতা এসেছে। আমি আলিমদেরকে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা পড়িয়েছি।"[৫২]

জ) ইন্তিকাল:

মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণসাধন ও ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ মুক্ত করার জন্য ব্যয় করেন। অবিরাম পরিশ্রম করার ফলে অসুস্থ হয়ে পরেন।[৫০] তাই সিন্ধী করাচীতে অবস্থান করে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। কিন্তু অসুখ দিন দিন বেড়েই চলে। এ সময় তাঁর কন্যা ও দৌহিত্রদের অনুরোধে তিনি ভাওয়ালপুর স্টেটের দ্বীনপুরে চলে যান এবং জীবনের শেষ দিনগুলো জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া দিল্লী ও ভাওয়ালপুরের দ্বীনপুরে কাটান। অবশেষে সেখানে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বীর সেনানী উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ১৯৪৪ সালের ২১ আগস্ট রোজ বৃহস্পতিবার[৫৪] ইহলিলা সাঙ্গ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পরপারের পথে যাত্রা করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাযিউন)। এ মহান নেতার মরদেহ রহীম ইয়ারখান জেলার (পাঞ্জাব) খানপুরে সমাহিত করা হয়।[৫৫]

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী'র ইন্তিকালের পর 'Star of India' পত্রিকায় বলা হয়, "An aquisition to Islam from the Virile Shik Community, he rendered his people services they can never forget. A follower of the school of India of the late shah Waliullah Dehlavi, he preached and no less practised - Islam which was dynamic .....An upright man is God's noblest creation. Such was Moulana Obaidullah Sindhi."[৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা, 'আযাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী', দারুল কুরআন শামসুল উলুম মাদ্‌রাসা, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা, ৩১ আগস্ট, ১৯৯২, পৃঃ ৫।

২। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী : জীবন ও কর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯২, পৃঃ- ১৬।

৩। মুজিবুর রহমান, মাওলানা, (সংকলন ও অনুবাদ), মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর রোজনামচা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৮৪, পৃঃ ১।

৪। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

৫। RAY, Santimoy, Freedom Movement And Indian Muslims, Peoples Publishing house, New Delli, January- 1979.

৬। মুজীবুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

৭। আরশাদ, আব্দুর রশীদ, বীস বড়ে মুসলমান, দেওবন্দ, ১৯৭০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৪।

৮। মাহবুব রিসবী, সায়্যিদ, তারীখে দারুল উলুম দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, ইদারা-ই-ইহতি মাম দারুল উলুম দেওবন্দ, ১৯৯৩, পৃঃ ৬৫।

৯। আরশাদ, আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৪।

১০। মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

১১। মুহম্মদ সারওয়ার, 'খুদবাত-এ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী', প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।

১২। মুজীবুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

১৩। মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

১৪। ঐ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

১৫-ক। মুহাম্মদ মিঁয়া, সায়্যিদ, 'উলামা-এ হক', ১ম খণ্ড, দিল্লী, ১৯৪৬, পৃঃ ১২৪।

১৫-ক। **পণ্ডিত মৌলবী:** তিনি ছিলেন মূলত অনন্ত রাম নামক একজন আর্যসমাজপন্থী হিন্দু। তিনি হিন্দু ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'তুহ্‌ফাতুল হিন্দ' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এতে তিনি ইসলামের 'তওহীদ' ও পুরানের শিরকজনিত ধর্মীয় বিশ্বাসের তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রয়াস পান। এই লোকটি শেষ পর্যন্ত ইসলামে দীক্ষিত হন। তাই তিনি মুসলমান সমাজে 'পন্ডিত মৌলবী' বলে খ্যাত ছিলেন। পাঞ্জাবে তাঁর এই ধর্মসংস্কার আন্দোলন খুবই প্রসার লাভ করে। ফলে শত শত হিন্দু যুবক ইসলামে দীক্ষিত হয়। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

১৬। মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, (১৬-১৭)।

১৭। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।

১৮। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৮।

১৯। নূর-উদ্দীন আহমদ, (অনু), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

২০। মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

২১। মুহম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯; 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৮।

২২। মুহম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

২৩। মুহম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

২৪। মুজীবুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

২৫। মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, ডঃ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

২৬। আরশাদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৫।

২৭। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯।

২৮। মুহম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

২৯। মুজিবুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

৩০। মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮-১৯।

৩১। আরশাদ, আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৫।

(৩২- ৩৩)। মুজীবুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

৩৪। মুহম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২-৬৩।

৩৫। মুজীবুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

৩৬। মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

৩৭। 'তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫।

৩৮। মুহম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

৩৯। মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

৪০। মুজিবুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

৪১। মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

৪২। মুহম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

৪৩। আরশাদ, আবদুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৬।

৪৪। মুহম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

৪৫। আরশাদ, আবদুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৬।

৪৬। মুহম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬।

৪৭। মুজিবুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

৪৮। আরশাদ, আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৬।

৪৯। 'তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫।

৫০। মুহম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

৫১। মুজিবুর রহমান, মওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

৫২। 'তারীখে দারুল উলুম দেওবন্দ', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫; আরশাদ, আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৬- ৪০৭।

৫৩. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা, 'আযাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী', দারুল কুরআন শামসুল উলুম মাদ্‌রাসা, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা, ৩১ আগস্ট ১৯৯২, পৃঃ ১৮।

৫৪. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯;

৫৫. 'দায়েরা-এ মা'আরিফে ইসলামিয়া', ১২ খণ্ড, লাহোর, ১৯৭২, পৃঃ ১৮৫।

৫৬. Star of India, August 25, 1944.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়-

৩. সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন:

ক) গোঠপীরঝাণ্ডায় 'দারুল ইরশাদ' প্রতিষ্ঠা:

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ১৮৯২ বা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে আপাতত শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি পুনরায় সিন্ধুতে ফিরে যান[১] এবং শুক্কুর জেলার ইমরোটে মাওলানা তাজ মাহমূদের নিকট অবস্থান করেন।[২] দেশে পৌঁছে তিনি স্বৈরাচারী ইংরেজ বেনিয়ার হাত থেকে ভারত উপমহাদেশকে রক্ষাকল্পে আন্দোলনকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কারণ তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কখনো কোন আন্দোলন হতে পারে না এবং হলেও তা টিকে থাকতে পারে না যদি এর সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ মজবুত না হয়। তাই তিনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মজবুতী অর্জনের জন্য আমরুট শহরে [৩] 'দারুল ইরশাদ' নামক[৪] একটি প্রেস (ছাপাখানা) স্থাপন করেন।[৫] এবং তা দু'বছর চালিয়ে যান; আরবি ও সিন্ধী ভাষায় কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাছাড়া 'হিদায়াতুল্ ইখওয়ান' নামক একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন।[৬] এ সময় তিনি সেখানে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। যেহেতু ধর্মীয় বিষয়ের কাজসমূহ মাদ্‌রাসা ব্যতীত সম্পাদন করা সম্ভব হয় না, তাই মাদ্‌রাসা স্থাপনের চেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে সফল হন।[৭] এরপর তিনি মুর্শিদের ৪র্থ খলীফা মওলানা রাশেদুল্লাহ্‌র সহযোগিতায় ১৩১৯ হিজরী মুতাবিক ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে গোঠপীরঝাণ্ডায় 'দারুর্-রাশাদ' নামক একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন এবং[৮] মাদ্‌রাসা নামটিও তিনি নির্বাচন করেন। দীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত সে মাদ্‌রাসা শিক্ষকতা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। একবার ঐ মাদ্‌রাসায় পরীক্ষা নেয়ার জন্য শীর্ষ স্থানীয় আলিমগণের মধ্যে শায়খুলহিন্দ মাহমুদ হাসান ও শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন ইয়ামানী গিয়েছিলেন। সিন্ধী ঐ মাদ্‌রাসায় থাকাকালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ)কে স্বপ্নে দেখেছিলেন বলে তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন।[৯]

খ) দেওবন্দে 'জমী'অতুল আনসার'-এ যোগদান:

১৩২৭ হিজরীর রমযান মুতাবিক ১৯০৯ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে মাওলানা মাহমূদ হাসান মাওলানা সিন্ধীকে সিন্ধু থেকে দেওবন্দে ডেকে নেন এবং সেখানে অবস্থান করে 'জমীঅতুল আনসার' (সাহায্যকারী দল) - এর প্রতিষ্টা ও সাংগঠনিক কাজ করার নির্দেশ দেন।[১০] দীর্ঘ ১৮/১৯ বছর (১৮৯১- ১৯০৯) আধ্যাত্মিক সাধনা, জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষকতা করার পর সিন্ধী পুনরায় দারুল উলূম দেওবন্দে তাঁর যাহিরী ও বাতিনী শিক্ষক শায়খুলহিন্দ মাহমুদ হাসানের পৃষ্ঠপোষকতায় জমীঅতুল আনসার'-এর সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করতে আরম্ভ করেন।[১১] এতে তাঁর 'দারুল ইরশদ' প্রতিষ্ঠানের সাথেও সম্পর্ক বজায় থাকবে বলে মাহমূদ হাসান জানিয়ে দেন। অধ্যাপক এস, এম, ইকরাম বলেন, "শায়খুলহিন্দ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'জমীঅতুল আনসার' প্রতিষ্টা করে এর কাজকর্ম আরম্ভ করেন। তিনি মাওলানা সিন্ধীকে

Dhaka University Institutional Repository

দেওবন্দে অবস্থান করে জমীঅতুল আনসারের সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।[১২] 'জমীঅতুল আনসার' গঠনে মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক করাচবী,[১৩] মাওলানা আবু মুহাম্মদ আহমদ লাহোরী[১৪] ও মৌলবী আহমদ আলী উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে সহায়তা করেন।[১৫] সিন্ধী চার বছরকাল দেওবন্দে অবস্থান করে জমীঅতুল আনসারের কাজকর্ম পরিচালনা করেন এবং *একে মজবুত সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই জমীঅতুল আনসারের অন্যতম* উদ্দেশ্য ছিল আলীগড় কলেজ ও দেওবন্দ মাদ্‌রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুসদৃশ সম্পর্ক স্থাপন করা। ১৯১০ সালে দেওবন্দে অনুষ্ঠিত 'জলসা-এ-দাস্তারবন্দী'-তে আলীগড়ী নেতা সাহেবজাদা আফতাব আহমদ খান (জন্ম ১৮৬৭) এই প্রস্তাব করেছিলেন যে, দারুল উলূমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা আলীগড় কলেজে ইংরেজি পড়তে যাবে এবং আলীগড় কলেজের গ্রাজুয়েটরা আরবি শিক্ষার জন্য দেওবন্দ মাদ্‌রাসার শরণাপন্ন হবে। কিন্তু এই কর্মসূচিতে কোন সুফল ফলে নি। আলীগড় থেকে সর্বপ্রথম যে ছাত্রটি দেওবন্দে পড়তে গিয়েছিল, সেই শিক্ষার্থী ইংরেজ সরকারের একজন গোয়েন্দা বলে প্রমাণিত হয়।[১৬]

'জমীঅতুল আন্‌সার'-এর অন্যতম একটি অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে, মাওলানা মাহমূদের একটি সুদূরপ্রসারী গোপন কর্মসূচি ছিল। তা হলো- দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে মুজাহিদদের একটি দল গঠন করা এবং ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। সিন্ধী ঐ কর্মসূচি অনুযায়ী চার বছর (১৯০৯- ১৯১৩) 'জমীঅতুল আনসার' পরিচালনা করেন। জমীঅতের আসল উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে ১৯১০ সালে দেওবন্দে 'দাস্তারবন্দী'র জলসা (পাগড়ী পরিধান অনুষ্ঠান) অনুষ্ঠিত হয়। তাতে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আনুমানিক ত্রিশ হাজার মুসলিম সুধী সমবেত হয়। ঐ সভায় মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহী সভাপতির ভাষণে বলেন: "কোন কোন প্রগতিবাদী বলেন, 'জমীঅতুল-আনসার' হল আলীগড়ের 'ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশন'-এর একটি অনুকরণ মাত্র। এটা ঠিক নয়। 'জমীঅতুল-আনসার'-এর আন্দোলন এখন থেকে প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বেই আরম্ভ হয়েছে। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাদ্‌রাসা -এ-আলিয়ার (দেওবন্দ মাদ্‌রাসা) ঐ ছাত্র, যিনি আজ জ্ঞানের উৎস (মাওলানা মাহমূদ) বলে পরিগণিত। ১৯০৯ সালে ঐ আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করে তার নাম রাখা হয়েছে 'জমীঅতুল আনসার'। এ সমিতি অন্য কোন সমিতির অনুকরণ নয়। এর সাথে কারো ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পর্ক নেই। এর উদ্দেশ্য হলো ঐ জরুরী কর্তব্য সম্পাদন, যার এখন ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে।"[১৭]

এই দস্তারবন্দী সমাবর্তন অনুষ্ঠান থেকে মওলানা সিন্ধী 'জমীআতুল আনসার'- এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘোষণা করেন।

(১) কুরআন মজীদ ও হাদীসের গূঢ়রহস্য, তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক ইসলামী বিষয়সমূহ সর্বসাধারণ মুসলমানের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার করতে হবে।

(২) মুসলিম জনগণের 'আকীদা ও আমল' সংশোধনের নিমিত্তে সেমিনার, সিম্‌পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ করে প্রবন্ধ পাঠ করতে হবে এবং এ সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আলোচনা, সমালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের উপকরণ হিসেবে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্তে আলোচনা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ সফল হবে যদি বিভিন্ন সময়ে স্থানে স্থানে 'জমীঅতুল আনসার'-এর পক্ষ থেকে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর এ সকল সম্মেলনে মুসলমানদের পার্থিব ও পরলৌকিক কল্যাণের কথা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রকৃত শিক্ষাসমূহ এবং বুযুর্গ ও ওলীগণের উদ্যমী, উৎসাহব্যঞ্জক, উদ্দীপক এবং বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস আলোচনা করা হয় যাতে মুসলিম জাতির মৃত প্রায় অন্তরসমূহ সতেজ ও সজীব হয়ে ওঠে।[১৮]

'জমীঅতুল আন্‌সার'-এর প্রথম কনফারেন্স:

দস্তারবন্দী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সাব্যস্ত করা হয় যে, 'জমীঅতুল আনসার'- এর প্রথম কনফারেন্স মুরাদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে।[১৯] এই পরিপ্রেক্ষিতে 'জমীঅতুল আনসার'- এর সর্বপ্রথম *অধিবেশন ১৯১১ সালে এপ্রিলের ১৫- ১৭ তারিখে মুরাদাবাদ শহরে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভা* বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়।[২০] এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল দশ সহস্রাধিক। শায়খুলহিন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীয় ব্যবস্থাপনায় 'জমীঅতুল আনসার'-এর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। এছাড়াও এ সংগঠন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রসিদ্ধি ও চরম উন্নতির উপকরণ হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রথম কনফাবেন্সের সাধারণ সম্পাদক উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী 'জমীঅতুল আনসার' ও তাঁর অনুসারীদের করণীয় সম্পর্কে ঘোষণা দেন:

(১) 'জমীঅতুল আনসার' সর্বাবস্থায় দারুল উলূম দেওবন্দের যাবতীয় কাজে সহায়তা করবে।

(২) দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন ডিগ্রীপ্রাপ্ত বিদ্যার্থীরাই 'জমীঅতুল আনসার'-এর সদস্য হবে। আর এ সদস্যগণ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, শিক্ষা এবং এর যাবতীয় অর্থ যোগান দেয়ার ব্যাপারে সকল প্রকারের সহযোগিতা করবে।

(৩) মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর রচনাবলি, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ও তাঁর পরিবারস্থ মনীষীবৃন্দের প্রণীত গ্রন্থাবলি এবং মুজাদ্দিদে আলফেসানীর গুরুত্বপূর্ণ 'মকতূবাত'- *এ সংগঠনের সকল সদস্যের পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।*

(৪) দারুল উলূম দেওবন্দে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হবে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হবে বক্তা ও খতীব সৃষ্টি করে তাঁদের মাধ্যমে ইসলামী অবদান রাখা।

(৫) *এ সংগঠন থেকে এমন তর্কবাগীশ সৃষ্টি করা হবে যাঁরা রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে* নাস্তিক, মুশরিক এবং বিদ্‌আতীদেরকে দমিয়ে দিয়ে প্রকৃত ইসলাম জনগণের সম্মুখে পেশ করতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) সাধারণ মুসলমানদের আকীদা ও আমল সংশোধনকল্পে সম্মেলন করে প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার-প্রসার এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন কল্পে আলোচনা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রস্তাব গ্রহণের পর এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

(৭) যে জেলার জনগণ 'জমীঅতুল অনসার'-এর তত্ত্বাবধানে সম্মেলন করতে আগ্রহী হয় এবং এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তথায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।[২১]

'জমীঅতুল আন্‌সার'-এর উক্ত সম্মেলনে যে প্রস্তাবাবলি গৃহীত হয় তার উল্লেখযোগ্য অংশ হলো:

(১) সরকারি স্কুল ও কলেজের মুসলিম শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে একদিন হলেও প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষায় ব্যবস্থা করা হোক। তাদের আবাসিক হলসমূহে মুসলিম ছাত্রদের ইসলামী মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগ করা হোক। এদের যাবতীয় ব্যয় ভার অত্র সংগঠন বহন করবে।

(২) সরকারি স্কুল ও কলেজে ন্যূনতপক্ষে পঁচিশ ভাগ শিক্ষার্থী যারা দ্বিতীয় ভাষা আরবি গ্রহণ করেছে তাদের জন্য 'জমীঅতুল আন্‌সার' বৃত্তি প্রদান করবে এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করবে।

(৩) ইসলাম বিদ্বেষীগণ ইসলামের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, আপত্তি ও মতবিরোধ করবে তার জবাব দেয়ার জন্য 'জমীঅতুল-আনসার' দারুল উলূম দেওবন্দে একটি বিভাগ খুলবে।

(৪) কুরআন মজীদ ও ধর্মীয় গ্রন্থ মুদ্রণ এবং মুদ্রিত ধর্মীয় গ্রন্থ ব্যবসায়ের জন্য মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ সকল বিষয়ে অমুসলিমদের উপর নির্ভরশীল না হওয়ার জন্য মুসলিম ব্যবসায়ীদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

(৫) ইসলামী আকীদাবিষয়ক ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পুস্তিকা অধিক পরিমাণে ছাপতে হবে। যা জনসধারণকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।[২২]

'জমীঅতুল-আনসার'- এর দ্বিতীয় কনফারেন্স:

'জমীঅতুল-আনসার'- এর দ্বিতীয় কনফারেন্স ৭- ৯ রবীউসসানী ১৩৩০ হিজরী মুতাবিক ১৬- ১৮ এপ্রিল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিন দিন ব্যাপী মীরাঠে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল দশ সহস্রাধিক। এই সম্মেলনে মুরাদাবাদে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবাবলি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে নিচের দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়:

(১) দেশের বিভিন্ন স্থানে 'জমীঅতুল আনসার'- এর অর্থ তহবিল থেকে নৈশ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হোক।

Dhaka University Institutional Repository

(২) 'আল আনসার' নামক 'জমীঅতুল আনসার'- এর একটি মুখপত্র বের করা হোক।[২৩]

'জমীঅতুল আন্সার' থেকে সিন্ধী-র পদত্যাগ:

'জমীঅতুল আন্সার'-এর দুটি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইংরেজ সরকার স্বস্তিতে থাকতে পারে নি। তারা মহাচিন্তিত হয়ে পড়ে। উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলিম সমাজ দু' দু'টি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত করে যা ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর আকাশ কুসুম ব্যাপার ছিল। ইংরেজগণ মনে করতে লাগলো যে, ইতঃপূর্বে ভারতের জনগণ বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায় আমাদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমাদেরকে মহাবিভ্রাটে ফেলে দিয়েছিল। তাই ইংরেজগণ 'জমীঅতুল আন্সার'-এর কার্যবিধির উপর শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। মুরাদাবাদের 'জমীঅতুল আন্সার'-এর প্রথম কনফারেন্সের সমাপ্তির পর এই মহাসম্মেলনের সভাপতি মাওলানা আহমদ হাসান আমরূহীকে তারা বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অধিকন্তু, শায়খুলহিন্দের আয়ের উপরও তারা ট্যাক্স বসিয়ে দেয়।[২৪]

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর তত্ত্বাবধানে 'জমীঅতুল আনসার'- এর অগ্নিবৎ কার্যাবলি দারুল উলূমের কর্তৃপক্ষ তাদের নিজেদের, দারুল উলূমের এবং সাধারণ মুসলমানের অস্তিত্ব বিপন্ন *হবে বলে আশংকা করেন। কর্তৃপক্ষের এ ধারনানুযায়ী দারুল উলূমের সাথে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর* কোন প্রকারের সম্পর্ক না থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই তাঁরা কয়েকটি ধর্মীয় মাস্য়ালায় উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী এবং দারুল উলূমের অন্যান্য আলিমের মাঝে মতানৈক্যের সৃষ্টি করে দেন। এই দ্বন্দ্ব, বিরোধ, বিভেদ ও অনৈক্যকে কারণদর্শিয়ে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে দারুল উলূম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে উবায়দুল্লাহ্ দারুল উলূমের শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রদের সাথে সম্পর্কচ্যুত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান-এর সাথে সম্পর্কের কোন ভাটা পড়ে নি; বরং পূর্বের ন্যায় নিবিড় থাকে। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী গোপনে শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান-এর নিকট গমন করতেন। রাতের আঁধারে দেওবন্দ এলাকার বাহিরে তাঁরা উভয়ে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করতেন এবং প্রয়োজনীয় কার্যাবলি আঞ্জাম দিতেন।[২৫]

দারুল উলূম দেওবন্দেও কর্তৃপক্ষের লক্ষ্যবস্তু ছিল -এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদীক্ষা এবং বিদ্যাচর্চা ব্যতীত অন্য কোন সম্পর্ক থাকবে না। রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয় ও রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে শুধু এখানে বিদ্যাচর্চার একক ব্যবস্থা থাকবে।[২৬] উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে দারুল উলূমের কর্তৃপক্ষ দারুল উলূম থেকে সরিয়ে দিলে তিনি 'জমীঅতুল-আন্সার' -এর সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং দারুল উলূম ত্যাগ করে দিল্লীতে অবস্থান করতে আরম্ভ করেন। এরপর থেকেই 'জমীঅতুল-আনসার'-এর বিলুপ্তি না হলেও জড়পদার্থের ন্যায় অসাড় হয়ে পড়ে।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

গ) দিল্লীতে গমন ও 'নিযারাতুল মা'আরিফ'-এ যোগদান:

শায়খুলহিন্দ মাহমুদ হাসান উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর নিকট দেওবন্দ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার অন্ত নিহিত বৈপ্লবিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য খুলে বলেছিলেন। সিন্ধী শায়খুলহিন্দের নিকট দীক্ষা নিলেন, জিহাদের মাধ্যমে জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। দুনিয়ার মসনদ, মর্যাদা ও রাজত্ব জিহাদের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সে জাতির মধ্যে জিহাদের স্পিরিট নির্বাপিত হয়েছে, তারাই অপমান-অপদস্ত হয়েছে। দুনিয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তারা পতিত জাতি হিসেবে পরিণত হয়েছে।[২৮] অতএব, উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী চার বছর (১৯০৯- ১৯১৩) দেওবন্দে 'জমীঅতুল-আন্‌সার'-এ দায়িত্বে থাকাকালে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।[২৯]

আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার ফলে ইসলাম সম্পর্কে মুসলিম যুবকদের মনে যে ভুল ধারণার উন্মেষ হয় তা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাহমুদ হাসান একটি শিক্ষালয় স্থাপনের মনস্থ করেন। তাদেরকে তিনি এ শিক্ষালয়ে কুরআন শিক্ষা এমন ভাবে দেয়ার চিন্তা করেন যাতে ইসলাম সম্পর্কে তাদের সর্বপ্রকারের সংশয়, সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমূলে দূরীভূত হয়।[৩০] সিন্ধী বলেন, "হযরত শায়খুলহিন্দের নির্দেশক্রমে আমার কর্মস্থল দেওবন্দ থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলো।"[৩১] উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী চলে যান।[৩২] দিল্লীতে গিয়ে সিন্ধী কুরআনের শিক্ষা ও মূল্যবোধের আদর্শে মুসলমান সমাজকে গড়ে তোলার কাজে (মাহমুদ হাসানের ইচ্ছেমত) নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৩৩১ হিজরী মুতাবিক ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি দিল্লীর ফতেহপুর মসজিদে 'মাদ্‌রাসাতুল নাযারাতুল মা'আরিফিল কুরআনিয়া' সংক্ষেপে 'নাযারাতুল মা'আরিফ' প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন শায়খুলহিন্দ মাহমুদ হাসান, হাকিম আজমল খান দেহলবী[৩৩] ও নওয়াব ওয়াকারুল মূল্‌ক[৩৪] প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। সি. আই. ডি-এর বর্ণনা মতে, "উবায়দুল্লাহ্ দারুল উলূম দেওবন্দকে নিজেদের মিশনারীসমূহের দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বানাতে সক্ষম না হওয়ায় দিল্লীতে একটি ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।"[৩৫] শায়খুলহিন্দ সিন্ধীকে নাযারাতুল মা'আরিফে শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে যাবার হুকুম দেন। প্রতিষ্ঠানটি নতুন ও পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষিতদেরকে পরস্পর কাছে টেনে আনতে বেশ ভূমিকা পালন করেছিল বটে। পাঞ্জাবের ইংরেজি কলেজের মুসলমান ছাত্ররা যে দেশ ত্যাগের আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন, তা ছিল ঐ চেষ্টারই ফলাফল। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীই সে আন্দোলনকে চাঙ্গা করেছিলেন।[৩৬]

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী বুঝেছিলেন যে, ইসলামই হল মানবসমাজের মুক্তির শ্রেষ্ঠতম উপায়। তবে ইসলাম বুঝতে হলে প্রথমে কুরআন বুঝতে হবে। কারণ কুরআনেই ইসলাম সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন আলোচনা পেশ করা হয়েছে। তাই তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে 'কলীদে কুরআন' এবং 'তা'লীমে কুরআন' নামক দু'টি পুস্তক প্রকাশ করেন। এতে (গ্রন্থদ্বয়ে) লাল সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ভারত উপমহাদেশকে উদ্ধারকল্পে চেতনাহারা মুসলিম সম্প্রদায়কে দলমত নির্বিশেষে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রতি বিপুলভাবে উৎসাহিত করা হয়। এ কারণে ইংরেজ রাজশক্তি সিন্ধীর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে কিতাব দু'টি বাজেয়াপ্ত করে এবং প্রকাশনাও বন্ধ করে দেয়। এতদ্‌সত্ত্বেও পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে দুর্গ কায়েম

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল এবং যে রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল এসব কিছুর ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশী।[৩৭]

পরবর্তীতে শায়খুলহিন্দ মাহমুদ হাসান উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে বুঝালেন যে, যতদিনে তুমি এই মাদ্‌রাসার মাধ্যমে ১০/ ২০ জনকে শিক্ষা দিয়ে নিজের সহকর্মী, সহযোদ্ধা ও ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলতে সক্ষম হবে, ততদিনে ইংরেজরা হাজার হাজার ধর্মদ্রোহী ও দেশদ্রোহী তৈরী করে ফেলবে। বিষয়টির সত্যতা W.W. Hunter-এর বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "আমাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কলেজগুলোতে পড়ুয়া হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এমন কোন যুবক নেই, যে তাদের মুরুব্বীজনদের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে মন্দ বলছে না।"[৩৮]

সিন্ধীকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুত করার জন্য শায়খুলহিন্দ যেভাবে দেওবন্দে তাঁর দলের লোকদের সাথে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি দিল্লীর যুবশক্তির সাথেও তাঁর (সিন্ধীর) পরিচয় করিয়ে দেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি একবার দিল্লী গমন করেন এবং ডা. মুখতার আহমদ আনসারী'র [৩৯] (১৮৮০- ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) সাথে সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দেন। এর পর ডা. আনসারী মাওলানা আবুল কালাম আযাদ[৪০] (১৮৮৮-১৯৫৮ খৃঃ) ও মাওলানা মুহাম্মদ আলীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এমনি করে দিল্লীতে মুসলিম ভারতের উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিক ও রাজনীতির সাথে সিন্ধীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[৪২]

১৯১২ সালে মুসলিম বিশ্বে নতুন একটি বিপদ আপতিত হয়। ধূর্ত ব্রিটিশ এবং তার সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকানের রাজ্যসমূহকে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আর জার্মানী ও ইটালী জেনারেল ফ্রঙ্কর মাধ্যমে স্পেনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য যা করতে চেয়েছিল তা তারা বলকানীদের মাধ্যমে তুরস্কের বিরুদ্ধে করার প্রয়াসী হয়। তদুপরি ব্রিটিশ সরকার ১৯১৩ সালে কানপুরের মিছলি বাজারের একটি রাস্তা করতে গিয়ে একটি মসজিদকে ধ্বংস করে দেয়। মুসলমানগণ এর তীব্র প্রতিবাদ করলে ইংরেজদের গুলিতে অনেক মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন।[৪৩]

উল্লিখিত ঘটনাদ্বয় সংঘটিত হওয়ায় ভারতের মুসলমানগণ একই প্লাটফর্মে সমবেত হন। দেশকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করার প্রবল স্পৃহা তাদের মনে জেগে উঠে। দিল্লীতে 'নিযারাতুল মা'আরিক' স্থাপন করে ভারতের যুবকদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। হাকীম আজমল খান, ডাক্তার মুখতার আহমদ আনসারী, মাওলানা শওকত আলী[৪৪] মওলানা মুহাম্মদ আলী, *মওলানা যাফর আলী খান*[৪৫] *মওলানা আবুল কালাম আযাদ এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।* সি. আই. ডি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, "নিযারাতুল মা'আরিফ' তাদের গোপন পরামর্শগৃহ ছিল এবং এ প্রতিষ্ঠানকে সর্বসাধারণ লোকে রাজনৈতিক ক্লাব বলে আখ্যায়িত করত।[৪৬] এ শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন আস্তানা।[৪৭]

ঘ) সিন্ধী'র সশস্ত্র বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক তৎপরতা:

ব্রিটিশদের দমননীতি ও ভারতীয় রাজনীতি:

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় ইংরেজগণ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে থাকে। ইংরেজদের ধারণা মতে- স্বাধীনতার মূল হোতা ছিল মুসলমান। তাই তারা মুসলমানদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে। প্রায় সাতাশি হাজার মুসলমানকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলায়। তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। *সরকারি চাকুরি থেকে ছাঁটাই করে। নিরপরাধ জনসাধারণকে অগ্নিদগ্ধ করে। স্বাধীনতা* আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম উভয়েই অংশগ্রহণ করেছে। আন্দোলনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্য ছিল হিন্দু। এতদ্‌সত্ত্বেও মুসলমানদের প্রতি তাদের অসন্তোষ ছিল চরম। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিন্দুরাও তাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পায় নি। ফলে ভারতবাসী নিস্তব্ধ, নিঝুম ও নির্বাক হয়ে পড়ে। এ সময়ে ভারতীয়দের অন্তরে ইংরেজদের ভীতির সঞ্চার হয়। ভারতবাসী ইংরেজদের মনোতুষ্টির জন্য তাদেরকে বিভিন্নভাবে তোষামোদ ও তোয়াজ করতে থাকে। এ তোষামোদিতে তারা আরও বেপরোয়া ভাব দেখায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ইংরেজগণ ভারতীয়দের মনোবল বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করে। তাই তারা তোষামোদকারীদেরকে খান সাহেব, রায় সাহেব, খান বাহাদুর, রায়বাহাদুর, রাজা, মহারাজা, স্যার, শামসুল উলামা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করতে থাকে। তোয়াজকারিগণ প্রফুল্লচিত্তে খেতাব লাভ করে উৎফুল্ল হত।[৪৮]

পক্ষান্তরে, ইংরেজ বিদ্বেষী স্বাধীনতাকামী মর্দে মুজাহিদও বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মূক ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁদের প্রেরণা দমে যায় নি। তাঁরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন বটে; তবে এ আবদ্ধ শৃঙ্খলকে উন্মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উপকরণ খুঁজতে থাকেন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাত্র উনিশ বছর পর ১৮৭৬ সালে বাংলায় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও এর দু'বছর পর দেওবন্দে 'সামরাতুত্ তরবিয়ত' এবং ছ'বছর পর মাদ্রাজে 'মহাজনসভা' ইত্যাদি দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব দলের বহিরাবরণ ছিল জনকল্যাণমূলক। মূলত এদের কার্যক্রম ছিল রাজনৈতিক।[৪৯] খোশামোদ ও তোয়াজপ্রিয় ইংরেজ জাতি নিশ্চিত ছিল যে, ক্ষমতায় একচ্ছত্র অধিকার তাদের হাতের মুঠোতে রয়েছে এবং ভারতবাসী তাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ মস্তকাবনত।[৫০]

দূরদর্শী বিচক্ষণ কতিপয় ইংরেজ বুঝতে পারল যে, কিছু কিছু রাজনৈতিক দল কল্যাণমূলক কাজ করার আবরণে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। এ বাহ্যিক জনকল্যাণমূলক *দলসমূহকে নিস্তেজ ও বিনষ্ট করতে হবে। তাই তারা ভারতবাসীর সকলের জন্য একটি দল* গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ দলের মাধ্যমে তাদের নিকট উপমহাদেশের জনগণ নিজেদের মনের আবেগ প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। নতুবা তাদের চাপা থাকা আবেগসমূহ বিস্ফোরিত হয়ে যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে। ভারতের ভাইসরয় লর্ড ডাফ্রিন এ. ও. হিউমকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, "শাসক ও দেশের জনগণ সকলের জন্য আমি উত্তম মনে করি যে, উপমহাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একটি সংগঠন গড়ে তুলবে যারা বছরে একবার মিলিত হয়ে সরকারি জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনায় কী ত্রুটি রয়েছে এবং কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ত্রুটিসমূহ শোধরানো সম্ভব হবে- এ সকল বিষয়ে সরকারকে অবহিত করবে।"[৫১]

 Dhaka University Institutional Repository

'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামক সংগঠনটি লর্ড ডাফ্রিনের এ পরামর্শের কার্যকর পদক্ষেপ। এ প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ কর্তৃক কংগ্রেস সৃষ্টি হলেও তা তাদের জন্য শিরঃপীড়া হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন পূণাতে অনুষ্ঠিত হয়।[৫২] এ প্রসংগে G. K Gokhale বলেন, "The all Indian National Congress was, of course, the brain child of an English Man. No Indian.[৫৩]"

লর্ড ডাফ্রিনের উদ্দেশ্য ছিল– এ সাম্রাজ্যে এমন এক দল গঠিত হবে যে দল ব্রিটিশের পদলেহনকারী, চাটুকার এবং চিরস্থায়ীভাবে তাদের রাজত্ব স্থায়িত্বের সহায়ক হয়। এ প্রেরণা নিয়েই এ দল শাসকদেরকে তাদের অশোভোনীয় কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন করবে। লর্ড ডাফ্রিনের এ উদ্দেশ্য সফল হয় নি। তাই আইনগত কোন কারণ না দর্শিয়ে এ দলটিকে বিলুপ্ত করা যথার্থ হবে না বিধায় তারা এ দলটিকে নিষ্ক্রিয় করার প্রয়াস চালায়।[৫৪] "হিন্দু ও মুসলিমের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগাও এবং শাসনকার্য পরিচালনা কর"– এ নীতির ভিত্তিতে ইংরেজগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার পলিসি গ্রহণ করে। তারা এ পলিসি কার্যকর করার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকালে ফারসির স্থলে ইংরেজিকে সরকারি ভাষায় পরিণত করে। এ সময় উর্দু ভারতের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ইউ. পি– এর ল্যাফ্‌টেনেন্ট গভর্নর স্যার এন্টোনী ১৯০০ সালের এপ্রিলে আদালত ও কোর্ট চাকরিতে হিন্দী অক্ষরে লিখিত আবেদনপত্র গৃহীত হওয়ার এক সার্কুলার জারি করে। এতে হিন্দুগণ সন্তুষ্ট হয় এবং মুসলমানগণ বিভিন্ন সভা-সমিতি করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। এভাবে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহের সৃষ্টি হয়।

মুসলমানগণ ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ইংরেজগণ মুসলমানদেরকে এ কথা বলে তাদের মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন কলা-কৌশলে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে হিন্দু ও মুসলিম দু'টি পৃথক জাতিতে পরিণত করে। ফলে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার সৃষ্টি হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি দেশে পরিণত হয়।[৫৫]

বিপ্লবী দলের উৎপত্তি:

ভারতীয় উপমহাদেশে এ সময়ে স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী দলেরও উৎপত্তি হয়েছিল যারা ব্রিটিশের আইন অমান্য করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত। এখানে আমরা আইন অমান্যকারী তিনটি দলের উল্লেখ করছি:

(ক) ১৯০৫ সালে ভারতের বিপ্লবীগণ বার্লিনে 'আঞ্জুমনে ইন্‌কিলাবে হিন্দ' গঠন করে। ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত করাই ছিল এ আঞ্জুমনের উদ্দেশ্য।[৫৬]

(খ) বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাঙালিরা ১৯০৬ সনের ৭ আগস্ট স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করে বিলেতী দ্রব্য বয়কট করে। বিলেতী দ্রব্যে প্রকাশ্যে আগুন লাগানো হয়। ছাত্ররা সরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করে।[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

(গ) হরদয়াল দিল্লীর অধিবাসী এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। তিনি আমেরিকার সানফ্রানসিস্‌কোতে একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। এখান থেকে তিনি 'গদর' নামক পত্রিকাও বের করেন। ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের লক্ষ্যে এতে বিদ্রোহাত্মক উত্তেজনাকর প্রবন্ধ প্রকাশ করা হত। মাঝে মাঝে লিফলেট ও প্রচারপত্র প্রচার করা হত। এতে গোপন বিপ্লবী দল গঠনের জন্য উৎসাহিত করা হত। হরদয়ালের এ বৈপ্লবিক দলে হিন্দু, মুসলিম এবং শিখ সকলেই সমবেতভাবে সদস্য হত। রামচন্দ্র ও মৌলবী বরকতুল্লাহ্ এ দলের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তুরস্ক ও জার্মানী এ দলের পৃষ্ঠপোষকতা করত। [৫৮]

ঙ) উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী'র ভূমিকা:

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও উবায়দুল্লাহ সিন্ধী:

ব্রিটিশের সৃষ্ট 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' এবং তৎকর্তৃক হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে গঠিত 'মুসলিম লীগ' ও 'হিন্দু মহাসভা' প্রত্যেক দলই নিজ নিজ দাবি আদায়ে তৎপর। অপরদিকে বিপ্লবী দলসমূহ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বক্রীয়ভাবে বিপ্লবাত্মক কার্যসিদ্ধিতে উদগ্রীব। এ সময়ে শায়খুলহিন্দ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতকে ব্রিটিশ কবলমুক্ত করতে চেয়েছেন।[৫৯] উবায়দুল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ মুরব্বী দূরদর্শী আলিম হযরত শায়খুলহিন্দু অনেক আগ থেকেই অনুভব করেছিলেন যে, রাষ্ট্র-লোলুপ লাল সাম্রাজ্যবাদীদেরকে সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত এদেশ থেকে তাড়ানো সম্ভব নয়।[৬০] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেন, "হে ভারতবাসী! জিহাদের মাধ্যমেই জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। যে জাতির মধ্যে জিহাদের স্পিরিট নির্বাপিত হয়েছে, তারাই অপমান-অপদস্ত হয়েছে। দুনিয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তারা পতিত জাতি হিসেবে পরিণত হয়েছে।"[৬১] সুতরাং তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শায়খুলহিন্দ মনে করতেন, ভারতের সর্বস্তরের স্বাধীনতাকামী জনগণ, মধ্যপ্রাচের দেশসমূহ বিশেষ করে আফগানিস্তান, ইরান এবং তুরস্কের উসমানীয় খিলাফতকে একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে ইউরোপের (ব্রিটিশ) উপর আক্রমণ করা ব্যতীত এশিয়াকে ইউরোপের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না।[৬২] তাঁর পরিকল্পিত সশস্ত্র বিপ্লব বাস্তবায়নের রূপরেখার মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি এবং বহিরাক্রমনের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করা।[৬৩] সে উদ্দেশ্যে তিনি একটি কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন: তুর্কী সামরিক বাহিনী কাবুলের ভেতর প্রবেশ করে সীমান্ত দিয়ে ব্রিটিশ ভারতে আক্রমণ করবে। একই সময়ে ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ঘটানো হবে।[৬৪] তাই তিনি আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে যে দু'জন সহকর্মীকে নির্বাচিত করেছিলেন তাঁরা হলেন- তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত শাগরেদ্ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ও মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূর আনসারী।[৬৫] এছাড়া ডাক্তার মুখতার আহ্‌মদ আনসারী, হাকীম আবদুর রায্‌যাক এবং সীমান্ত প্রদেশের সাহসী বীর যুবক খান' আবদুল গাফফার খান[৬৬] প্রমুখ জড়িত ছিলেন।[৬৭] তা ছাড়া তাঁর নিকট থেকে চূড়ান্ত ডিগ্রিলাভকারীগণ

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর হাতে জিহাদের বয়অত গ্রহণ করে দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর ছিলেন। সীমান্তের হাজী তুরঙ্গাযুয়ী, মুল্লা সান্ডাকের ন্যায় প্রসিদ্ধ বীর মুজাহিদগণও তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন। মাওলানা ফযল মাহমূদ এবং মাওলানা মুহাম্মদ আকর প্রমুখ এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। *মওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী, মাওলানা খলীল আহ্মদ, মাওলানা মুহাম্মদ আহ্মদ* চাকওয়ালী, মাওলানা মুহম্মদ সাদিক, শায়খ আব্দুর রহীম সিন্ধী, মওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম বান্দেরী, মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ দীনপুরী, মাওলানা তাজ মাহ্মূদ আমরূঠী প্রমুখ তাঁর আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।[৬৮] এতদ্ব্যতীত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা যাফর আলী খান, হাকীম আজমল খান, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, মাওলানা শওকত আলী, নওয়াব ওকারুল মূল্ক এবং মাওলানা হাসরত মোহানীর ন্যায় শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এ সশস্ত্র বিপ্লবের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং যথাযথ সহায়তা ও পরামর্শ দেন।[৬৯] দেশের শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ যেভাবে তাঁর (মাহমূদ হাসান) নিকট আগমন করে পরামর্শ ও মতবিনিময় করত তদ্রূপ হিন্দু, শিখ ও বাঙালি নেতৃবৃন্দ ও তাঁর নিকট আগমন করে রাজনৈতিক সলা-পরামর্শ করত। আগত হিন্দু, মুসলিম ও শিখ নেতৃবৃন্দের থাকার জন্য তিনি তাঁর বাসভবনের নিকটেই একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এখানে প্রত্যেক ধর্মের লোকদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। মাহমুদ হাসানের বাসভবনের এক গোপন কক্ষে আগত নেতৃবৃন্দের সাথে অতি সন্তর্পণে মত বিনিময় করতেন।[৭০] উপমহাদেশে এমন বহু বিপ্লবী নেতা ছিলেন যারা মাহমূদ হাসানের নিকট জিহাদের বায়াত লাভ করার সুযোগ পান নি; কিন্তু তারাও তাঁর জিহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েন। তারা তাকে আর্থিক সহায়তা করে এবং সক্রিয়ভাবে তাঁর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ব্রিটিশের সি. আই. ডি. রিপোর্টে 'Who is who'- এর তালিকায় এ ধরনের বহু বিপ্লবীর নাম দেখতে পাওয়া যায়।[৭১]

শায়খুলহিন্দ উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতীয় স্বাধীন এলাকাসমূহের অবস্থান নিরূপণ, যোগাযোগের রাস্তা আবিষ্কার ও সামরিক ছাউনি নিরূপণের নীল নকশা প্রণয়নের দায়িত্ব দেন। সিন্ধী দীর্ঘ সাত বছর পরিশ্রম করে শায়খ মুহাম্মদ ইব্রাহীমের সহযোগিতায় সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মাওলানা মনসূর আনসারীকেও তিনি সীমান্তের উপজাতীয়দের মধ্যে জিহাদের চেতনা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে সেখানে পাঠান। সীমান্ত এলাকায় শায়খুল হিন্দের অসংখ্য ছাত্র ছিলেন যারা শায়খুল হিন্দের আদর্শে পূর্ব থেকেই অনুপ্রাণিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ নিজেকে মনসূর আনসারী নামে পরিচয় দিতেন।[৭২]

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানোর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের উপর বহিরাগত আক্রমণ কোথা হতে কোন পথে হবে, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কেন্দ্র ও আন্তর্জাতিক কেন্দ্রসমূহ কোথায় অবস্থিত এবং আফগানিস্তানে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর পৌঁছার পূর্বে ভারতে বিপ্লব পরিচালনাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা গেল:

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ ভারতের উপর বহিরাক্রমণের পথ নির্ধারণঃ

উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশকে উৎখাত করার লক্ষ্যে তুরস্ক ব্রিটিশ ভারতকে আক্রমণ চালাবে। তুরস্ক ও উপমহাদেশের মাঝে ইরান ও আফগানিস্তান অবস্থিত। তাই ইরান ও আফগানিস্তানের সাথে আতাঁত করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। ইরান ব্রিটিশ কর্তৃক প্রভাবিত ছিল। এ জন্য এর উপর দিয়ে ব্রিটিশ ভারতকে আক্রমণ করা সহজসাধ্য নয়। আফগানিস্তান ব্রিটিশ দ্বারা প্রভাবিত হলেও আপমর জনসাধারণ বিদ্রোহ করার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। আমীর হাবীবুল্লা খান যদিও ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং দুর্বল ছিলেন। তিনি তাঁর দেশকে যুদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিলেন না। যখন তিনি পরামর্শের জন্য দেশের সর্বস্ত রের লোককে আমন্ত্রণ জানালেন তখন দেশের আমন্ত্রিত আপামর নেতৃবৃন্দ, অফিসারবৃন্দ এমনকি নাসরুল্লাহ্ খান এবং আমানুল্লাহ্ খানও ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত ব্যক্ত করেন। শুধু আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান ও ইনায়াতুল্লাহ্ খান যুদ্ধ করার বিপক্ষে মতামত দেন। যুদ্ধ করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এক ও অভিন্ন দেখে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান এ-দুয়ের মাঝামাঝি একটি প্রস্তাব পেশ করেন। নির্দিষ্ট কয়েকটি পাহাড়ী এলাকার পদ দিয়ে তুরস্ক বাহিনী ব্রিটিশের উপর আক্রমণ চালাবে। আফগানী সৈন্যগণ এ যুদ্ধে কোন অবস্থাতেই অংশগ্রহণ করবে না। তবে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় নিজেদের জানমাল উৎসর্গ করতে পারে। ব্রিটিশ ভারতকে আক্রমণের জন্য চারটি পথ নির্ধারিত করে দেয়া হয়:

(১) কালাত ও মাকরান গোত্রসমূহ তুর্কী সৈন্যদের নেতৃত্বে করাচী সেক্টরে আক্রমণ চালাবে।

(২) গযনী ও কান্দাহারের গোত্রসমূহ তুর্কী সৈন্যের নেতৃত্বে কোয়েটা সেক্টরে আক্রমণ চালাবে।

(৩) পেশোয়ার সেক্টরে দুর্‌রা-এ খায়বরের মাহ্‌মন্দ ও মাসূউদী গোত্রসমূহকে নিয়ে তুর্কী সেনাবাহিনী আক্রমণ চালাবে।

(৪) উগী সেক্টরে কূহিস্তানী গোত্রসমূহ তুরস্কের বাহিনীসহ সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাবে।

এই চারটি সেক্টরে ভারতীয় বিপ্লবী দলের সদস্যগণ পূর্ব থেকেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কালাত সেক্টরে মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক করাচবী, কোয়েত সেক্টরে হাফিয তাজ মাহ্‌মুদ সিন্ধী, পেশোয়ারের দুর্‌রা-এ খায়বর সেক্টরে হাজী তুরঙ্গাযয়ী, উগী সেক্টরে মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক নেতৃত্ব দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। লুই নেপালে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। রাশিয়া সহযোগিতা করলে নেপালী গোত্রসমূহ নেপাল সেক্টরে ব্রিটিশের উপর আক্রমণ চালাবে।[৭০]

Dhaka University Institutional Repository

দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কেন্দ্র ঃ

উপমহাদেশে ব্রিটিশের উপর বহিরাক্রমণের সাথে সাথে দেশের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহের পরিকল্পনা ছিল। এ জন্য দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য তৈরী করা এবং এমন এক দল সৃষ্টি করা, নির্দিষ্ট সময়ে ব্রিটিশ ভারতের উপর বহিরাক্রমণ করার সাথে সাথে যেন তারা বিদ্রোহ করতে সক্ষম হয়। মাওলানা মদনী এর জন্য একটি হেড কোয়ার্টার ও আটটি বিদ্রোহ কেন্দ্রের উল্লেখ করেন।

হেড কোয়ার্টার:

দিল্লী ছিল বিদ্রোহী দলের হেড কোয়ার্টার। এ হেড কোয়ার্টারের নেতৃবৃন্দ ছিলেন শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মহাত্মা গান্ধী, ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ। তাঁদের নির্দেশক্রমে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে ভারতীয় বিপ্লবী দল বিপ্লব পরিচালনা করতেন।[৭৪]

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কেন্দ্রসমুহ:

(১) **রান্দের:** এটি ছিল সূরত, গুজরাট এবং বোম্বের কেন্দ্র, এখানে মওলানা ইবরাহীম কাষী, আহমদ বুযুর্গ, পাননূঁ পিটল প্রমুখ বিপ্লবী কর্মীবৃন্দ কর্মরত ছিলেন। এ কেন্দ্রের নেতা ছিলেন মওলানা ইব্রাহীম।

(২) **পানিপথ:** এটি ছিল যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত জেলাসমূহের কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের নেতা ছিলেন মাওলানা মাহমূদুল্লাহ পানিপথী।

(৩) **লাহোর:** এটি ছিল পাঞ্জাবের কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের আমীর ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আহ্মদ চাকওয়ালী।

(৪) **দীনপুর:** এটি ভাওয়ালপুর স্টেটের কেন্দ্র ছিল। মওলানা আবুস সিরাজ মুহাম্মদ এ কেন্দ্রের নেতা ছিলেন। তিন বছর কারাবরণ করার পরও তিনি বিপ্লবী দলের কোন তথ্য প্রকাশ করেন নি।

(৫) **আমরোট:** এটি সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের কেন্দ্র ছিল। মওলানা তাজ মাহমূদ এ কেন্দ্রের আমীর ছিলেন। চার বছর কারাভোগ করার পরও বিপ্লবী দলের কোন তথ্য প্রকাশ করেন নি।

(৬) **করাচী:** এটি করাচী, কালাত এবং লাসবেলার কেন্দ্র ছিল। এ কেন্দ্রের নেতা ছিলেন মওলানা মুহাম্মদ সাদিক। তিনি লাসবেলাতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের বিরাট ক্ষতিসাধন করেন। অবশেষে গ্রেফতার হয়ে এক বছর কারাভোগ করেন। তিনি বিপ্লবী দলের কোন তথ্য ফাঁস করেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) **আতমানযয়ী:** এটি উত্তর সীমান্তের কেন্দ্র ছিল। এ কেন্দ্রের নেতা ছিলেন খান আবদুল গাফ্ফার খান। তিনি এ কেন্দ্রে বিশেষ অবদান রাখেন। গ্রেফতার হওয়ার পরও ইংরেজগণ তাঁর নিকট থেকে কোন তথ্য উদঘাটন করতে পারে নি।

(৮) **তুরঙ্গাযয়ী:** এটি ছিল ইয়াগীস্তানের কেন্দ্র। মওলানা ফযলে ওয়াহিদ ছিলেন এ কেন্দ্রের নেতা। চার বছর তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।[৭৫]

ইয়াগীস্তানের অধিবাসীরা কখনো ব্রিটিশের সামনে মাথা নোয়ায় নি। তারা ছিল নির্ভীক ও সাহসী জাতি। তবে তারা সুশৃংখল ছিল না। পরস্পরে ও গোত্রে গোত্রে মারামারি ও হানাহানি করত। *শায়খুলহিন্দ ও উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বার্থে ইয়াগীস্তানবাসীদের সকল* গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করলেন। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা দিল্লী থেকে মাওলানা সাইফুর রহমান, পেশওয়ার থেকে মাওলানা ফযলে রাব্বী ও ফযলে মাহমুদকে ইয়াগীস্তান প্রেরণ করেন। এছাড়াও ইয়াগীস্তানের মাওলানা মুহাম্মদসহ সেখানকার শায়খুলহিন্দের সাগরিদগণ ইয়াগীস্তানে বিদ্যমান গোত্রসমূহকে ঐক্যবদ্ধ ও ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলতে সক্ষম হন।[৭৬] শায়খুলহিন্দ, মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ও মাওলানা উযায়রগুলের মাধ্যমে সীমান্তের লৌহমানব আধ্যাত্মিক মনীষী ও পেশওয়ারের অদ্বিতীয় প্রভাবশালী পীর হাজী তুরঙ্গাজয়ীকে ইয়াগীস্তান আগমন করে জিহাদ পরিচালনার অনুরোধ জানালে, তিনি সেখানে আগমন করেন এবং জিহাদ পরিচালনা করেন। তাঁর আগমনে অসংখ্য মুজাহিদের সমাগম ঘটে। তখন সীমান্তে মুজাহিদগণের বিপুল সমাগম দেখে ইংরেজ সৈন্যরা তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুজাহিদগণও আক্রমণের পাল্টা জবাব দিয়ে কয়েক প্লাটুন ব্রিটিশ সৈন্যের কবর রচনা করেন। এ সব আক্রমণের জন্য আফগানিস্তান থেকে ব্যাপক অস্ত্রের সাহায্য পাওয়া গেলেও মুজাহিদগণের রসদ ও গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেলে, তা যোগাতে হত শায়খুলহিন্দ ও সিন্ধীকে ভারত থেকেই অথবা মুজাহিদগণকে এ সব সংগ্রহের জন্য যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে বাইরে যেতে হত।[৭৭] হাজী তুরঙ্গাজয়ী পরিচালিত মুজাহিদ আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা চির অভিসপ্ত ভেদনীতি বা 'ডিভাইড এন্ড রুলনীতি' প্রয়োগের মাধ্যমে মুজাহিদগণের আক্রমণ বানচালের অপকৌশল অবলম্বন করে। ইংরেজরা এ জন্য আফগান আমীর হাবীবুল্লাহ খানকে প্রচুর অর্থ প্রদান ও তাঁর পুত্র ইনায়াতউল্লাহ খানকে ভবিষ্যৎ আফগান সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে পাঠান সর্দারদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে সক্ষম হয়। ফলে হাজী তুরঙ্গাজয়ীর সৈন্যদের মধ্যে ভাঙন ধরে।[৭৮] তখন ইয়াগীস্তানের নেতৃবৃন্দ শায়খুলহিন্দকে সেখানে গিয়ে উপজাতিদের বিভেদ মিটিয়ে জিহাদের জন্য পুনরায় উদ্বুদ্ধ করার আবেদন জানালেন এবং মুজাহিদগণের রসদ ও গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেছে সে সংবাদও জানালেন; যেগুলোর যোগান দেয়া শায়খুলহিন্দ ও সিন্ধী ব্যতীত অন্য কারো সম্ভব নয়।[৭৯] এ পরিস্থিতিতে জনসাধারণের সামান্য আর্থিক সাহায্য দ্বারা দীর্ঘ মেয়াদী জিহাদের বিশাল ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয় ভেবে শায়খুলহিন্দ ও সিন্ধীর পরামর্শে ভারতীয় বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি শায়খুলহিন্দের দেওবন্দের বাসভবনে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আগামী ১৯১৭ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পরিকল্পিত বিপ্লব ঘটাতে হবে। আর সে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন, ইতোপূর্বে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে তুর্কী ও আফগান সরকারের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় বিপ্লবী দলের যে গোপন চুক্তি হয়েছিল; সেগুলো সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নেয়া। চুক্তিসমূহ বাস্তবায়নের রূপরেখা ছিল: ''শায়খুলহিন্দ মাহমুদ হাসান নিজে মক্কা হয়ে তুরস্কে যাবেন এবং তুর্কী সরকার কর্তৃক চুক্তির অনুমোদন নিয়ে কাবুলে আসবেন এবং কাবুল সরকারের পক্ষ থেকে ঐ চুক্তির অনুমোদন নিয়ে সে সম্পর্কে তুর্কী সরকারকে অবহিত করাবেন। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ভারতের উপর আক্রমণ করবে।" সে কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে উবায়উল্লাহ্ সিন্ধীকে আফগানিস্তানে প্রেরণ করা হবে।[৮০]

দেশ-বিদেশে মিশন প্রেরণ:

জাপান, চীন, বার্মা, ফ্রান্স ও আমেরিকার সরকার ও সর্বসাধারণের জনমত গঠনের লক্ষ্যে বিশেষ মিশন প্রেরণ করা হয়। এ মিশন প্রেরণের সময়কাল ছিল ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যবর্তী সময়।[৮১] বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণের সমর্থন লাভের জন্য সে সময় মিশন ও দূত প্রেরণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই ভারতের বিপ্লবীদল জনমত গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে মিশন প্রেরণ করতে আরম্ভ করেন।[৮২]

ক) চীন ও বার্মা মিশন:

মাওলানা মকবূলুর রহমান এবং শওকত আলীর সমন্বয়ে একটি মিশন চীন প্রেরণ করা হয়। মাওলানা মকবূলুর রহমান সীমান্তের অধিবাসী এবং দারুল উলূম দেওবন্দের চূড়ান্ত ডিগ্রিপ্রাপ্ত আলিম ছিলেন। তিনি শায়খুলহিন্দ ও সিন্ধীর বৈপ্লবিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় অজ্ঞ ছিলেন বলে শওকত আলীকে সহকর্মী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে নেন। শওকত আলী ছিলেন বাংলার অধিবাসী এবং সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের সন্তান। তিনি আধুনিক শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। তদুপরি তিনি চীনের ভাষায়ও পারদর্শী ছিলেন। দেশকে ব্রিটিশ কবলমুক্ত করার উদ্দীপনায় তিনি এই বিপ্লবী আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য হন। মাওলানা আব্দুর রহমানের সাথে ১৯৪২ সালে মাওলানা মকবূলুর রহমানের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁর মিশনের ব্যাপারে জানতে চাইলে মকবূলুর রহমান এভাবে তার একটি বিবরণ দেন: "মিশনে আমরা আটজন সদস্য ছিলাম। চীনে আগমন করে আমরা মুসলমান সদস্যগণ ধর্মীয় ভিত্তিতে কাজ করা সমীচীন বলে মনে করি। হিন্দু সদস্যগণ এতে একমত হতে পারে নি। ধর্মের ভিত্তিতে কাজ করলে সফলতা লাভ করা যাবে বুঝাতে সক্ষম হওয়ায় তারাও ঐকমত্য পোষণ করে। তথায় আমরা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে এর শাখা প্রতিষ্ঠা করি। এ প্রক্রিয়ায় আমরা সেখানকার মুসলমান এবং সর্বসাধারণকে আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে জনমত গঠন করতে থাকি। এতে আমরা বিপুল সফলতা অর্জন করি। আমরা মাসিক 'আল য়্যাকীন' পত্রিকা চীন ও উর্দু ভাষায় প্রকাশ করি। ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত এখানে কাজ করার পর কেন্দ্রীয় নির্দেশে আমরা বার্মাতে চলে আসি। এখানে আমরা ১৯১৫ সাল পর্যন্ত কাজ করি। চীনে যে সফলতা লাভ করি বার্মাতে তা লাভ হয় নি। কেননা বার্মার জনগণ ব্রিটিশের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। ধর্মীয় ভিত্তিতে এখানে কাজ করা দুরূহ ছিল বিধায় 'মানব সেবা'-এর নামে কাজ করতে আরম্ভ করি। কেননা এখানে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব ছিল। এখানে আমরা 'ইনসানী বেরাদরী' আঞ্জুমান গঠন করি। এর ফলে এখানেও আমরা সফলতার সাথে কাজ করতে সক্ষম হই।" তিনি আরও বলেন, "১৯১৬ সালে আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় শওকত আলী দুই হিন্দু সদস্যসহ ভারতে ফিরে আসেন। আমি রেঙ্গুনে অবস্থান করে একটি ইউনানী চিকিৎসালয় খুলি। এখানে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত অবস্থান করে হজ্ব পালন শেষে স্বদেশে ফিরি।"[৮৩]

খ) জাপানে মিশন প্রেরণঃ

প্রফেসর বরকতুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি মিশন জাপানে প্রেরণ করা হয়। বরকতুল্লাহ ভূপাল স্টেটের জনৈক অফিসারের সন্তান ছিলেন। তিনি আধুনিক শিক্ষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। তুর্কী, জাপানী ও জার্মানী ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। আরবি ভাষাও সামান্য জানতেন। তিনি ভূপালে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রাইভেট টিউশনি করতেন। এই সময়ে তিনি বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হয়ে এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জাপান মিশনের নেতৃত্ব দিয়ে চারজন সদস্যসহ মিশনকে জাপান প্রেরণ করা হয়। তিনি জাপানে টোকিও-এর একটি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। 'ইসলামিক ফ্রেটারনিটি, (Islamic Fraternity) নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন এবং এ নামেই একটি দৈনিক পত্রিকা জাপানী ও ইংরেজি ভাষায় চালু করেন। এ সময়ে ফ্রান্স মিশনে একজন পারদর্শী উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন হওয়ায় কেন্দ্রীয় নির্দেশে মিশনের একজন সদস্যসহ তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। অপর তিনজনের উপর জাপানী মিশনের কাজ অর্পিত হয়। তিনি ফ্রান্সে যাওয়ার সময়ে কলেজের অধ্যাপনা থেকে ইসতিফা দেন এবং দৈনিক পত্রিকা বন্ধ করে দেন।[৮৪]

গ) ফ্রান্সে মিশন প্রেরণঃ

চৌধুরী রহমত আলী পাঞ্জাবীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি মিশন ফ্রান্সে প্রেরণ করা হয়। এই তিন সদস্যের মধ্যে রামচন্দ্র নামক জনৈক শিক্ষিত যুবক মিশনের সহকারী ছিলেন। চৌধুরী রহমত আলী নিজেও একজন শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট্ ছিলেন। তিনি ইংরেজিতে বিজ্ঞ ছিলেন। তারপর চার বছর পর প্যারিসের মিশনে মাওলানা বরকতুল্লাহ্‌র ন্যায় বিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ায় কেন্দ্রীয় নির্দেশে মাওলানা বরকতুল্লাহ্ একজন সদস্যসহ টোকিও থেকে প্যারিসে চলে আসেন। এতে ফ্রান্স মিশনে সদস্য সংখ্যা হয় পাঁচজন। তাঁরা এখানে আগে দু'বছর সক্রিয়ভাবে মিশনের কাজ চালিয়ে যান। ফ্রান্স মিশন 'গদর পার্টি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁরা 'ইনকিলাব' পত্রিকা প্রকাশ করে।

ঘ) আমেরিকা মিশন প্রেরণঃ

হরদয়ালের নেতৃত্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন আমেরিকাতে প্রেরণ করা হয়। এ মিশন এখানে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। এরপর প্রফেসর বরকতুল্লাহ এবং চৌধুরী রহমত আলী ও ফ্রান্স থেকে আমেরিকা চলে আসেন। এখন ছয় সদস্যের পরিবর্তে আট সদস্য বিশিষ্ট মিশন হয়। ইতঃপূর্বে বহুবার চৌধুরী রহমত আলী প্যারিস থেকে ওয়াশিংটনে যাতায়াত

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। পূর্বে তাঁর অবস্থান স্থল ছিল প্যারিস আর বর্তমানে অবস্থানস্থল হলো ওয়াশিংটন। আমেরিকান মিশন 'গদর পার্টি' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করে। প্রফেসর বরকতুল্লাহর ওয়াশিংটনে আগমনের পর ওখান থেকে 'গদর' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকায় বিপ্লবী দলের কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য যথারীতি প্রচারিত হতে থাকে।

মওলানা আবদুর রহমান বলেন, একদা আমি পাঞ্জাবের এক পল্লী অঞ্চলে তবলীগী সফরে গমন করি। তথায় একজন বর্ষীয়ান বুযুর্গের গৃহে আমার রাত যাপনের সুযোগ হয়। আমি এই বুযুর্গের চালচলন ও চরিত্র প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়ি। তাঁর মধ্যে শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুত পড়া, কুরআন গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করা ইত্যাদি বুযুর্গীর লক্ষণসমূহ প্রত্যক্ষ করি। প্রাতরাশ সমাপনের পর বর্ষীয়ান বুযুর্গের পরিচিতি জিজ্ঞেস করায় তিনি তাঁর নাম রহমত আলী বলে উল্লেখ করেন। পুনরায় আমি তাঁকে তাঁর আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণের কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন আমি শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসানের হাতে বয়অত হয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেছি। তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণে পড়ল আপনি কি ঐ চৌধুরী রহমত আলী নন যাঁর নাম পত্র পত্রিকায় পড়ে থাকি? উত্তরে তিনি বললেন– হ্যাঁ, আমি সেই অধম। আমি তাঁকে তাঁর বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি আমাকে বিপ্লবের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করেন। চৌধুরী রহমত আলীর বর্ণনা এরূপ: আমরা ফ্রান্সে যে সংগঠন স্থাপন করেছিলাম তার নাম হল 'গদর পার্টি' এবং যে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলাম তার নাম হল 'ইনকিলাব'। ওয়াশিংটনেও অনুরূপ 'গদর পার্টি' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেছিলাম এবং যে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলাম তার নাম হল 'গদর' পত্রিকা। 'গদর' ও 'ইনকিলাব' এ দু'টি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রফেসর বরকতুল্লাহ্। আমাদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা রঙের ব্যবসা শুরু করি। ভারতের বহু বিপ্লবী সদস্য আমাদের নিকট থেকে ওয়াশিংটনে আগমন করে রং ক্রয় করত। পেশোয়ারের দু'জন মুসলমান ও একজন হিন্দু; লাহোরের দু'জন মুসলমান ও পাঁচজন হিন্দু; দিল্লীর চারজন মুসলমান ও তিনজন হিন্দু; বোম্বের একজন মুসলমান ও চারজন হিন্দু; কোলকাতার দু'জন মুসলমান ও চারজন হিন্দু; করাচীর একজন হিন্দু এবং ঢাকার একজন মুসলমান ও দুজন হিন্দু আমাদের রঙের ক্রেতা ছিল এবং বরাবর রং ক্রয়ের জন্য তারা ওয়াশিংটন আসত। এই ক্রেতাদের মাধ্যমে আমরা কেন্দ্রের নির্দেশাবলি লাভ করি এবং আমাদের কার্যাবলির রিপোর্ট এদের মাধ্যমেই কেন্দ্রে পৌঁছে যেত।

আমি ভারত থেকে জমি বিক্রয় করে যে অর্থ কড়ি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম তা দিয়ে আমেরিকাতে একটি ভাড়া করা বাড়ি নিয়ে হোটেল করি। এই বাড়ির একটি কক্ষ পার্টির কার্যালয় ছিল। একটি কক্ষ ছিল দৈনিক পত্রিকার কার্যালয়। আর এ হোটেলটি আমাদের বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনের কেন্দ্রও ছিল। এ হোটেলের আয় থেকে আমরা আমাদের নিত্যদিনের ব্যয় নির্বাহ করতাম। ওয়াশিংটনে আমার আগমনের পূর্বে হোটেলটি হরদয়ালের তত্ত্বাবধানেই চলতে থাকে। এরপর যখন আমি প্যারিস থেকে ওয়াশিংটনে চলে আসি তখন আমার তত্ত্বাবধানেই এ হোটেলটি চলতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন আমেরিকা জড়িয়ে পড়ে তখন আমরা বিপজ্জনক মনে করে হোটেলটি বিক্রয় করে দেই। এতদ্সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশনাও

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধ করে দেই। এরপর আমরা প্যারিস হয়ে জেনেভায় পৌঁছি। অতঃপর সেখান থেকে বার্লিন হয়ে আফগানিস্তানে আগমন করি।[৮৫]

সিন্ধী ও শায়খুলহিন্দের দেশত্যাগ:

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৯১৮ সালে এর অবসান ঘটে। মিত্র শক্তিবর্গের মধ্যে ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সার্ভিয়া মন্টেমিগ্রো ও জাপান। কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ছিল জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ক। ঐ যুদ্ধের সুযোগে উপমহাদেশের বাইরে নানা স্থানে ভারতীয় প্রবাসীদের উদ্যোগে স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলন শুরু হয়। ইয়াগিস্তান শায়খুলহিন্দ ও সিন্ধীর বিপ্লবী মিশনের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। সর্বপ্রথম তাঁরা ইয়াগিস্তানের দিকে মনোনিবেশ করেন।[৮৬]

ক) সিন্ধীর আফগানিস্তানে গমন:

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় উপমহাদেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় প্রবাসীগণ স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামের কাজ আরম্ভ করে দেয়। এদিকে ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রত্যেকটি রাজনীতিক এবং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। চারদিকে ধরপাকড় শুরু হয়। তারা একে একে মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখকে গ্রেফতার করতে আরম্ভ করে। এমন সময় উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর নিকট শায়খুলহিন্দের এই আদেশ এসে পৌঁছালো, "তুমি কাবুলের পথে যাত্রা কর এবং আমি হিজাযের পানে ছুটছি।" উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী এ আদেশ পেয়ে দিল্লী ত্যাগ করে ১৯১৫ সালের এপ্রিলে সিন্ধুতে চলে আসেন। তিনি তিন চার মাস কাবুলের পথঘাটের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। একদিন তিনি শায়খ আবদুর রহীমকে[৮৭] সঙ্গে নিয়ে কাবুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শায়খ আবদুর রহীম মাওলানা সিন্ধীকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। মাওলানা সিন্ধী আব্দুল্লাহ, ফাতেহ, মুহাম্মদ আলী-এই তিন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে বেলুচিস্তান ও ইয়াগিস্তান হয়ে বিনা পাসপোর্টে কাবুলের পথে যাত্রা করেন এবং ১৯১৫ সালের ১৫ আগস্ট আফগান সীমান্তে পৌঁছে মাগরিবের নামায আদায় করেন।[৮৮]

আফগানিস্তানের আযাদ ভূমিতে এই নামায হল সিন্ধীর প্রথম নামায। নামায সমাপনান্তে তিনি কান্দাহারের পথে চলতে আরম্ভ করেন। কান্দাহার পৌঁছে তিনি তাঁর কতিপয় পরিচিত *বন্ধু বান্ধবের সন্ধান পান। তারা সিন্ধীর আগমনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে বেশ আপ্যায়ন* করেন।[৮৯] সিন্ধী বলেন, "আফগানিস্তানের যে এলাকায় আমরা প্রবেশ করেছিলাম, তা ছিল সুরাফিকের অন্তর্ভূক্ত। তথাকার শাসনকর্তার সাথে দেখা করেছি। আমাদের পাসপোর্ট না থাকায় তিনি সন্দেহ করতে লাগলেন। কিন্তু আমরা যখন আবেদন করলাম যে, সরকারি হেফাযতে আমাদের কান্দাহার পৌঁছে দেয়া হোক- আমরা সেখানে গিয়ে সরকারকে নিশ্চিন্ত করতে সক্ষম হবো, তখন তিনি কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। আমরা তার যে জবাব দিয়েছিলাম, তাতে তাঁর সন্দেহ দুর হয়েছে। ফলে তিনি আমাদের সম্মানিত সরকারি মেহমান হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং আমাদের কান্দাহার যাওয়ার সকল ব্যবস্থাই করে দিলেন।" সিন্ধী আরও বলেন, "তথাকার সরকারি প্রতিনিধি কয়েকদিন আমাদের বেশ সম্মানের সাথেই মেহমানদারী

Dhaka University Institutional Repository

করলেন। অতপর কাবুলে যাওয়ার ব্যবস্থাতো করে দিলেনই; তদুপরি কাবুলে কয়েকদিন থাকবার রসদও দিয়ে দিলেন।[১০]

অতঃপর কাবুলে উপনতি হন। পথিমধ্যে আফগানিস্তানের স্থানীয় সরকারগুলো তাকে সহায়তা করেন। তিনি কাবুলে ইতঃপূর্বে আগত অনেক স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দেরকে দেখতে পান।[১১] তাঁরা আগে থেকেই সিন্ধীর আগমন বিষয়ে অবগত ছিলেন। স্বরণযোগ্য, স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ১৯১৫ সালের ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানের স্বাধীন ভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন, সেই ১৫ আগস্ট (১৯৪৭ সালে) ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল।

এটা স্পষ্ট কথা যে, উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর কাবুল গমন ছিল একটি দুঃসাহসিক অভিযান। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণ নজর, ধরপাকড়ের আশংকা এবং পদে পদে ছিল কঠিন বিপদ ও মৃত্যুর বিভীষিকা। যেহেতু সিন্ধীর কাবুলে পৌঁছার আগেই কয়েকজন ভারতীয় একটি রাজনৈতিক অভিযোগে সেখানে গ্রেফতার হয়েছিলেন। কিন্তু সিন্ধী সাহস হারান নি; বরং আল্লাহর উপর ভরসা করে যাত্রা করেছিলেন। যেহেতু উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর পেছনে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সর্বদা পিছু লেগে থাকত, তাই শায়খুলহিন্দ সিন্ধীকে কোন প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিস্ত ারিত কিছু বলতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি বিস্তারিত বুঝতে সক্ষম হতেন এবং যে কোন সংকট মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।[১২]

বিপ্লবী দলের নেতৃবর্গ ইয়াগীস্তানের জনগণকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস পান। এরই আলোকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মিশনের কর্মপন্থা নির্ধারণ ও আফগান সরকারের সাথে বিপ্লবী দলের চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে শায়খুলহিন্দ সিন্ধীকে কবুলে প্রেরণ করেন। মাওলানা মদনী বলেন: "...সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতিরেকে ইংরেজগণকে ভারত থেকে উৎখাত করা মোটেই সম্ভব নয়। এর জন্য যুদ্ধ কেন্দ্র অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ এবং নির্ভীক মুজাহিদদের একান্ত আবশ্যক। ইয়াগীস্তানকে বিপ্লবী দলের বহিরাক্রমণের যুদ্ধ কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়। কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের রসদ, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধোখাদ নির্ভীক সাহসী সৈন্যের বিশেষ প্রয়োজন। এছাড়া যেহেতু সীমান্তের যুবকেরা যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত এবং সাহসী ও নির্ভীক হয় এজন্য একতাবদ্ধ করা এবং জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করাও প্রয়োজন এবং এদের দ্বারাই দেশ মুক্ত করা সম্ভব।[১৩]

সিন্ধী তাঁর কাবুল সফর সম্পর্কে বলেন, "১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্টে শায়খুলহিন্দের নির্দেশে আমি কাবুল গমন করি। তবে শায়খুলহিন্দ কাবুলের বিস্তারিত কর্মসূচি আমাকে বলেন নি। তাই প্রথমে কাবুলে যাওয়ার বিষয়টি আমার নিকট ভাল লাগে নি। কিন্তু শায়খুলহিন্দের নির্দেশে যেতে হয়েছিল। আল্লাহ্ পাকের অসীম দয়া-অনুকম্পা যে, ভারত থেকে বের হবার রাস্তা আমার জন্য পরিষ্কার হয়ে গেল এবং আমি আফগানিস্তানে পৌঁছে গেলাম। রওয়ানা হবার সময় দিল্লীর রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের জানিয়ে দিলাম, আমার কাবুল যাবার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তাঁরাও আমাকে তাঁদের প্রতিনিধি মনোনীত করলেন। তবে কোন যুক্তিসংগত প্রোগ্রামের বিষয়ে তারাও আমাকে বলতে পারেন নি। কাবুলে পৌঁছে আমার বুঝে আসল, হযরত শায়খুল হিন্দ যে জামা'আতের প্রতিনিধি ছিলেন সেই জামা'আতের পঞ্চাশ বছরের পরিশ্রমে অর্জিত সবকিছু অবিন্যস্তভাবে আমার সামনে দিক

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। শায়খুলহিন্দের দৃষ্টিতে এসবের জন্য আমার ন্যায় একজন খাদেমের প্রয়োজন ছিল। তাই আমার কাবুল আগমন এবং শায়খুলহিন্দ কর্তৃক আমাকে এ কাজের জন্যে নির্বাচিত করায় আমার মধ্যে গৌরব অনুভব হতে লাগল।"[১৪]

খ) শায়খুলহিন্দের হিজাযে গমনঃ

শায়খুলহিন্দের বিপ্লবী মিশনের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর গ্রেফতার হওয়া অনিবার্য ছিল। ডাক্তার মুখতার আহমদ আনসারী তাঁর গ্রেফতারের সরকারি সিদ্ধান্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অবহিত হতে পেরেছিলেন। তাই দেশ ত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। হিজায হয়ে সিদ্ধান্ত মুতাবিক তুর্কী অভিমুখে যথাশীঘ্র যাত্রা করা প্রয়োজন। তাই তিনি ডাক্তার আনসারীর পরামর্শ মতে ২৯ শাওয়াল ১৩৩৩ হিজরী মুতাবিক ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে সন্ধ্যায় হিজায অভিমুখে যাত্রা করেন।[১৫]

ডাক্তার আনসারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ব থেকেই বোম্বে অবস্থান করে টিকেট ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রাখেন। তিনি বোম্বে পৌঁছেই ৭ যুলকাদা ১৩৩৩ হিজরী/ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর স্টীমার-এ জেদ্দার উদ্দেশ্যে বোম্বে ত্যাগ করেন। এ সময়ে যে সকল বিশেষ ব্যক্তিবর্গ তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন তাঁরা হলেনঃ

১। মওলানা মুহাম্মদ মিঁয়া মনসূর আনসারী।

২। মওলানা মুহাম্মদ সহূল।

৩। মওলানা মুরতাযা হাসান।

৪। মওলানা উযায়র গুল।

৫। হাজী খান মুহাম্মদ।

৬। মওলানা মতলূবুর রহমান।

৭। হাজী মাহবূব খান।

৮। হাজী আব্দুল করীম।

৯। মওলানা ওহীদ আহ্মদ প্রমুখ।[১৬]

এদিকে ইউ. পি.-এর গভর্নর শায়খুলহিন্দকে গ্রেফতার করার জন্য বোম্বে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রেরণ করেন। গ্রেফতারি পরোয়ানা পৌঁছার পূর্বেই শায়খুলহিন্দ জেদ্দার উদ্দেশ্যে বোম্বে ঘাট ত্যাগ করেন। এ জন্য বোম্বে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে নি। অনন্যোপায় হয়ে ইউ. পি-এর গভর্নর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এডেন-এর গভর্নরের নিকট তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রেরণ করা হয়। কিন্তু স্টিমার 'এডেন' ত্যাগ করার পর তাঁর গ্রেফতারি পরোয়ানা আদনের গভর্নরের নিকট পৌঁছলে তারা তাকে গ্রেফতার করতে পারে নি। অবশেষে স্টিমারের কাপ্তানকে টেলিগ্রাম মারফত শায়খুলহিন্দকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়া হয়। সে সময়ে হিজায সরকার স্টিমারের

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রীদের সা'আদ দ্বীপে নামিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় জেদ্দা পৌঁছবার ব্যবস্থা করত। শায়খুলহিন্দের সা'আদ দ্বীপে অবতরণ করার পর কাপ্তানের নিকট তাঁর গ্রেফতারি পরোয়ানা পৌঁছে। এ জন্য তিনিও তাকে গ্রেফতার করতে পারেন নি। এভাবে তিনি তাঁর সহচরবৃন্দসহ মক্কায় পৌঁছে যান।[১৭]

আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ কেন্দ্র:

ভারতীয় বিপ্লবী দলের আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ব্রিটিশ বিরোধী করে তোলা, স্বেচ্ছায় মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে জনগণকে অনুপ্রাণিত করা এবং অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা। আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ কেন্দ্রের হেডকোয়ার্টার ছিল কাবুলে। প্রথমে এর পরিচালক ছিলেন মহেন্দ্র প্রতাপ ও পরবর্তীতে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী এবং মহেন্দ্র প্রতাপ যুগ্মভাবে এর পরিচালনা করেন।

এ হেডকোয়ার্টারের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রের পাঁচটি শাখা ছিল ঃ

(১) মদীনা মুনাওয়ারা: এ কেন্দ্রে মাওলানা হাসান আহ্মদ এবং মাওলানা খলীল আহমদ অভূতপূর্ব কাজ করেন।

(২) কন্স্টান্টানোপ্ল

(৩) আন্কারা

(৪) বার্লিন

(৫) ইস্তাম্বুল

এ সব কেন্দ্রে বিপ্লবী দলের সদস্যগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষভাবে হরদয়াল বার্লিনে বিস্ময়কর কাজ আঞ্জাম দেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় জার্মান, তুরস্ক একই প্লাটফর্মে আসে। *জার্মান সরকার ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হন এবং ব্রিটিশ-ভারত আক্রমণ* করে স্বাধীন করার পর ফিরে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।[১৮]

প্রবাসী স্বাধীনতাকামীদের কাবুলে আগমন:

উপমহাদেশের যে সব ছাত্র জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছিলেন এবং যে সব মুক্তিকামী ভারতীয় নেতা বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তাঁরা ভারত থেকে ইংরেজ উৎখাতের জন্য জার্মান সরকারের সঙ্গে আঁতাত করেন। এ আঁতাতে সরকারও যোগ দেয়। কারণ জার্মানী ও তুরস্ক উভয়ই তখন মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। এ সময়ে হরদয়ালের নেতৃত্বে প্রফেসর বরকতুল্লাহ্, ডা. তারক দাস ও চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর সহযোগিতায় বার্লিনে জার্মান সরকারের পররাষ্ট্র দফতরের অধীনে 'ইন্ডিয়া ন্যাশনাল পার্টি' গঠিত হয়।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

এ স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপও ছিলেন। সি. আই. ডি. রিপোর্টে বলা হয় যে, তিনি ২০ ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে সুইজারল্যান্ড হয়ে জার্মানীতে পৌঁছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টিতে যোগ দেন।[১০০] ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টির কর্মকর্তাবৃন্দ জার্মান সরকারকে প্রভাবিত করে ব্রিটিশ ভারতকে স্বাধীন করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ফলে জার্মান সরকার তুরস্ক সরকারের সহায়তার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রফেসর বরকতুল্লাহ্ এবং জার্মানীর উচ্চপদস্থ কর্মকতাবৃন্দ বার্লিন থেকে তুরস্কে আসেন। তাঁরা আনওয়ার পাশা এবং তুরস্কের সুলতানের সাথে দীর্ঘ এক সাক্ষাতকারে সম্মিলিত হন। এ সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানের পর আফগানিস্তানে এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রফেসর বরকতুল্লাহ, ডক্টর ফ্যান বেন্টিং, কেন্টেন ফ্যান বেন্ডোনীম এবং ক্যাপ্টেন কাসিম বে প্রমুখ।[১০১] প্রতিনিধিদল তুরস্কের সুলতান, জার্মানীর কয়সর এবং জার্মান চ্যান্সেলরের বিশেষ অস্ত্রাবলিসহ আফগানিস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রতিনিধিদল হেরাত পৌঁছলে আফগান গভর্নর তাঁদের মহাসমারোহে অভ্যর্থনা জানান। হেরাতে দু'দিন অবস্থান করার পর প্রতিনিধিদল সেনা অফিসারদের তত্ত্বাবধানে কাবুলে আসেন। কাবুল সরকার বাবরবাগের শাহী অতিথিশালায় প্রতিনিধি দলের অবস্থান করার ব্যবস্থা করেন।[১০২]

প্রতিনিধিদল আমীর হাবীবুল্লাহ[১০৩] এর সাথে সাক্ষাতের প্রার্থনা করলে এর সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ। তিনি কয়সর ওলিয়ম এবং তুরস্কের সুলতানের পত্র আমীরের নিকট হস্তান্তর করেন। এরপর ফ্যান বেন্টিং জার্মান চ্যান্সেলরের আর একটি পত্রও তাঁর খিদমতে পেশ করেন। আমীর প্রতিনিধিদলকে জার্মান এবং তুরস্ক সরকারের যুদ্ধে সহায়তায় ভূমিকাসহ বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য সংগ্রহ করেন। ক্যান্টেন গেন্দ্রেনীষ এবং কাসিম বে ফারসি জানতেন। এ জন্য তাঁরাও এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দুপুর পর্যন্ত এ আলোচনা অব্যাহত থাকে। দুপুরে আমীর প্রতিনিধিদলকে এক প্রীতিভোজের আমন্ত্রণ জানান। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের জন্য হিন্দুরীতিতে পৃথকভোজের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু রাজা মহেন্দ্র ব্যবস্থাকৃত হিন্দু ভোজ আহার না করে সকলের সাথে শাহী দস্তরখানে প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন।[১০৪]

সম্মিলিতভাবে প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানের পর আমীর পুনরায় প্রতিনিধি দলের প্রত্যেকের সাথে পৃথক পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা করেন। প্রথম দিন তিনি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ এবং প্রফেসর বরকতুল্লাহ্র সাথে এক সাক্ষাতকারে মিলিত হন। এ সাক্ষাতকারে আলোচনা তিন ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ আলোচনায় বিভিন্ন বিষয় বিশেষভাবে অস্থায়ী সরকার গঠন সম্পর্কে স্থান পায়। দ্বিতীয় দিন প্রতিনিধি দলের জার্মান সদস্য ফ্যান বেন্টিং এবং ফ্যান বেন্ডোনীমের সাথে আমীর এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। সদস্যরা আমীরকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, প্রস্তাবিত অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠিত হলে এ সরকারকে জার্মান সরকার সমর্থন ও স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং অর্থ, সৈন্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদ দ্বারা সহায়তা করবে। ব্রিটিশরা আফগানিস্তান আক্রমণ করলে জার্মান ও তুরস্ক সরকার এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে আফগানিস্তানকে সহায়তা করবে এবং ব্রিটিশের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাবে। তৃতীয় দিন তুরস্ক প্রতিনিধি কাসিম বে আমীরের সাথে এক আলোচনায় মিলিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রতিনিধি আফগানিস্তানকে সর্বপ্রকারের সহায়তা করার আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যের সাথে সম্মিলিত ও পৃথকভাবে আলোচনা করার পর আমীর আশ্বস্ত হয়ে আফগানিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে কাযী আবদুর রায্যাককে প্রতিনিধি দলের প্রধান উপদেষ্টা করে দেন। এরপর থেকে বিপ্লবী প্রতিনিধি দলের অধিবেশনে কাযী আবদুর রায্যাক খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হতে থাকে।[১০৫]

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর কাবুলে কূটনৈতিক তৎপরতা:

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর আফগানিস্তান সফরের উদ্দেশ্যে ছিল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য আফগান থেকে নৈতিক সমর্থন ও সামরিক সাহায্য আদায় করা।[১০৬] তাই সিন্ধী ১৯১৫ সালের ১৫ অক্টোবরে কাবুলে পৌঁছে শায়খ ইব্রাহীমের[১০৭] বাসস্থানের পাশে একটি বাড়িতে অবস্থান করতে আরম্ভ করেন। তাঁরই সহায়তায় সেনাপতি মুহাম্মদ নাদির খান এবং সরদার মাহমূদ খান তরযীর সাথে সাক্ষাত করেন। তদুপরি তিনি আফগানিস্তানের শরীঅতের বিচার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কাযী আবদুর রায্যাক-এর সাথে সাক্ষাত করেন। কাযী আবদুর রায্যাক দারুল উলূম দেওবন্দের ডিগ্রি প্রাপ্ত ছিলেন এবং হাদীস অধ্যয়ন করেছিলেন মাওলানা রশীদ আহ্মদ গাঙ্গূহীর নিকট। সিন্ধী বলেন, "কাযী সাহেব পূর্ব থেকেই আমার আগমন সম্পর্কে জানতেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমিই মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী তখন তিনি আনন্দিত হয়ে আমাকে মুবারকবাদ জানান।"[১০৮] সিন্ধী তাঁদের সহায়তায় আফগান সরকারকে তাঁর পরিকল্পনা বিষয়ে সম্মত করার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং আফগান সরকার প্রধানের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করেন। আফগান বাদশাহ আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান-এর পুত্র মু'য়িনুস্ সুলতানাত সর্দার ইনায়াত উল্লাহ খান, নায়িবুস্ সুলতানাত সর্দার নসরুল্লাহ্ খান (আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের ভাই) ও আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নিজের আগমনের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে সাত আট পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে তাঁদেরকে অবগত করেন। এতে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান যথেষ্ট প্রভাবিত হন এবং সিন্ধীর কথাবার্তা ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হন। তিনি সিন্ধীকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাবার নির্দেশ দেন। তবে সিন্ধীকে হিন্দুদের সাথে মিলে-মিশে কাজ করার হুকুম দেন।[১০৯] উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী বলেন, "সে আদেশমতে কাজ করার শুধুমাত্র একটি পন্থাই ছিল। তা হল, 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এ যোগ দেয়া। এরপর থেকে আমি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে কাজ করতে থাকি।[১১০]

ভারত-তুর্কী জার্মান মিশন ১৯১৫ সালের ২ অক্টোবরে কাবুল পৌঁছে ছিল। আর উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ১৫ অক্টোবরে পৌঁছেন।[১১১] আফগানিস্তানের আমীরের সাথে সাক্ষাতের পর উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ভারত-তুর্কী জার্মান মিশনের সাথে যোগাযোগ করেন এবং সিন্ধী মিশনের সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করে বুঝতে পারলেন যে, মিশনের হিন্দু সদস্যগণ ডিক্টেটরশীপ গ্রহণ করে মিশনকে একচেটিয়া তাঁদের আয়ত্বাধীনে রেখেছেন। এরা 'হিন্দু মহাসভা'-এর দর্শনে বিশ্বাসী ছিল।[১১২] মুসলমানগণ নিজেদেরকে সংখ্যালঘু মনে করতেন বিধায় হিন্দুরা সুযোগ পেয়ে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার প্রয়াস পায়।[১১৩] কিন্তু সিন্ধী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে বিভিন্ন সময়ে আলাপ-আলোচনা করে তাঁকে তাঁর ডিক্টেটরশীপ থেকে ফিরাতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১১৪]

অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন:

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী কাবুলে আগত তুর্কী-জার্মান মিশনের সাথে সাক্ষাৎ করেন (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং মিশন ও মিশনের অন্যান্য সাথী-কর্মীদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নের পর সেখানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতা নিজেদের হাতে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিপ্লবী কাউন্সিলের এক অধিবেশন ১৯১৫ সালে ২৯ অক্টোবর বিচারপতি আব্দুর রায্যাক খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সে অধিবেশনে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিহাসে ইহা 'অস্থায়ী ভারত সরকার' নামে খ্যাত। আফগান সরকার 'অস্থায়ী ভারত সরকার'-এর অফিসের জন্য কয়েকটি সরকারি বাসভবন প্রদান করেন। ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর 'অস্থায়ী ভারত সরকার'-এর ঘোষণা দেয়া হয়। এই 'অস্থায়ী ভারত সরকার'-এ ভারতের উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার অধিবাসী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। মহেন্দ্র প্রতাপের উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে জার্মান মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে কাবুলে আগত অধ্যাপক বরকতউল্লাহ্ ভূপালীকে প্রধানমন্ত্রী এবং মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১১৫] উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর অবর্তমানে 'অস্থায়ী ভারত সরকার' পরিচালনা দুরূহ মনে করে তাঁকে এ সরকারের মন্ত্রণালয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সিন্ধী হলফনামা সামান্য সংশোধন করে ভারতমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শুরুতে এ তিন সদস্য বিশিষ্ট সরকারই গঠিত হয়। ক্রমশ এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সদস্যদের মধ্যে মুজাহিদীন দলের প্রতিনিধি মাওলানা বশীরের নাম উল্লেখযোগ্য।[১১৬] ঐ সরকারে কয়েকজন জার্মান ও তুর্কী মিশনের সদস্যও ছিলেন।[১১৭] রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ নিজেই অস্থায়ী সরকারের আইন রচনা করেছিলেন। উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারিতে লাহোরের বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত ১৫ জন বিপ্লবী মুসলিম ছাত্র ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পার হয়ে প্রথমে স্বাধীন সীমান্ত এলাকায় চলে যান এবং সেখান থেকে কাবুলে উপনীত হন। তখন ভারতের সীমান্তগুলো বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত কঠোরভাবে সংরক্ষিত ছিল। তা সত্ত্বেও দেশত্যাগী ছাত্ররা সীমান্ত পার হতে পেরেছিলেন। উল্লিখিত ১৫ ছাত্রকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'পলাতক ছাত্র' বা 'মুজাহিদ ছাত্র' বা 'দেশত্যাগী ছাত্র' আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১১৮] তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, ভারত সীমান্তে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হামলা করা। তা সম্ভব না হলে তুরস্কে গিয়ে তুরস্কের পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করা।[১১৯] দেশত্যাগী এ ছাত্ররা হলেন- লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের স্নাতকোত্তর শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী আবদুল বারী, শায়খ আব্দুল কাদির এবং স্নাতকের শিক্ষার্থী আব্দুল মজীদ খান, আল্লাহ্ নেওয়ায খান, শায়খ আবদুল্লাহ্, আবদুর রশীদ, গোলাম হাসান, যাফর হাসান আয়বেক এবং লাহোর চীফ কলেজের স্নাতকের বিদ্যার্থী আব্দুল খালিক, লাহোর ইসলামিয়া কলেজের স্নাতকের ছাত্র মুহাম্মদ হাসান এবং মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র খুশী মুহাম্মদ, আব্দুল

Dhaka University Institutional Repository

মজীদ, রহমত আলী, শুজাউল্লাহ এবং শাহনাওয়ায খান প্রমুখ।[১২০] এঁদের দেশত্যাগের ব্যবস্থা করেছিলেন শায়খ আব্দুর রহীম সিন্ধী। কিন্তু তারা বিষয়টি জানত না।[১২১]

তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, জার্মান-তুর্কী মিশনের সদস্য ও ভারতীয় দলের সদস্যগণের মধ্যে 'অস্থায়ী ভারত সরকার' প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মিশনের কর্মসূচি নিয়ে জার্মান সদস্যদের সাথে ভারতীয় সদস্যদের মতানৈক্য ঘটে। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ঐ মতানৈক্য দূর করার চেষ্টা করেন। এ মতানৈক্যের মূল কারণ ছিল হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ছিলেন ঘোর সাম্প্রদায়িকতাবাদী।[১২২] তিনি মনে করতেন, ভারতবর্ষে হিন্দুদের প্রধান্য ও সংখ্যা গরিষ্ঠতা রয়েছে। সুতরাং মিশনে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার রয়েছে তাদেরই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলমান প্রতিনিধিগণ সে প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন নি। সিন্ধী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের উপর প্রভাব বিস্তার করতে এবং তাঁকে সদলে আনতে সক্ষম হন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সাথে একটি সমঝোতায় উপনীত হন এবং তাকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করাতে বাধ্য করেন। সিন্ধী জার্মান মিশন ও ভারতীয়দের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করে আফগান আমীরের সামনে যুক্তিযুক্ত কর্মসূচি পেশ করেন এবং ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করার জন্য আবেদন জানান।[১২৩] কিন্তু আফগান বাদশাহ্ হাবীবুল্লাহ তাঁদের এ মতানৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করেন। সে সুযোগে 'অস্থায়ী ভারত সরকার' ও মিশনের অনেক আবেদন কৌশলে এড়িয়ে যান। যেমন: তুর্কী-জার্মান মিশন আফগান সরকারকে রাশিয়ার জার সম্রাট ও ব্রিটিশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মিশনকে সামরিক সাহায্য করার এবং ব্রিটিশ ভারতে আক্রমণ করার প্রস্তাব জানিয়ে স্বর্ণের পাতে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে অস্থায়ী ভারত সরকারের পক্ষ থেকে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ স্বাক্ষর করেন; কিন্তু আফগান সরকারের পক্ষে বাদশাহ্ হাবীবুল্লাহ খান স্বাক্ষর করা থেকে এই বলে বিরত থাকেন যে, ''ব্রিটিশ ভারতের উপর আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে আক্রমণ করার প্রস্তাব কার্যকর করতে হলে ভারতীয় উচ্চ পদস্ত রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সন্ধির প্রয়োজন। আর সে জন্য মাওলানা মুহম্মদ আলী ও মতিলাল নেহেরুর ন্যায় প্রথম সারির নেতাদের আফগানিস্তানে আসার প্রয়োজন।" তুর্কী-জার্মান মিশন ও ভারতীয় প্রতিনিধিগণ আমীর হাবীবুল্লাহ খানকে সে ধরনের আশ্বাস দিতে ব্যর্থ হলে তাদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। মোটকথা, মিশনের প্রতিনিধিগণের মতানৈক্য ও দ্বন্দ্বকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে আমীর হাবীবুল্লাহ একটি রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করেন।[১২৪] আমীর হাবীবুল্লাহ সিন্ধী ও তাঁর সহকর্মীগণকে যথেষ্ট সুযোগ দান করলেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।[১২৫] যেহেতু আমীর হাবীবুল্লাহ ছিলেন ব্রিটিশ অনুগত; বরং ব্রিটিশ আশ্রিত, এমনকি আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি ছিল ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত। ব্রিটিশের পরামর্শ ব্যতীত তাঁর নড়বার সাধ্য ছিল না। তাই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে ইতস্ততা দেখালেন। অপরদিকে মিশনকে সন্তুষ্ট রাখারও চেষ্টা করতেন।[১২৬] আফগানিস্তানে তখন চলছিল উভয় সংকট। একদিকে ব্রিটিশ এবং রাশিয়ার চেষ্টা ছিল আফগানদেরকে নিরপেক্ষ রাখা; অন্যদিকে তাদের শত্রুদের চেষ্টা ছিল আফগানদেরকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা।[১২৭]

লাহোর থেকে আগত ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কে গমন করে তুর্কীদের সহায়তায় মিত্রশক্তি বিরোধী যুদ্ধে যোগদান করা। তাঁরা কাবুল থেকে তুরস্কে গমন করার চেষ্টা করলে

Dhaka University Institutional Repository

আফগান সরকার তাঁদেরকে গ্রেফতার করে নজরবন্দী করে রাখেন। সিন্ধী নায়িবুস সুলতান সরদার নাসরুল্লাহ্ খানের সাথে দেখা করে তাঁদেরকে মুক্ত করেন। সিন্ধী তাঁদেরকে কাবুলে অবস্থান করে ব্রিটিশ-ভারত মুক্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলে তাঁরা তুরস্ক গমন বাতিল করে দেন। কিছুদিন পর পেশোয়ার থেকেও কতিপয় নওজোয়ান[১২৮] কাবুলে পৌঁছলে তাঁদের সাথে *লাহোরী দলের ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ হয়। অপরদিকে বেকারত্ব উভয়দলের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্বের* সৃষ্টি করে। সিন্ধী এ সব লক্ষ্য করে তাঁদের মধ্যে মীমাংসা করে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির সভাপতি নিয়োগ করেন আবদুল বারীকে। তিনি তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থাও করে দেন। তিনি এঁদের মধ্য থেকে শায়খ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, মওলবী মুহাম্মদ আলী কাসূরীর ন্যায় বিশেষ কয়েকজন কলেজ শিক্ষার্থীকে ভিন্ন করে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয় শিক্ষা দেন।[১২৯] অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে সেক্রেটারী এবং বিভিন্ন পদে লাহোরী এবং পেশোয়ারী ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৩০]

জুনুদুল্লাহ (আল্লাহর বাহিনী) নামক মুক্তিফৌজ গঠন:

সিন্ধী আফগানিস্তানে অবস্থান করেই সুযোগমত ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নিলেন। মুজাহিদ ছাত্ররাও তুরস্কে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করেন। এর কিছুদিন পর আরো কিছু নওজোয়ান পেশওয়ার থেকে কাবুলে পৌঁছেন।

সিন্ধী তাঁর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এদের সবাইকে নিয়ে এবং ইতোমধ্যে কাবুলে আগত শায়খুল হিন্দের উল্লেখযোগ্য দু'জন সহযোদ্ধা – মাওলানা মনসূর আনসারী ও মাওলানা সাইফুর রহমান[১৩১] এবং মুজাহিদীন দলের নেতা মাওলানা মুহাম্মদ বশীরের পরামর্শক্রমে সিন্ধী কাবুলে অবস্থানকালে জুনূদুল্লাহ নামক একটি মুক্তিফৌজ গঠন করেন। এতে লাহোর থেকে আগত নওজোয়ানরাও অংশগ্রহণ করেছিল।[১৩২] এ মুক্তিফৌজে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের বিবরণ হল:

ক) পেট্রোন:

(১) চীফ জেনারেল খলীফাতুল মুসলিমীন।

(২) সুলতান আহ্মদ শাহ্ কাচার, ইরান।

(৩) আমীর হাবীবুল্লাহ খান, কাবুল।

খ) ফিল্ড মার্শাল:

(১) আনওয়ার পাশা

(২) দওলতে উসমানিয়ার যুবরাজ

(৩) দওলতে উসমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী

(৪) আব্বাস হিলমী পাশা

(৫) শরীফ মক্কা মুকাররমা

Dhaka University Institutional Repository

(৬) নায়িবুস সালতানাত সরদার নাসরুল্লাহ্ খান, কাবুল

(৭) মুঈনুস্ সালতানাত সরদার ইনায়াতুল্লাহ্ খান, কাবুল

(৮) নিযাম, হায়াদারাবাদ

(৯) ওয়ালী, ভূপাল

(১০) নবাব, রামপুর

(১১) নিযাম, ভাওয়ালপুর

(১২) রঈসুল মুজাহিদীন

গ) জেনারেল:

(১) সুলতানুল মু'আযযম মওলানা মাহমূদ হাসান মুহাদ্দিস দেওবন্দী

(২) কাবুল জেনারেলের স্থলাভিষিক্ত উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী

ঘ) ল্যাফটেনেন্ট জেনারেল:

(১) মওলানা মুহয়িদ্দীন খান

(২) মওলানা আব্দুর রাহীম

(৩) মওলানা গোলাম মুহাম্মদ, ভাওয়ালপুর

(৪) মওলানা তাজ মুহাম্মদ সিন্ধী

(৫) মওলবী হুমায়ন আহমদ মদন

(৬) মওলবী হামদুল্লাহ হাজী সাহেব, তুরঙ্গাযয়ী

(৭) ডাক্তার মুখতার আহমদ আনসারী

(৮) হাকীম আবদুর রায্যাক

(৯) মুল্লা সাহেব বাব্‌রা

(১০) কূহিস্‌তানী

(১১) জ্যান স্যাহেব, ব্যাজুর্য

(১২) মওলবী ইব্‌রাহীম

(১৩) মওলবী মুহাম্মদ মিঁয়া

(১৪) হাজী সাঈদ আহ্‌মদ

(১৫) শায়খ আবদুল আযীয সদেশ

Dhaka University Institutional Repository

(১৬) মওলবী আবদুল করীম রঈসুল মুজাহিদীন

(১৭) মওলবী আবদুল আযীয রহীম আবাদী

(১৮) ওমলবী আব্দুর রহীম আযীয আবাদী

(১৯) মওলবী আবদুল্লাহ্ গাযীপুরী

(২০) নবাব যমীরুদ্দীন আহ্মদ

(২১) মওলবী আবদুল বারী

(২২) আবুল কালাম

(২৩) মুহাম্মদ আলী

(২৪) শওকত আলী

(২৫) যাফর আলী

(২৬) হাসরাত মূহানী

(২৭) মওলবী আবদুল কাদির কাসূরী

(২৮) মওলবী বরকতুল্লাহ্ ভূপালী

(২৯) পীর আসাদুল্লাহ্ শাহ্ সিন্ধী

ঙ) মেজর জেনারেল:

(১) মওলবী সায়ফুর রহমান

(২) মওলবী মুহাম্মদ হাসান মুরাদাবাদী

(৩) মওলবী আব্দুল্লাহ আনসারী

(৪) মীর সিরাজুদ্দীন বাহাওয়ালপুরী

(৫) পাচা মুল্লা আবদুল খালিক

(৬) মওলবী বশীর, র'ঈসুল মুজাহিদীন

(৭) শায়খ ইব্রাহীম সিন্ধী

(৮) মওলবী মুহাম্মদ আলী কাসূরী

(৯) সায়্যিদ সুলায়মান নদবী

(১০) ইম্যদী গোলাম হুসায়ন আয্যাদ সুবহানী

(১১) কাযিম বে

Dhaka University Institutional Repository

(১২) খুশী মুহাম্মদ

(১৩) মওলবী আব্দুল বারী, অস্থায়ী ভারত সরকারের মুজাহির ওকীল

চ) কর্নেল:

(১) শায়খ আবদুল কাদির মুহাজিদ

(২) সুজাউল্লাহ্ মুহাজির, অস্থায়ী ভারত সরকারের নায়িবে ওকীল

(৩) মওলবী আব্দুল আযীয, ইয়াগিস্তানের হিযবুল্লাহ্-এর দূতের ওকীল।

(৪) মওলবী ফযলে রব্বী

(৫) মিয়াঁ ফযলুল্লাহ্

(৬) মদরুদ্দীন

(৭) মওলবী আবদুল্লাহ্ সিন্ধী

(৮) মওলবী আবূ মুহাম্মদ আহম্মদ লাহেরী

(৯) মওলবী আহম্মদ আলী, সহকারী সম্পাদক নিযারাতুল মা'আরিফ

(১০) শায়খ আব্দুর রহীম সিন্ধী

(১১) মওলবী মুহাম্মদ সাদিক সিন্ধী

(১২) মওলবী ওলী মুহাম্মদ

(১৩) মওলবী উযায়রগুল

(১৪) খাজা আব্দুল হাই

(১৫) কাযী যিয়াউদ্দীন, (এম.এ)

(১৬) মওলবী ইব্রাহীম সিয়ালকোটী

(১৭) আব্দুর রশীদ (বি. এ)

(১৮) মওলবী যহূর মুহাম্মদ

(১৯) মওলবী মুহাম্মদ মুবীন

(২০) মওলবী মুহাম্মদ ইউসুফ গাঙ্গূহী

(২১) মওলবী রশীদ আহম্মদ আনসারী

(২২) মওলবী সায়্যিদ আব্দুস সালাম ফারুকী

(২৩) হাজী আহম্মদ জান সাহারানপুরী

Dhaka University Institutional Repository

ছ) ল্যাফ্‌টেনেন্ট কর্নেল:

(১) ফযল মাহ্‌মূদ

(২) মুহাম্মদ হাসান (বি. এ) মুহাজির

(৩) শায়খ আব্দুল্লাহ্ (বি. এ) মুহাজির

(৪) যাফর হাসান (বি. এ) মুহাজির

(৫) আল্লাহ্ নাওয়াজ খান (বি. এ) মুহাজির

(৬) রহ্‌মত আলী (বি. এ) মুহাজির

(৭) আব্দুল হামীদ (বি. এ) মুহাজির

(৮) হাজ্জী শাহ বখ্‌শ সিন্ধী

(৯) মওলবী আব্দুল ক্বাদির দীনপুরী

(১০) মওলবী গোলাম নবী

(১১) মুহাম্মদ আলী সিন্ধী

(১২) হাবীবুল্লাহ্

জ) মেজর:

(১) শাহ্ নাওয়ায

(২) আব্দুর রহমান

(৩) আব্দুল হক

ঝ) ক্যাপ্টেন:

(১) মুহাম্মদ সলীম

(২) করীম বখ্‌শ্

ঞ) ল্যাফ্‌টেনেন্ট:

(১) নাদির শাহ্ [১০০]

অস্থায়ী ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দেশে মিশন প্রেরণ:

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী কাবুলে অবস্থান করে সাংগঠনিক দক্ষতা ও কূটনৈতিক তৎপরতা দ্বারা ব্রিটিশ ভারতে আক্রমণ বিষয়ে আফগান সরকারের নৈতিক সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন। সিন্ধী

Dhaka University Institutional Repository

নিজে ও রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের পরামর্শক্রমে কাবুলস্থ নতুন 'অস্থায়ী ভারত সরকার' সর্বপ্রথম আমীর নসরুল্লাহ্ খানের অনুমতি নিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে সামনে রেখে বিদেশে তিনটি মিশন প্রেরণ করেন।[১০৪]

ক) রাশিয়া মিশন:

প্রথম মিশনটি প্রেরিত হয় রাশিয়ায়। রাজা মহেন্দ্র রাশিয়ার মিশনে ড. মথুরা সিংকে পাঠাবার প্রস্তাব করেন। প্রফেসর বরকতুল্লাহ্ এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে, সিন্ধী মিশনে মথুরা সিংকে একা পাঠাতে রাজি হন নি; বরং তিনি প্রস্তাব রাখেন যে, ড. মথুরা সিং এর সাথে একজন নওজোয়ান মুসলমানও থাকবে। রাজা মহেন্দ্র এ প্রস্তাব সমর্থন করেন নি বরং উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ বেড়ে যায়। পরে এর মীমাংসা করেন সরদার নাসরুল্লাহ খান। সরদার নাসরুল্লাহ খান উভয়ের বক্তব্য শুনার পর সিন্ধীর প্রস্তাব সমর্থন করেন। লাহোরী নওজোয়ানদের মধ্য থেকে খুশী মুহাম্মদের নাম মির্যা মুহাম্মদ আলী রেখে তাঁকে রাশিয়ান মিশনের প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাজা মহেন্দ্র শুধু মথুরা সিংহের ব্যয় বহন করেন। সিন্ধী নিঃসম্বল অবস্থায় ছিলেন বলে মির্যা মুহাম্মদ আলীর পথখরচ হাবীবিয়া কলেজের অধ্যাপক মওলবী মুহাম্মদ আলী কাসূরী প্রদান করেন। এদের দু'জনের প্রত্যেকের সাথেই একজন করে পরিচারিকাও দেয়া হয়। মথুরা সিংহের পরিচারিকা ছিল একজন কাবুলী শিখ এবং মির্যা মুহাম্মদ আলীর পরিচারিকা ছিল একজন আফগানী মুসলমান।[১০৫] এ মিশন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্চে রাশিয়া যাবার উদ্দেশ্যে তাসখন্দ রওয়ানা হয়। অস্থায়ী সরকার প্রেসিডেন্ট রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ মিশনকে একটি স্বর্ণের সিংহাসন প্রদান করেন। সিংহাসনে রুশ জার শাসনামলের প্রশংসা ও গুণকীর্তন খোদাই ছিল।[১০৬]

মিশন তাসখন্দে পৌঁছে গভর্নরের সাথে সাক্ষাত করেন এবং রাশিয়ার জার–এর কাছে অস্থায়ী সরকারের প্রেরিত পত্র প্রদান করেন। এ পত্রে অস্থায়ী ভারত সরকারের পূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং সে দেশের সরকারের নিকট এ অস্থায়ী সরকারকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানানো হয়। এছাড়া আর একটি পত্র ছিল তাসখন্দের গভর্নর সমীপে। এ পত্রে মিশনের প্রতিনিধিদ্বয়কে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।[১০৭]

রুশ সরকার ঐ মিশনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। মিশন রাশিয়ার জার সরকারকে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু রাশিয়ার জার সরকার তখন নিজেই বিপন্ন। তাই মিশনকে সামনে রেখে রুশ সরকার ব্রিটিশকে চাপ দিতে থাকল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে হামলা হবার আশংকা আছে, এ ভয় দেখিয়ে রাশিয়ার জার সরকারকে উল্টো ভীত করে তুলে এবং রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করে। এতে জার সরকার ভীত হয়ে মিশনকে গ্রেফতার করার হুকুম দিল এবং ইংরেজ সরকারের নিকট থেকে বিশেষ স্বার্থ উদ্ধার নিমিত্ত মিশনকে ইংরেজদের হাতে সোপর্দ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ সরকার বিষয়টিকে জারের দুষ্টুবুদ্ধির আবিষ্কার বলে ধরে নিল।[১০৮]

অবশ্য তাসখন্দ সরকারের হস্তক্ষেপেই ঐ মিশন রক্ষা পায়। চার মাস পর মিশনটি নিরাপদে কাবুলে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। ঐ প্রতিনিধিদল রাশিয়ায় গমনের ফলে আফগান

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের আশংকা অনেকটা প্রশমিত হয়। ঐ মিশন তাদের উদ্দেশ্য পূরণে যদিও পুরোপুরি সফল হতে পারে নি; কিন্তু কিছুটা হলেও সফল হয়।[১৩৯] মোটকথা, এ মিশন প্রেরণের ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কের মধ্যে অবনতি ঘটে এবং রাশিয়া-ব্রিটিশ ঐক্যে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়। ঐক্যের এ ফাটল নিরসনের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃক লর্ড কাচনারকে রাশিয়ায় পাঠানো হয়।[১৪০]

মিশনটি রাশিয়া থেকে কাবুলে ফেরত আসলে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ মথুরা সিংকে সরদার নাসরুল্লাহ্ খানের নিকট নিয়ে আসেন। তিনি মিশনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ জানতে চাইলে উত্তরে মথুরা সিং বলেন, "আমরা মঙ্গালমতেই তথায় পৌঁছি এবং মঙ্গালমতেই ফিরে আসি। আমাদের কোন অসুবিধাই হয় নি।" মথুরা সিং এর উত্তরে সরদার নাসরুল্লাহ্ খান সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। অতঃপর উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে সংবাদ দিয়ে মিশনের সদস্য মির্যা মুহাম্মদ আলীকে তলব করেন। তিনি মিশনে যাত্রার পর থেকে কাবুল ফেরত আসা পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এ লিপিবদ্ধ তথ্য তিনি তাঁকে পেশ করলে এসে সরদার নাসরুল্লাহ্ খান আত্মতৃপ্তি লাভ করে সন্তুষ্ট হন।[১৪১]

খ) ইস্তাম্বুল ও জাপানে মিশন প্রেরণঃ

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী পরামর্শক্রমে আরো দু'টি মিশন জাপান এবং ইস্তাম্বুলের জন্য প্রস্তুত করেন। ইস্তাম্বুলের মিশনে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর সহকর্মী আব্দুল বারী বি. এ ও শুজাউল্লাহ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এদের ইরান হয়ে ইস্তাম্বুল যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর জাপানের মিশনে জনাব আব্দুল কাদির বি. এ এবং ড. মথুরা সিং অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ মিশনটি অধ্যাপক বরকত উল্লাহর প্রস্তাব অনুযায়ী রাশিয়া হয়ে জাপানে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৪২]

জার্মান ক্যাপ্টেন হিন্টস জার্মানে ফিরে যাওয়ার সময়ে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে তিনশত পাউন্ড প্রদান করেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাবার জন্য রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও প্রফেসর বরকতুল্লাহ্কে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী একশত পাউন্ড প্রদান করেন। এক রাতে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর বাসস্থান থেকে ডাকাতরা দু'শত পাউন্ডসহ অন্যান্য অনেক সামগ্রী ডাকাতি করে নিয়ে যান। এতে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী নিঃসম্বল হয়ে পড়েন। মুজাহিদীন দলের নেতা মাওলানা বশীর থেকে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী একশত পাউন্ড ঋণ নিয়ে ইস্তাম্বুলগামী মিশনকে প্রদান করেন। অপরদিকে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী সরদার নাসরুল্লাহ্ খানকে ডাকাতি হওয়ার সংবাদ জানিয়ে তাঁর নিকট থেকে একশত পাউন্ড গ্রহণ করেন। সিন্ধী এই একশত পাউন্ড জাপানগামী মিশনকে প্রদান করলে[১৪৩] আমীর নসরুল্লাহ্ খানের অনুমতি নিয়ে মিশন দু'টি নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু জাপান গমনেচ্ছু প্রতিনিধি দলকে রুশ সরকার তাদের সীমান্তে পৌঁছা মাত্রই গ্রেফতার করে ব্রিটিশের হাতে সমর্পণ করে। মিশনকে কিছুদিন নজরবন্দী করে রাখার পর ছেড়ে দেয়।[১৪৪] অপরদিকে ইস্তাম্বুলগামী মিশন ইরানে সরাসরি ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হয়। ঐ মিশনের প্রতিনিধি ড. মথুরা সিং ব্রিটিশ ভারতে বোমা ফেলার কেসের পলাতক আসামী ছিলেন। এ কেসে তাঁকে ফাঁসির রায় দেয়া হয়েছিল। গ্রেফতারের পর তাঁর ফাঁসি কার্যকর হয়। শায়খ আব্দুল কাদির প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত নজরবন্দী ছিলেন।[১৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেফতারকৃত প্রতিনিধিগণের জবানবন্দির মাধ্যমে তাদের আন্দোলনের কর্মসূচি ও নীলনকশা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার অবগত হয়।[১৪৬] ইতোমধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য মাহমূদ আনসারী, ফতেহ মুহাম্মদ, মুহাম্মদ আলী প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবীনেতাগণ কাবুল ত্যাগ করে ভারতের পথে রওয়ানা হয়েছিলেন, তাঁরাও সীমান্তে ইংরেজ সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন। *বিচারে তাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি বিধায় তাঁরা খালাস পান। তবে* ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশন অনুসারে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।[১৪৭] উল্লেখ্য, আফগান সরকারের বৈদেশিক নীতি ছিল ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত এবং আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের তাবেদার। তাই ব্রিটিশ সরকার এসব বিষয়ে অবগত হবার পর চুপ থাকে নি; বরং আফগান সরকারের নিকট এর প্রতিবাদ জানায়, সাথে সাথে ভারতীয় রাজনীতিবিদগণকে আফগানিস্তান থেকে বহিষ্কার করার জন্য আফগান সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। এ অপরাধে অনেকের চাকুরি চলে যায়। মৌলবী মুহাম্মদ আলী এবং শেখ ইব্রাহীম যথাক্রমে কাবুলের হাবিবীয়া কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রফেসর ছিলেন, তারা দু'জনই চাকুরীচ্যুত হন এবং শায়খুল হিন্দের আন্দোলনের সাথে শরীক থাকার অপরাধে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নির্বাসিত হন। পরবর্তীতে তাঁদেরকে দেশে ফেরার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।[১৪৮]

ঐতিহাসিক রেশমী রুমাল আন্দোলন:

শায়খুলহিন্দ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে হেযায পৌঁছেন।[১৪৯] হেযায ছিল তুরস্ক শাসিত। এ জন্য তুর্কীরাই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মক্কার গভর্নর ছিলেন গালিব পাশা। তিনি হেযাযেই বাস করতেন। মক্কার গভর্নর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকলেও তাঁকে তুরস্ক সরকার সমগ্র হেযাযের কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। মদীনার গভর্নর ছিলেন তাঁরই অধীনস্থ।[১৫০] শায়খুলহিন্দ মক্কায় পৌঁছেই ভারতীয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হাফিয আবদুল জব্বারের সাথে সাক্ষাত করেন।[১৫১] হাফিজ আব্দুল জব্বার মক্কাতে একজন সৎ ব্যবসায়ী, আমানতদার, দ্বীনদার ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিশেষ মর্যাদা ও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। এমনকি মক্কার প্রশাসনের লোকেরাও তাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। যা মক্কার অনেক কম লোকের ভাগ্যে জুটেছে।[১৫২] তিনি তাঁকে হিজাযের গভর্নর গালিব পাশার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানান। হাফিজ আবদুল জব্বার তাঁর এক নির্ভরযোগ্য নওজোয়ান দোভাষীর মাধ্যমে গভর্নর গালিব পাশার সাথে শায়খুলহিন্দের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। তাঁরা দু'জনে এক সৌহার্দ্রপূর্ণ আলোচনা সভায় মিলিত হন এবং তিনি তাঁর বক্তব্য গভীর মনোযোগসহ শুনেন। প্রথম দিনের আলোচনা শেষে গভর্নর পরদিন তাঁকে তাঁর সাথে সাক্ষাতকারে মিলিত হওয়ার পরামর্শ দেন।[১৫৩] গালিব পাশা পূর্বেই বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র বিশেষ করে ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীগণের মাধ্যমে শয়খুলহিন্দের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁর মর্যাদা ও খ্যাতি রয়েছে এবং ইলমী ও আমলী জগতের শিরোমনি হিসেবে তাঁর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলে তিনি জানতে পারেন।[১৫৪] পরদিন শায়খুলহিন্দ নির্দিষ্ট সময়ে গভর্নরের দরবারে পৌঁছলে তিনি তাঁকে অত্যন্ত সম্মান দেখান। তিনি তাঁর নিকট বিপ্লবী পরিকল্পনা ও আযাদী মিশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। গালিব পাশা একান্ত আন্তরিকতার সাথে তা সমর্থন করে তুর্কী সরকারের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকারের সাহায্য ও সহানুভূতির

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি তাঁকে য়্যাগিস্তানের আযাদ মিশন কেন্দ্রে প্রত্যাগমন করে এ আন্দোলনকে আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন।[১৫৫]

গালিব পাশা তাঁকে ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করার পরামর্শদেন। যে পরামর্শ উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকেও কাবুলের আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান দিয়েছিলেন। তবে বিষয়টির গুরুত্ব শায়খুলহিন্দ আগে থেকেই অনুভব করেছিলেন।[১৫৬] গালিব পাশার এ পরামর্শ তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ বহন করে। কারণ উসমানীয় খিলাফতে তুর্কী, ঈসায়ী, ইহুদী, আরমানী ইত্যাদি জাতিকে পৃথক পৃথক জাতি মনে করা হত। এদেরকে সম্মিলিত শক্তি মনে করা হত না। তাই দেখা গেছে, ইউরোপের নতুন নতুন শক্তিগুলো এদেরকে ব্যবহার করে ফায়দা উঠিয়েছে।[১৫৭] এরই পরিপ্রেক্ষিতে শায়খুলহিন্দ তুর্কী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি আনওয়ার পাশার[১৫৮] সাথে সাক্ষাত করার অভিপ্রায় জানান। আনওয়ার পাশা তখন ইস্তাম্বুল অবস্থান করছিলেন। গালিব পাশা শায়খুলহিন্দের একান্ত ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জানতে পেরে ইস্তাম্বুলে তাঁকে আনওয়ার পাশার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য মদীনার গভর্নর বসরী পাশাকে লিখিত নির্দেশ দেন। তদুপরি শায়খুলহিন্দের আযাদ মিশন ও বিপ্লবী আন্দোলনকে সফল করার লক্ষ্যে সর্বপ্রকারের সাহায্য ও সহানুভূতির অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্রও দেন।[১৫৯] শায়খুলহিন্দ হেযাযের গভর্নর গালিব পাশার নিকট থেকে দু'টি পত্র ভারতবাসীর নামে লিখিয়ে নেন। এর একটিতে ছিল শায়খুল হিন্দকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করা ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আহ্বান।[১৬০] ইতিহাসে একে 'গালিবনামা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উক্ত পত্রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনে জীবন দিয়ে লড়তে উপদেশ দেয়া হয়।[১৬১]

গালিবনামা:

গালিব পাশা উপমহাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে শায়খুলহিন্দের নিকট নিজ স্বাক্ষরযুক্ত যে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হচ্ছে 'গালিবনামা'।[১৬১ক] রাওল্যাট কমিটির রিপোর্ট থেকে গালিবনামার অবিকল উদ্ধৃতি দেয়া হল: "হে ভারতবাসী! এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মুসলমানগণ সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে তুর্কী সেনাবাহিনী এবং মুজাহিদীন সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং হে মুসলমানগণ। তেমরা যে ইংরেজ শক্তির লৌহজালে আবদ্ধ রয়েছ, সংঘবদ্ধভাবে একে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার সর্বপ্রকার চেষ্টা ও সামর্থ নিয়ে পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে আস। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক মাওলানা মাহমূদ হাসান আফিন্দীর সাথে ঐকমত্য হয়ে তাঁকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছি। ধন-জন ও সর্ববিধ সামগ্রী দিয়ে তাঁর সহযোগিতা কর। এতে বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করো না।"[১৬২]

এ 'গালিবনামা' পত্রটি দেয়া হয়েছিল আফগানিস্তান, সীমান্তের আযাদ এলাকা ও ভারতের অভ্যন্তরে প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাই শায়খুলহিন্দ এ পত্রটি মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসুরকে প্রদান করে প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে পাঠিয়ে দেন। ব্রিটিশ কর্তৃক মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসুর আনসারীকে গ্রেফতার করার আশঙ্কা ছিল। তাই তিনি ভারতে গমন না করে

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতি এলাকা ইয়াগিস্তানে নিরাপদে পৌঁছেন এবং তথায় গালিবনামার প্রচার ব্যাপকভাবে করেন। এরপর কাবুলে মাওলানা সিন্ধীর নিকট পৌঁছে এর ব্যাপক প্রচার প্রসার করেন।[১৬৩] মুক্ত এলাকার উপজাতিদের নিকট থেকে এর একটি কপি গোয়ান্দা সংস্থার মাধ্যমে 'রাওল্যাট কমিটি'- এর হস্তগত হয়।[১৬৪]

আর একটি পত্র শায়খুলহিন্দ গালিব পাশার নিকট থেকে আফগান সরকারের নামে গ্রহণ করেন। এতে ইতোপূর্বে দূত (রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও প্রফেসর বরকতুল্লাহ প্রমুখ) মারফত প্রেরিত 'তুর্কী-আফগান' চুক্তির অনুমোদন ছিল। ঐ চুক্তির মর্ম ছিল- তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারত আক্রমণ করবে। কিন্তু তারা আফগানিস্তানের কোন অংশে হাত দিবেন না; বরং প্রয়োজন হলে আফগান বিরোধী শক্তির সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত থাকবে। এটাকে ইতিহাসে 'গালিব চুক্তিনামা' বলে অভিহিত করা হয়। এ চুক্তিটি আফগানিস্তানে যথাসময়ে পৌঁছে নি। অবশ্য এটি আমীর আমানুল্লাহ্ খানের[১৬৫] আমলে বিপ্লবীদের সাহস বৃদ্ধি করেছিল।[১৬৬]

আনওয়ারনামা:

শায়খুলহিন্দ মদীনায় গমন করে তারই একান্ত ঘনিষ্ঠ ছাত্র ও শিষ্য শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর সাক্ষাৎ পান। তিনি প্রায় তের বছর যাবত মহানবীর (সা:) মসজিদে নববীতে হাদীসের অধ্যাপনায় রত আছেন। মাওলানা হুসাইন আহমদও শায়খুল হিন্দকে বিপ্লবের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। শায়খুলহিন্দ গালিব পাশার পত্র নিয়ে মদীনার তুর্কী গভর্নরের নিকট পেশ করে তাঁকে তুরস্কে পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন জানান। মদীনার গভর্নর বসরীপাশা প্রথমদিকে কতিপয় ভ্রান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে শায়খুল হিন্দকে মদীনাতে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং তাঁর কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করেন। কিন্তু শায়খুল ইসলাম মাদানীর প্রচেষ্টায় এ সব সমস্যার সমাধান হয় এবং কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মদীনাতে কিছু দিন অবস্থান করার পর শায়খুলহিন্দ যখন ইস্তাম্বুল যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন মদীনার গভর্নর তাঁকে জানালেন, এক আকস্মিক সফরে মহানবীর (সাঃ) রওজা জিয়ারতের উদ্দ্যেশ্যে আনোয়ার পাশা মদীনায় আসবেন। তাঁর সাথে তুর্কী সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের সেনাপতি জামাল পাশাও আসবেন। তাই তাঁকে তুরস্কে যেতে হবে না।[১৬৭] যথার্থই কিছুদিনের মধ্যে আনোয়ার পাশা মদীনায় আগমন করেন।

মদীনার আলিম ও বুযুর্গদের মুখ নিঃসৃত বাণী, বক্তৃতা এবং উপদেশ শুনার জন্য আনওয়ার পাশা ও জামাল পাশা আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেমতে মসজিদে নববীতে বিশিষ্ট উলামা ও মাশায়িখের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। বিশিষ্ট কয়েকজন আলিম এ সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শায়খুলহিন্দ ও মাওলানা খলীল আহ্মদ সাহারানপুরীকেও উপদেশ বাণী শুনাবার অনুরোধ করা হয়। এঁদের পক্ষ থেকে মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুক্তি ও প্রমাণাদিসহ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জিহাদের ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা রাখেন। তাঁর আলোচনা যেমন ছিল সময়োপযোগী, তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

ছিল বস্তুনিষ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক। আন্ওয়ার পাশা ও জামাল পাশা সায়্যিদ মদনীর আলোচনা শুনে একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন।[১৬৮] এ সময় শায়খুলহিন্দ আনোয়ার পাশার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাৎ সম্ভব হয়েছিল শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানীর মাধ্যমে। তুর্কী সরকারের উচ্চ পদস্থ সামরিক নেতৃদ্বয় আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার সঙ্গে *শায়খুলহিন্দের গোপনীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে বৈঠকে আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার* সাথে শায়খুল হিন্দ, মাওলানা খলীল আহমদ ও মাওলানা মাদানী অংশগ্রহণ করেন। সে বৈঠকে শায়খুল ইসলাম মাদানী মুসলিম বিশ্বের সমকালীন পরিস্থিতির আলোকে জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখলে জেনারেলদ্বয় মুগ্ধ হন। ঐ বৈঠকে জেনারেলদ্বয় শায়খুল হিন্দকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করবেন বলে জানান।[১৬৯] তাঁদের মধ্যে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিপত্রকে ইতিহাসে 'আনওয়ারনামা' নামে অভিহিত করা হয়।[১৭০]

আনওয়ার পাশা ও জামাল পাশা ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে জরুরী পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান করে সে দিনই স্পেশাল ট্রেনযোগে দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁরা দামেস্কে পৌঁছে তুর্কী, আরবি ও ফারসি ভাষায় তিনটি পত্রে উভয়ের স্বাক্ষরযুক্ত চুক্তিপত্র মদীনার গভর্নর বসীর পাশার মাধ্যমে শায়খুলহিন্দের নিকট প্রেরণ করেন।[১৭১] আরবি, ফারসি ও তুর্কী ভাষায় রচিত তিনটি গোপনচুক্তির মর্ম এক ও অভিন্ন ছিল। পার্থক্য শুধু ভাষাগত।[১৭২]

একটি লিখিত হয়েছিল বিপ্লবী দলের নেতারূপে শায়খুলহিন্দের নামে। এটি ছিল ভারতের বিপ্লবী সরকার ও তুর্কী সরকারের মধ্যে যাকে 'বিপ্লবী তুর্কী চুক্তি' বলা যায়। দ্বিতীয়টি ছিল ভারতবাসীর প্রতি, যাতে শায়খুলহিন্দের সাথে সহযোগিতা করার নির্দেশ ছিল। তৃতীয়টি ছিল তুর্কী ও আফগান সরকারের মধ্যে। এটি ছিল ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধ সম্পর্কিত। এটিকে 'তুরস্ক আফগান চুক্তি' বলা যেতে পারে।[১৭৩] এ পত্রে তুর্কী সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধে তুর্কী *সরকারের পক্ষ থেকে সামরিক সাহায্যের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং শায়খুল হিন্দকে* সাহায্য করার জন্য তুর্কী সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের নির্দেশ দেয়া হয়।[১৭৪]

আনওয়ার পাশার প্রথম পত্রটি সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, শায়খুলহিন্দ মক্কার বিদ্রোহী গভর্নর শরীফ হুসাইন কর্তৃক গ্রেফতার হবার আগ মুহূর্তে (১০ জুন, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ) ধ্বংস করে দেন।[১৭৫] দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রটি মাওলানা হাদী হাসানের মাধ্যমে হেযায থেকে ভারতে পাঠিয়ে দেন।[১৭৬] শায়খুলহিন্দ মক্কায় অবস্থান করেই তুর্কী গোয়েন্দাদের মাধ্যমে জানতে পারেন, তাঁর এবং মাওলানা সিন্ধীর গোপন কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা অবহিত হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজে না এসে বরং চিঠিগুলো পাঠাতে [১৭৭] একজন বিজ্ঞ কারিগরের সাহায্যে কাঠের একটি সিন্দুক তৈরী করেন। সিন্ধুক তৈরীর সময়ে দু'টি কাঠের মাঝে পত্র দু'টি এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে কাঠ দু'টি জোড়া দেয়ার পর জোড়া দেয়া হয়েছে বলে কেউ অনুমানও করতে পারবে না। এরপর এতে কাপড় চোপড় এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী রেখে মুযাফ্ফর নগর জেলার খানজাহানপুর এলাকার নেতা মাওলানা হাদী হাসান[১৭৮] ও সিন্ধু হায়দারবাদের হাজী শাহ বখশ মারফত বাক্সটি পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, তারা যেন গন্তব্যস্থানে

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছে উক্ত চুক্তিনামার কপিগুলো বের করে মুযাফ্ফর নগর জেলার অধিবাসী হাজী নূর হাসানের নিকট দিয়ে বলেন, তিনি যেন আহমদ মির্জা নামক ফটোগ্রাফার থেকে উক্ত তুর্কী সামরিক চুক্তিনামার কাগজগুলো ফটোকপি করে নির্দেশিত স্থানে বিলি করেন।[১৭৯]

জেদ্দা বন্দরে সি. আই. ডি. পুলিশ শায়খুলহিন্দকে দেখতে পেয়ে ধারণা করেন যে, ভারতগামী স্টিমারে আরোহণ করে তিনি ভারতে গমন করছেন। তাই তারা এ সংবাদ বোম্বে পুলিশকে জানিয়ে দেন।[১৮০] সিন্দুকটি নিয়ে জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছামাত্রই জাহাজে শায়খুলহিন্দ এসেছেন মনে করে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা জাহাজে আছড়ে পড়ে ও শায়খুলহিন্দকে খুঁজতে থাকে। জাহাজে শায়খুলহিন্দের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি মাওলানা হাদী হাসানকে সন্তর্পণে বলেন, "গোপনীয় কিছু নিয়ে এসে থাকলে আমাকে দিয়ে দিন, আমি পার করে দেই।" মাওলানা হাদী হাসান বাক্সটি তার হাতে সমর্পণ করেন। গোয়েন্দা পুলিশ যখন শায়খুলহিন্দকে তল্লাশীতে ব্যস্ত তখন শায়খুলহিন্দের উক্ত ভক্তটি তার অন্যান্য মালের সাথে ঐ সিন্দুকটি পার্সেল করে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন।[১৮১]

এদিকে পুলিশ শায়খুলহিন্দকে স্টিমারে না পেয়ে তাঁর সহচরবৃন্দের নিকট তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মাওলানা খলীল আহ্মদ সাহারানপুরীকে আট-দশ দিন আবদ্ধ রেখে শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু তিনি তাঁর সম্পর্কে কোন তথ্যই প্রদান করেন নি। অপরদিকে পুলিশ মাওলানা হাদী হাসানকে গ্রেফতার করে নয়নিতলি জেলে বন্দি করে রাখে। তারা তাঁকে শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করে এবং নির্যাতন চালায়। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। মাওলানা মুহাম্মদ নবীকে ইতোপূর্বে যে কোন পন্থায় শায়খুলহিন্দ সিন্দুকে রক্ষিত পত্রসমূহ বের করে হাজী নরুল হাসানের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।[১৮২]

এ ঘটনার দেড় মাস পর গোয়েন্দা পুলিশ সামরিক চুক্তির কথা জানতে পারে[১৮৩] যে, শায়খুলহিন্দ কর্তৃক প্রেরিত গুরুত্বপূর্ণ পত্রসমূহ মাওলানা মুহাম্মদ নবীর নিকট সিন্দুকে সংরক্ষিত আছে। মাওলানা মুহাম্মদ নবী সিন্দুক খুলে যে সময়ে পত্রগুলো বের করছিলেন ঠিক ঐ মুহূর্তে পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে তাঁর বাড়িতে হানা দেয়। তিনি পুলিশকে দেখে তৎক্ষনাৎ পত্রগুলো হাতে মোচড়িয়ে সদরিয়া কোটের পকেটে রেখে খুঁটির সঙ্গে সদরিয়াটি ঝুলিয়ে দেন। পুলিশ সকাল দশটা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত গৃহের সকল সামগ্রী তছনছ করে ফেলে। কিন্তু অনুসন্ধান করে কোন কিছুই তারা পায় নি। অথচ সদরিয়াটি খুঁটিতে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল এবং সদারিয়ার দিকে পুলিশের নজরই পড়ে নি।[১৮৪]

মাওলানা মুহাম্মদ নবী শায়খুলহিন্দের নির্দেশ মতে হাজী নূরুল হাসানের নিকট পত্রগুলো পৌঁছিয়ে দেন। পুলিশ এ সংবাদ জানতে পেরে হাজী নূরুল হাসানের বাড়িতে হানা দেয় এবং তাঁর বাড়ির সকল আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড করে ফেলে। কিন্তু তারা তাঁর বাড়িতে অনুসন্ধান চালিয়ে কিছুই পায় নি। অথচ বাইরে বারান্দায় একটি ছোট জীর্ণ সিন্দুকে শায়খুলহিন্দ কর্তৃক প্রেরিত পত্রগুলো রক্ষিত ছিল। এদিকে পুলিশের মোটেই নজর পড়ে নি।[১৮৫]

Dhaka University Institutional Repository

হাজী নূরুল হাসান পত্রগুলোর ফটোকপি করার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে গমন করেন। হাজী আহমদ মির্যা ফটোগ্রাফারের দোকানের সন্নিকটে পৌঁছে তিনি দেখতে পান যে, পুলিশ ফটোগ্রাফারের দোকানে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। তাই তিনি সেখান থেকে সট্‌কে পড়েন। এক সময়ে তিনি সে দোকানে উপস্থিত হয়ে সংরক্ষিত পত্রগুলোর ফটোকপি করেন। এরপর পুনরায় *হাজী আহ্‌মদ মির্যার দোকানে পুলিশ হানা দিয়ে অনুসন্ধান চালাবার পরও কিছুই পায় নি।* অথচ ঐ রক্ষিত পত্রগুলোর ফটোকপি সে সময়ে একটি টেবিলের নীচে একটি থালায় রাখা ছিল। কিন্তু পুলিশের সে দিকে নজর পড়ে নি। ফলে পুলিশ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।[১৮৬]

পুলিশের এত অনুসন্ধান ও কঠোরতা গ্রহণের পরও হাজী আহ্‌মদ মির্যা লিখিত পত্রসমূহের অনেক ফটোকপি প্রস্তুত করে হাজী নূরুল হাসানকে প্রদান করেন।[১৮৭] হাজী নূরুল হাসান শায়খুল হিন্দের নির্দেশ মতে চুক্তিনামাগুলোর ফটোকপি আন্দোলনের বিভিন্ন কেন্দ্রে পৌঁছাতে সক্ষম হন। অতঃপর শায়খুলহিন্দের পক্ষ থেকে মুযাফ্‌ফর নগর জেলার রাযেড়ী মৌজার অধিবাসী জনাব নূরুল হাসানকে উক্ত ফটোকপিগুলো যেসব নির্দিষ্ট স্থানে বিলিকরার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, সে দায়িত্ব তিনি সঠিকভাবে পালন করেন।[১৮৮]

এই পত্রের উত্তর কাবুলস্থ ভারতীয় নেতৃবর্গ আফগান সরকার থেকে নিয়ে শায়খুল হিন্দের নিকট মদীনায় প্রেরণ করেন।[১৮৯] যে পত্রটি তুর্কী ও আফগান সরকারের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধ সম্পর্কিত চুক্তি ছিল সে পত্রটি মাওলানা মুহাম্মদ নবী তাঁর নিজের নিকটেই রেখে দেন। দেড় মাস জেলে বন্দী থাকার পর মুক্তি পেয়ে মাওলানা সায়্যিদ হাদী হাসান মাওলানা নবীর নিকট থেকে 'তুরস্ক-আফগান চুক্তিনামা'টি গ্রহণ করেন। এরপর তিনি অবয়ব পরিবর্তন করে নিজের নাম যাফর আহ্‌মদ রেখে এ চুক্তিপত্রটি নিয়ে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তথায় পৌঁছে তিনি চুক্তিপত্রটি মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর নিকট হস্তান্তর করেন। অতঃপর সিন্ধী এ চুক্তিপত্রটি আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের নিকট পৌঁছে দেন।[১৯০]

তৃতীয় পত্রটির মর্ম ছিল- আফগান সরকারের অনুমোদন থাকলে ১৯১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তুর্কী বাহিনী আফগান সীমান্তের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ-ভারত আক্রমণ করবে এবং সাথে সাথে ভারতেও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটবে। কথা ছিল- আফগান সরকার কর্তৃক এই চুক্তির অনুমোদনের পর অনুমোদন পত্রটি মদীনায় অবস্থানরত শায়খুলহিন্দের মাধ্যমে তুর্কী সরকারের হাতে পৌঁছাতে হবে। অনুরূপভাবে শায়খুলহিন্দের মাধ্যমে তুর্কী সরকারের যুদ্ধের নির্দেশটি পুনরায় ১৯১৭ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে কাবুলের সদর দফতরে পৌঁছাতে হবে। আবার কাবুলের সদর দফতর ঐ সংবাদটি দিল্লীর সদর দফতরকে পৌঁছাবে ১৯১৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এর পরেই ১ ফেব্রুয়ারি তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তান যাবে এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি অভিযান পরিচালনা করা হবে। শায়খুলহিন্দ স্বয়ং ঐ সময়ে আফগানিস্তানে উপস্থিত থাকবেন।[১৯১]

কাবুলস্থ ভারতীয় নেতাগণ উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর নেতৃত্বে ঐ চুক্তিপত্র নিয়ে আফগান বাদশাহ্ আমীর হাবীবুল্লাহর নিকট গিয়ে উত্তরের প্রয়াসী হন। পূর্বেই বলা হয়েছে, তখন আফগানিস্তান ছিল ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত রাজ্য। এর বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের হাতে। তাই আমীর হাবীবুল্লাহ্ ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী যুদ্ধে জড়িত হতে

Dhaka University Institutional Repository

রাজী হন নি। কিন্তু আফগান সরকার ও জনগণ ছিলেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। আমীর হাবীবুল্লাহ্- এর পুত্র সরদার ইনায়াতুল্লাহ্ ব্যতীত তাঁর আর এক পুত্র সরদার আমানুল্লাহ্ এবং ভাই তথা প্রতিশ্রুত ভাবী বাদশাহ নাসরুল্লাহ্ও ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

সরদার আমানুল্লাহ্ -এর অসন্তুষ্ট থাকার কারণ ছিল এই যে, ব্রিটিশ শাসকদের পরামর্শে আমীর হাবীবুল্লাহ্ প্রতিশ্রুত নাসরুল্লাহ্কে বাদ দিয়ে নিজ বড় ছেলে ইনায়াতুল্লাহ্কে ভাবী বাদশাহ্ করার পাঁয়তারা করছিলেন। এতে সরদার নাসরুল্লাহ্ও হাবীবুল্লাহ্র বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। এমতাবস্থায় আমীর হাবীবুল্লাহ্ বাধ্য হয়ে সামরিক, বেসামরিক অফিসার ও আযাদ উপজাতীয় সরদারদের সমবেত করেন এবং আলোচনার পর বুঝতে পারলেন যে, মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।[১১২] অবশেষে জনসমর্থনের চাপে পড়ে আমীর হাবীবুল্লাহ্ বিপ্লবী দলের নেতৃবৃন্দের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন ২৪ জানুয়ারি ১৯১৬ সালে।[১১৩] চুক্তির বিষয় হল:

"আফগান সরকার নিরপেক্ষ থাকবে। তুর্কী ফৌজ আফগান সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে। আফগান সরকার ব্রিটিশ সরকারের নিকট এই কৈফিয়ত দিবে যে, উপজাতীয় লোকেরা বিদ্রোহ করে আফগান সরকারের আওতা ছাড়িয়ে গেছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ যুদ্ধে যোগদান করলে তাতে তাঁর কোন আপত্তি থাকবে না।" অস্থায়ী ভারত সরকারের নেতৃবৃন্দ তাঁর এতটুকু স্বীকারোক্তিকেই যথেষ্ট বলে মনে করলেন। তাঁরা ঐ মর্মে আমীর হাবীবুল্লাহ্র নিকট থেকে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নেন।[১১৪] সরদার নাসরুল্লাহ্ মাওলানা সিন্ধীর নির্দেশে তা নিজের হেফাজতে রাখেন। এদিকে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান গোপনে এসব তথ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করেন এবং তাদের নিকট থেকে আর্থিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেন।[১১৫] আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান থেকে ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধে অবতরণের কোন নিশ্চিত আশ্বাস না পাওয়ায় এবং তাঁর নিরপেক্ষতা আঁচ করায় জার্মান মিশন মে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল ত্যাগ করেন। কিন্তু তুর্কী মিশন আরো কিছু দিন অবস্থান করার পর কাবুল ত্যাগ করেন।[১১৬]

এহেন পরিস্থিতিতে কাবুলে অবস্থানরত মাওলানা সিন্ধী ভাবলেন, কাবুলের এ সমূহ ঘটনা, মিশনের ব্যর্থতা ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে হেযাযে অবস্থানরত শায়খুলহিন্দকে অবগত করাবেন। তাই তিনি শায়খুলহিন্দের নিকট পত্র লিখলেন। তবে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজর এড়াতে পত্রসমূহ কাগজে না লিখে[১১৭] সিন্ধী ও আমীর নাসরুল্লাহ্ খান একজন দক্ষ কারিগরের হাতে আরবি ভাষায় চুক্তিপত্রের পূর্ণভাষ্য এবং যুদ্ধ আরম্ভের তারিখ (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭) একটি রুমালে রেশমী সুতা দিয়ে বুনেন। এ বয়নকৃত রেশমী পত্রটি বাহকের মাধ্যমে শায়খুলহিন্দের নিকট মক্কায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন।[১১৮] যা ভারতবর্ষের স্বানধীতার ইতিহাসে 'রেশমী রুমালপত্র' বা 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' নামে খ্যাত।[১১৯]

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ কর্তৃক রেশমীপত্র উদ্ধার:

রেশমী রুমাল সম্পর্কে সি. আই. ডি রিপোর্টে বলা হয় যে, মাওলানা সিন্ধী ও মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূর আনসারী একজন দক্ষ কারিগরের হাতে তিনটি রুমালে রেশমী সুতা দিয়ে বয়ন করে তিনটি পত্র লিখেন। এ পত্রগুলো হলুদ রঙের রেশমী কাপড়ের তিনটি টুকরাতে লেখা হয়েছিল। প্রথম পত্রটি শায়খ আবদুর রহীমের নামে লিখিত। এ পত্রটির সাইজ ছিল ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং পাঁচ ইঞ্চি প্রস্থ। দ্বিতীয় পত্রটি শায়খুলহিন্দের নামে প্রেরিত। এ পত্রটি দশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং আট ইঞ্চি প্রস্থ। তৃতীয় পত্রটি শায়খুলহিন্দের নামে একই ধারাবাহিকতায় রচিত। এ পত্রটি পনের ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং দশ ইঞ্চি প্রস্থ।

প্রথম এবং তৃতীয় পত্রে উবায়দুল্লাহ্র দস্তখত রয়েছে। দ্বিতীয় পত্রটি দস্তখত বিহীন। আবদুল হক সি. আই. ডি.কে বলেছে- মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী কাবুল থেকে তাঁকে এ তিনটি পত্র শায়খ আবদুর রহীমকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য দিয়েছেন। এ পত্রগুলো তাঁরই সম্মুখে মাওলানা সিন্ধী ও মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূর আনসারী লিখেছেন।

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী উপমহাদেশ ও আরবের বিপ্লবী দলের কাজের অগ্রগতি ও ব্রিটিশ-ভারতকে আক্রমণ করা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করার জন্য এসব পত্রে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। এগুলো নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে মদীনাতে পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল-আফগানিস্তান ও আযাদ উপজাতি এলাকার যাবতীয় তথ্য এবং যুদ্ধারম্ভের তারিখসহ বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শায়খুলহিন্দকে অবহিত করা। হায়দারাবাদ সিন্দের শায়খ আবদুর রহীমের দায়িত্ব ছিল এ রেশমী রুমাল পত্র দু'টি শায়খুলহিন্দের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। তাই তার কাছে প্রথম পত্রটি লেখা হয়।[২০০]

প্রথম পত্র:

শায়খ আবদুর রহীম সিন্ধীর নামে লিখা প্রথম চিঠির সংক্ষিপ্ত বিষয় ছিল:

১. এ চিঠি পবিত্র মদীনায় অবস্থানরত হযরত শায়খুলহিন্দের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেন।

২. শায়খুলহিন্দকে পত্রের মাধ্যমে এবং মৌখিক ভাবেও সতর্ক করে দিতে হবে যে, তিনি যেন কাবুলে আসার চেষ্টা না করেন।

৩. শায়খুলহিন্দ এ বিষয়টি সম্পর্কে যেন অবগত থাকেন যে, মাওলানা মনসূর আনসারী এবার হজ্বে যেতে পারছেন না।

৪. আব্দুর রহীম সিন্ধী যে ভাবেই হোক কাবুলে মাওলানা সিন্ধীর সাথে দেখা করবেন।

৫. শায়খুলহিন্দের জন্য লিখিত চিঠি মদীনায় পৌঁছাল কিনা সে সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে কাবুলে জানাবেন।

পত্রটি লিখার তারিখ ছিল ৮ রমযান মুতাবিক ৯ জুলাই ১৯১৬ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পত্রঃ

দ্বিতীয় পত্রটি ভারতের স্বাধীনতাকামী মুজাহিদগণের বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছিল। এতে মুজাহিদগণকে নিয়ে প্রস্তাবিত 'জুনূদুল্লাহ' বা মুক্তিফৌজ গঠনের পূর্ণ বিবরণ ছিল। জুনূদুল্লাহ মুজাহিদগণের ১০৪ জন অফিসারের নাম এবং তাঁদের বেতন-ভাতার কথা উল্লেখ ছিল। মুজাহিদ অফিসারগণের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা মুজাহিদগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেবেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে কাজে লাগাবেন। এও উল্লেখ করা হয় যে, এসব মুজাহিদকে হিন্দুস্থান সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করা হবে। ঐ মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্র হবে মদীনায়। শায়খুলহিন্দকে ঐ বাহিনীর প্রধান করার কথা ছিল। তিনজন পৃষ্টপোষক, বারজন জেনারেল এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নাম ছিল। সেনাপতিদের অধীন কেন্দ্রসমূহ হবার কথা ছিল কনস্টান্টিনোপল, তেহরান এবং কাবুলে। কাবুলের সেনাবাহিনীর প্রধান হবার কথা ছিল মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর। পত্রে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের কর্মোদ্দীপনা, জার্মান মিশনের আগমন ও তাদের কর্মতৎপরতা, অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা এবং রুশ, জাপান ও তুরস্কে মিশন প্রেরণের পূর্ণ বিবরণ ছিল। পত্রে শায়খুলহিন্দকে অনুরোধ করা হয়েছিল, তিনি যেন এসব বিষয়ের তথ্য তুরস্কের উসমানীয় খলীফার নিকট পৌঁছে দেন।[২০১]

তৃতীয় পত্রঃ

তৃতীয় পত্রটির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, এটি লেখা হয়েছিল মাওলানা মনসূর আনসারীর পক্ষ থেকে। এ চিঠিতে তিনি হজ্ব সম্পাদনা শেষে হেযায থেকে ভারতে ফিরে এসে পরবর্তী আন্দোলনের যাবতীয় ঘটনাবলি সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেছিলেন। মনসূর আনসারী তাঁর চিঠিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের হাল-অবস্থা এবং কোন কোন নেতা-কর্মী ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতনের ভয়ে নিরুৎসাহী ও নিষ্ক্রীয় রয়েছেন, তা উল্লেখ করেন। চিঠিতে তিনি এও উল্লেখ করেন যে, আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও আমার পক্ষে এবার হেযাযে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি হেযায থেকে যে 'গালিবনামা' বহন করে এনেছিলেন তা বন্ধুদেরকে দেখানো হয়েছে এবং উপজাতীয় এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে। মুজাহিদগণকে 'গালিবনামা' দেখানোতে তাদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা এখন যুদ্ধ করছে। সীমান্তের লৌহমানব হাজী তুরঙ্গাজয়ী এখন 'মেহমন্দ' এলাকায় অবস্থান করছেন। পত্রে তুর্কী-জার্মান মিশনের আগমন এবং তাদের ব্যর্থতার কারণও উল্লেখ করা হয়।[২০২]

সংবাদ আদান-প্রদান এবং পত্র বহন করে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব ছিল নওমুসলিম শায়খ আবদুল হকের উপর।[২০৩] শায়খ আবদুল হক ছিলেন বেনারসের এক হিন্দু পরিবারের সন্তান। ইংরেজিতে এম. এ পাশ। শায়খুলহিন্দের সাগরিদ, কর্মী ও সিন্ধীর অনুসারী। তিনি মুজাহিদ ছাত্রদের সাথে কাবুল সীমান্ত, পাঞ্জাব ও ভাওয়ালপুর হয়ে মুলতান পৌঁছেন। আবদুল হক আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। তাঁর কাবুল গমনের উদ্দেশ্য ছিল, কাপড়ের ব্যবসা এবং তার দীর্ঘ দিনের পুরোনো বন্ধু ও ব্রিটিশ অনুচর 'রব নেওয়াজ'-এর দুই ছেলে শাহনাওয়ায খান ও আল্লাহ্ নাওয়ায খান-এর খবরাখবর জানা। ঐ দুই ছেলে ও মুজাহিদ ছাত্রদের দলভূক্ত হয়ে আফগানিস্তান পৌঁছে ছিলেন এবং 'জুনূদুল্লাহ'- এর সদস্য হয়ে কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। আবদুল হকের ব্যবসার কাপড়ের মধ্যে রেশমী রুমালটি লুকিয়ে রাখা হয়। আবদুল হকের প্রতি উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর নির্দেশ ছিল, তিনি সিন্ধুর শায়খ আব্দুর রহীমের নিকট রেশমী রুমাল পত্রটি পৌঁছে দেবেন এবং আবদুর রহিমকে বলে দেবেন, তিনি যেন হজ্ব করতে গিয়ে শায়খুলহিন্দু মাহমুদ হাসানের নিকট পত্রটি পৌঁছে দেন অথবা তিনি নির্ভরযোগ্য *কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শায়খুলহিন্দের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। আবদুল হক মাওলানা* উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর রুমালপত্রটি কাবুল থেকে পেশওয়ার পর্যন্ত বহন করে আনেন। এখানে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কড়াকড়ি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তল্লাশি দেখে তিনি তা আর বহন করার সাহস করেন নি; বরং ভাওয়ালপুরের বিখ্যাত পীর মৌলবী গোলাম মুহাম্মদ-এর নিকট পত্রগচ্ছিত কোটটি আমানত হিসেবে রেখে আসেন; সিন্ধুতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। আবদুল হক রব নেওয়াযের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অসম্ভব ভীত ছিলেন। তাই ভারতে ফিরে এসে তিনি রব নেওয়াযের দেশত্যাগী দুই ছেলের শুভাশুভ সংবাদ জানালেন, সাথে সাথে রব নেওয়াযের ধমকানীতে কাবুলে স্বদেশত্যাগীদের কর্মতৎপরতা, আন্দোলন, সীমান্ত এলাকায় হামলা; রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ভারতীয় রাজ্যবর্গের নিকট জার্মান সম্রাটের আশ্বাস বাণী সম্বলিত যে চিঠি লিখেছেন এবং রাজন্যবর্গকে যে এও লিখেছেন, সীমান্তের মুজাহিদগণ যখন সীমান্ত অতিক্রম করে ব্রিটিশের উপর আক্রমণ করবে; তখন তারাও যেন বিদ্রোহ করে, এজন্য মহারাজা ন্যায়পাল ও মহারাজা বড়দাকে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে; এসব তথ্য এবং কাবুলে মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর কর্মতৎপরতা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম সর্ম্পকেও বিস্তারিত বলে দিলেন। আবদুল হক তখন রব নেওয়াযের ধমকানীতে ভীত হয়ে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর দেয়া রেশমী কাপড়ের চিঠিগুলো যে কোটের আস্তরে সেলাই করা ছিল, সে কোটটি ভাওয়ালপুরের মৌলবী গোলাম মুহাম্মদদের নিকট থেকে নিয়ে এসে রব নেওয়াযের হাতে উঠিয়ে দেন।[২০৪]

রব নেওয়ায ছিলেন ইংরেজদের কেনা গোলাম। তার ভেতর দু'ছেলের দেশ ত্যাগের কারণে ক্ষোভ ও প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করছিল। তাই ঐ চিঠি ও কোট হাতে আসলে ব্রিটিশ সরকারের অধিক কৃপাদৃষ্টির আশায় সংগে সংগে ব্রিটিশ গোয়েন্দা প্রধান স্যার মাইকেল এডওয়ার্ড-এর হাতে উঠিয়ে দিয়ে চিঠির যাবতীয় বিষয়ে অবহিত করল।[২০৫]

ব্রিটিশের পক্ষে রব নেওয়াযের এ দালালীর কারণে ব্রিটিশ-ভারত সরকার তাকে 'খান বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত করে। রব নেওয়াযের এই লজ্জাজনক ভূমিকা দেশের মাটির সাথে স্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস তাকে কোন দিন ক্ষমা করবে না। সে মীর জাফর আলী খান ও মীর সাদেকের দলভূক্ত হয়ে থাকবে। এ চিঠি সে ব্রিটিশের হস্তগত না করলে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হত। রেশমী পত্রটি লেখা হয়েছিল ১৯১৬ সালের ৯ জুলাই আর তা ব্রিটিশের হাতে আসে ১৯১৬ সালের ১০ আগস্ট। পত্রটি হাতে পেয়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের সরকার বিরোধী আন্দোলনের এই নতুন কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে অবগত হয়। রব নেওয়াযের গাদ্দারী, আবদুল হকের স্বীকারোক্তি এবং রেশমী রুমালের বিষয়বস্তু ও বিপ্লবী দলের সমস্ত গোপনীয় তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার রিপোর্ট কমিশনের কাছে পৌঁছা; কোন অবস্থাতেই কেয়ামতের ভয়াবহতার চেয়ে কম বিভীষিকাপূর্ণ ছিল না; বরং তার চেয়েও বেশী। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্রিটিশ-ভারত

Dhaka University Institutional Repository

সরকার অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। প্রতি রাতে হাজার হাজার নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করে। সারা ভারত জুড়ে চলে পাকড়াও অভিযান। ঘরে ঘরে তল্লাশী হয়। বিশেষ করে ভারতের আটটি প্রদেশে এ অভিযান ভয়ংকরভাবে চলে। উত্তর প্রদেশ, দিল্লী, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, গুজরাট, বিহার ও বাংলা প্রদেশের অবস্থা ছিল নরককুণ্ড। উল্লেখযোগ্য শহর আলীগড়, দেওরিয়া, মিরাট, সুরাট, কলিকাতা, গয়া, রেংগুন (বার্মা/ মিয়ানমার), কুটিহার, মুযাফ্ফর নগর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বিজনৌর, আজমীর, সিমলা, কসূর, বোম্বাই, সাহারানপুর, দেওবন্দ, রায়পুর, শিয়ালকোট, মুরাদাবাদ, পেশওয়ার, ভাগলপুর, লাহোর, হায়দারাবাদ, ভূপাল ও গাঙ্গুহ শহরের প্রতিটি ঘরে পুলিশ তল্লাশী ও ধর-পাকড় হয়। পুলিশ অসংখ্য স্থানে রেড দিয়েছিল। ২৩০ জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এদের মধ্যে ৫৯ জনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত ও সে উদ্দেশ্যে বিদেশী সাহায্য প্রার্থনার অভিযোগে মুকদ্দমা দায়ের করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের এ পরিসংখ্যান দ্বারা বুঝা যায়, ঐ সব এলাকায় স্বাধীনতা আন্দোলন তখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।[২০৬]

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ও মাওলানা আবদুর রহমানের বর্ণনামতে দেখা যায় যে, গোয়েন্দা পুলিশ রেশমী রুমাল উদ্ধার করে শায়খ আবদুর রহীমের হাত থেকে। পক্ষান্তরে, সি. আই. ডি-এর রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, খান বাহাদুর রব নেওয়ায খান আবদুল হকের নিকট থেকে রেশমী রুমালগুলো উদ্ধার করে মুলতান ডিভিশনের কমিশনারের নিকট আবদুল হকসহ রেশমী রুমালগুলো হস্তান্তর করে। ডিভিশনাল কমিশনার ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে এর তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য গোয়েন্দা বিভাগের নিকট আবদুল হক ও রেশমী রুমালগুলো হস্তান্তর করে। এর পর ভারতের বড়লাট মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী এবং অন্যান্যের'[২০৭] নামে একটি ফৌজদারি মোকাদ্দমা করেন। যা নিচে উল্লেখ করা হলো:

'রেশমীপত্র ষড়যন্ত্র কেস' এবং 'কার কী ভূমিকা'

ফৌজদারি মামলা

ভারতের বড় লাট

বনাম

উবায়দুল্লাহ্ ও অন্যান্য

ভারতের ফৌজদারি আইনের ১২১ক ধারা

ফৌজদারি মামলার আরজি

১। পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট নিবেদন করছে- নিম্নে বর্ণিত অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ১ জানুয়ারি ১৯১৩ থেকে ১ জানুয়ারি ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের অভ্যন্তরে এবং এর বাইরে ষড়যন্ত্র করে। তারা ভারতের বড়লাটের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং যুদ্ধের সহযোগিতায় প্রয়াস চালানো ইত্যাদি রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে। তদুপরি তারা ব্রিটিশ ভারতের সরকারকে উৎখাত করার প্রয়াস চালায়।

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিগণ ভারতের ফৌজদারি আইনের ১২১ক ধারা মতে শাস্তিযোগ্য।

১. আবদুল আযীয মওলবী, পিতা হায়াগুল, আতমনষয়ী, পেশোয়ার। (পলাতক)।

২. আবদুল বারী, পিতা গোলাম জীলানী, লায়ালপুর। (ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ অর্ডিনেন্সের অধীনে পাঞ্জাবে নযরবন্দ)

৩. আবদুল হাই খাজা, পিতা খাজা আবদুর রহমান, গুরুদাসপুর। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে পাঞ্জাবে অবাধ চলাফেরা সীমাবদ্ধ)

৪. আবদুল হক শায়খ উরফে জীবন দাস, জেলা- শাহ্পুর (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে তার অবাধ চলাফেরা পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)। সে একজন ব্রিটিশের রাজসাক্ষী।

৫. আবদুর হক মওলবী, রেফাহে আম প্রেস, লাহোর। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে তার অবাধ চলাফেরা পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)।

৬. আবদুল মজীদ খান, জনৈক পঞ্চদশ অশ্বারোহী সেনাদলের মেজরের পুত্র। সে ইতঃপূর্বে ইন্তিকাল করেছে।

৭. আবদুল্লাহ্ মওলবী, পিতা নেহাল খান, জেলা সাখ্খার। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে তার অবাধ চলাফেরা পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)। সে একজন রাজসাক্ষী।

৮. আব্দুল কাদির বি. এ., পিতা আহমদ দীন, লায়ালপুর। (ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ অর্ডিনেন্সের অধীনে পাঞ্জাবে নযরবন্দ)।

৯. আবদুল রহীম সিন্ধী শায়খ, পিতা লালা ভগবান দাস, হায়দারাবাদ সিন্ধ। (পলাতক)।

১০. আবদুর রহীম মওলবী, পিতা রহীম বখ্শ, মসজিদ চুন্ইয়াওয়ালী, লাহোর। (পলাতক)।

১১. আবদুর রশীদ, লাহোরের মুহাজির ছাত্র (পলাতক)।

১২. আবদুর রায্যাক আনসারী হাকীম, পিতা- আবদুর রহমান, দিল্লী।

১৩. আবদুল ওয়াহীদ, পিতা সাদিক আহ্মদ, টাণ্ডা, যুক্তপ্রদেশ। (ব্রিটিশ ভারতের বাইরে নযরবন্দ)।

১৪. আবুল কালাম আযাদ মওলবী উরফে মহ্য়িদ্দীন, পিতা মওলানা খায়রুদ্দীন, কোলকাতা। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে উড়িষা ও বিহারে তার অবাধ চলাফেরা সীমাবদ্ধ)।

১৫. আবূ মুহাম্মদ আহ্মদ মওলবী উরফে মওলবী আহ্মদ, পিতা গোলাম হুসায়ন, লাহোর। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে তার অবাধ চলাচল পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)।

১৬. আহ্মদ আলী মওলবী, পিতা হাবীবুল্লাহ্, গুজরানওয়ালা (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে অবাধ চলাফেরা পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)। সে একজন ব্রিটিশের রাজসাক্ষী।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. আহ্মদ মিয়াঁ মওলবী, পিতা আবদুল্লাহ্ আনসারী, আম্বেঠ, সাহারানপুর, যুক্তপ্রদেশ। (সে একজন রাজসাক্ষী)।

১৮. আল্লাহ্ নাওয়ায খান, পিতা খান বাহদুর রব নাওয়ায খান, অনারারি মেজিস্ট্রেট, মুলতান, পাঞ্জাব। (পলাতক)।

১৯. আনীস আহ্মদ বি. এ মওলবী, পিতা ইদ্রীস আহমদ, এসিস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গালো অরিয়েন্টাল কলেজ, আলীগড়, যুক্তপ্রদেশ।

২০. উযারাগুল মওলবী, পিতা শহীদগুল, দরগায়ী, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। (ব্রিটিশ ভারতের বাইরে নযরবন্দ)।

২১. বরকতুল্লাহ্ মওলবী ভূপাল। (পলাতক)।

২২. ফত্হ্ মুহাম্মদ সিন্ধী, রোক সিন্ধ। (পলাতক)।

২৩. ফযলুল হাসান মওলবী উরফে হাসরাত মোহানী, আলীগড়। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে শাস্তি হিসেবে যুক্ত প্রদেশে দু'বছরের জেল ভোগ করছে)।

২৪. ফয্ল ইলাহী মওলবী, পিতা মীরান বখ্শ্, হরীপুর, থানা ওযীরাবাদ, জেলা-গুজরানওয়ালা, পাঞ্জাব। (পলাতক)।

২৫. ফয্ল মাহমুদ মওলবী, পিতা মওলবী নূর মুহাম্মদ, চারসিন্দা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। (পলাতক)।

২৬. ফয্লে রাব্বী মওলবী, পেশোয়ার। (পলাতক)।

446960

২৭. ফয্লে ওয়াহিদ মওলবী, পিতা-ফযয আহ্মদ উরফে হাজী তুরঙ্গাজয়ী, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। (পলাতক)।

২৮. হাবীবুল্লাহ্ গাযী, পিতা রূহুল্লাহ্, কাকূরী, জেলা লক্ষ্ণৌ, যুক্তপ্রদেশ (পলাতক)।

২৯. হাদী হাসান সায়্যিদ, খান জাহানপুর, মুযাফ্ফর নগর, যুক্তপ্রদেশ।

৩০. হামদুল্লাহ মওলবী, পিতা হাজী সিরাজুদ্দীন, পানিপথ। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে অবাধ চলাফেরা পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)।

৩১. হুসায়ন আহ্মদ মদনী মওলবী, পিতা মওলবী হাবীবুল্লাহ্, ফয়যাবাদ। (ব্রিটিশ ভারতের বাইরে নযরবন্দ)।

৩২. ইবরাহীম সিন্ধী এম. এ শায়খ, পিতা আবদুল্লাহ্, করাচী। (পলাতক)।

৩৩. কাল্যা সিং, লুধিয়ানা, পাঞ্জাব। সে দেশ ত্যাগ করে চলে যায় পরে ফিরে আসে। (পলাতক)

৩৪. খান মুহাম্মদ খান হাজী, পেশোয়ার। (পলাতক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. খুশী মুহাম্মদ, পিতা জান মুহাম্মদ, গলুলী, জেলা-জালান্ধর, পাঞ্জাব। (পলাতক)

৩৬. মহেন্দ্র প্রতাপ, পিতা সূর গাবাশী, রাজা ঘনসিয়ান সিং, মুরসাল, যুক্তপ্রদেশ। (পলাতক)

৩৭. মাহমূদ হাসান মওলানা, প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, দারুল উলুম দেওবন্দ, যুক্তপ্রদেশ। (ব্রিটিশ ভারতের বাইরে নযরবন্দ)।

৩৮. মতলূবুর রহমান মওলবী, দেওবন্দ (যুক্তপ্রদেশের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী)।

৩৯. মুহ্য়িদ্দীন উরফে বরকত আলী মওলবী, কাসূর। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে অবাধ চলাফেরা পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)।

৪০. মুহ্য়িদ্দীন খান মওলবী, মুরাদাবাদ। (কাযী, ভূপাল)।

৪১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বি. এ, পিতা শায়খ আবদুল কাদির, সেক্রেটারী, মিয়ানওয়ালী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড। (পলাতক)।

৪২. মুহাম্মদ আলী বি. এ, পিতা আবদুল কাদির, কাসূর (পলাতক)।

৪৩. মুহাম্মদ আলী সিন্ধী, পিতা হাবীবুল্লাহ, গুজরানওয়ালা। (পলাতক)।

৪৪. মুহাম্মদ আসলাম আত্তার, পেশোয়ার। (ভারত প্রবেশের অর্ডিনেন্সের অধীনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নযরবন্দ)।

৪৫. মুহাম্মদ হাসান বি. এ, লাহোর। তার পিতা 'পয়সা' পত্রিকা কার্যালয়ে চাকুরিরত ছিল।

৪৬. মুহাম্মদ হাশিম মওলবী সায়্যিদ, কূড়া জাহাঁআবাদ, ফত্হ্পুর। (ভারত প্রবেশের অর্ডিনেন্সের অধীনে যুক্তপ্রদেশে নযরবন্দ)।

৪৭. মুহাম্মদ মাসউদ মওলবী, পিতা মাযহার হুসাইন, দেওবন্দ, যুক্তপ্রদেশ। (সে একজন রাজসাক্ষী)।

৪৮. মুহাম্মদ মিয়াঁ মওলবী, পিতা মওলবী আবদ আনসারী, আম্বেঠ, জেলা-সাহারানপুর, যুক্তপ্রদেশ। (সে একজন ব্রিটিশের রাজসাক্ষী)।

৪৯. মুহাম্মদ মুবীন মওলবী, পিতা মুহাম্মদ মু'মিন, দেওবন্দ। (সে একজন রাজসাক্ষী)।

৫০. মুহাম্মদ মুরত্যা মওলবী সায়্যিদ, পিতা বুনয়্যাদ আলী, বিজনৌর, যুক্তপ্রদেশ। (সে একজন রাজসাক্ষী)।

৫১. নূরুল হাসান সায়্যিদ, রাথেড়ী, মুযাফ্ফরনগর, যুক্তপ্রদেশ।

৫২. উবায়দুল্লাহ্ মওলবী উরফে বুটাসিং, সিয়ালকোট, পাঞ্জাব। (পলাতক)।

৫৩. সদরুদ্দীন উরফে ডাক্তার আবদুল করীম বরলাসী, পিতা আমীর আলী, বেনারস। (ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধের অর্ডিনেন্সের অধীনে যুক্তপ্রদেশে নযরবন্দ)।

Dhaka University Institutional Repository

৫৪. সায়ফুর রহমান মওলবী, পিতা গোলাম খান, পেশোয়ার, সীমান্ত প্রদেশ। (পলাতক)।

৫৫. শাহ্ বখ্শ্ হাজী, পিতা ইমাম বখ্শ্ আনসারী, হায়দারাবাদ সিন্ধ। (ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধের অর্ডিনেন্সের অধীনে সিন্ধুতে নযরবন্দ)।

৫৬. শাহ্ নাওয়ায খান, পিতা খান বাহাদুর রব নাওয়ায খান, অনারারি মেজিস্ট্রেট, মুলতান, পাঞ্জাব। (পলাতক)।

৫৭. শুজউল্লাহ্, পিতা হাবীবুল্লাহ্, লাহোর। (ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধের অর্ডিনেন্সের অধীনে পাঞ্জাবে নযরবন্দ)।

৫৮. ওয়ালী মুহাম্মদ মওলবী, ফতূহীওয়ালা, লাহোর, পাঞ্জাব। (পলাতক)।

৫৯. যহূর মুহাম্মদ মওলবী, পিতা ইনায়াতুল্লাহ্, রুড়কী, সাহারানপুর।

২. ব্রিটিশ সরকারের সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকরার প্রয়াস চালানো, যুদ্ধ পরিচালনায় সহায়তা করা এবং বড়লাটের সিংহাসনচ্যুত করাই ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের মূল উদ্দেশ্য।

ষড়যন্ত্রের পদ্ধতির মধ্যে ছিল ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কুরআন মজীদের ভ্রান্তমূলক ব্যাখ্যা প্রদান, বিভিন্ন পন্থায় ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, *সীমান্তের উপজাতি এবং আফগানিস্তানে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক প্রোপ্যাগান্ডা চালানো, ঐ* সকল দেশের জনগণকে ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রেরণা প্রদান, যুদ্ধে তুর্কী সরকারের সহায়তা গ্রহণ এবং এ সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চাঁদা আদায় করা। পরিশেষে ষড়যন্ত্রকারীদের সংকল্প ছিল যখনই আন্তর্জাতিকভাবে সকল প্রকারের সহায়তা ও সহযোগিতা লাভ সম্ভব হয় তখনই ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

৩. ষড়যন্ত্রকারীদের পরস্পর একের অন্যের সাথে যোগসূত্র ছিল। তাদের নিয়মিত অধিবেশন হতো। এসকল অধিবেশনে তাদের চক্রান্ত এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। এদের কেউ কেউ জমীঅতুল আন্সার, জমইয়াতে হিয্বুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠান এবং নিযারাতুল মা'আরিফ এবং দারুল ইরশাদ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। তারা ভারতকে দারুল হরব ঘোষণা করে ধর্মপরায়ণ মুসলমানদের হিজরত করা জরুরী ঘোষণা করে। মুসলমানদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচারপত্র বিলি করে। তাদের কেউ কেউ *১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে সীমান্তে গমন করে।* ভারতে অবস্থানকারী ষড়যন্ত্রকারীগণ এই মুহাজির মুজাহিদদের সহায়তার জন্য অর্থ ও গোলাবারুদের যোগান দেয়।

আলিম শ্রেণীর ষড়যন্ত্রকারীগণ ১৯১৫ সালের জুন মাসে ভারত থেকে স্বাধীন উপজাতি এলাকা সীমান্তে গমন করে এবং এদেরকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। এতে সীমান্তের উপজাতিরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এদের নেতৃত্ব দেয় ভারতীয় দু'জন ষড়যন্ত্রকারী আলিম। যুদ্ধশেষে এ দু'জন ১৯১৫ সালের আগস্টে কাবুলে যায়। এদের তথায় *গমনের পূর্বেই ভারতীয় ষড়যন্ত্রকারী দু'জন সদস্যসহ শত্রুদের একটি মিশন কাবুলে পৌঁছে যায়।*

Dhaka University Institutional Repository

ষড়যন্ত্রকারীগণ কাবুলে এক পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। ব্রিটিশের ক্ষমতা লোপ করে কীভাবে ভারতে রাজত্ব স্থাপন করা হবে– এ সম্পর্কে তারা বিস্তারিত আলোচনা করে। এ সময়ে তারা একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করে ভারতকে মুক্ত করার জন্য একটি মুক্তিফৌজও গঠন করে। উচ্চ পদস্থ ষড়যন্ত্রকারীদেরকে মুক্তিফৌজের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত করে। তদুপরি অস্থায়ী সরকারের *পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রকারী দ্বারা গঠিত মিশন বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রেরণ করে। তারা কাবুলের আমীরকে* প্ররোচিত করে ব্রিটিশের পক্ষপাতিত্ব বর্জন করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়। এতে তারা কিছুটা সফলতাও লাভ করে।

ষড়যন্ত্রকারীগণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উপমহাদেশে বহু চাঁদা আদায় করে এবং কতিপয় ষড়যন্ত্রকারীসহ মওলানা মাহমূদুল হাসান আরব গমন করে। সে তথায় পৌঁছে স্বাধীনতা লাভের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সমাধা করে কিছু উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে কিছু ষড়যন্ত্রকারীকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়। তারা ভারতে পৌঁছে তাঁর নির্দেশ মতে কার্যসম্পাদন করে। এদিকে উপমহাদেশে অবস্থানরত ষড়যন্ত্রকারীগণ আরব সীমান্ত ও কাবুলের ষড়যন্ত্রদলের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। তারা প্রচুর পরিমাণে চাঁদা আদায় করে আরব ও কাবুলে তার দলের লোকদেরকে প্রেরণ করে।

৪. ষড়যন্ত্রকারীগণ জনসাধারণকে বিপ্লবী বানাবার জন্য মিশনারির সাহায্যে তাদের মধ্যে তবলীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর বিশেষজ্ঞ আলিমদের দ্বারা এ মিশনারি গঠিত হবে। আর এ *ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা মওলবী উবায়দুল্লাহ্ আলিমদের কেন্দ্রস্থল দারুল উলূম* দেওবন্দকে কার্যপরিচালনার জন্য নির্বাচিত করে। মওলবী উবায়দুল্লাহ্ হলো একজন নও মুসলিম। সে নিজেও দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা লাভ করেছে।

৫. মওলানা মুহাম্মদ কাসিম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। সে উপমহাদেশের একজন প্রসিদ্ধ বিশিষ্ট আলিম। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হাজী ইমদাদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে তথাকথিত স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে তারা আত্মগোপন করে। হাজী ইমদাদুল্লাহ্ অতিসন্তপর্ণে হিযাযে হিজরত করতে সক্ষম হয়। সেখানে সে কয়েক বছর অবস্থান করার পর ইন্তিকাল করে।

মওলবী মুহাম্মদ কাসিম ভারতেই থেকে যায়। তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। পরবর্তীতে সে এ মামলা থেকে মুক্তি লাভ করে। মুক্তি লাভের পর সে দেওবন্দেই জীবন অতিবাহিত করে। সে জনগণের অধিক সম্মানের পাত্র ছিল। মওলানা মাহ্‌মূদ হাসান ছিল তাঁর ভক্ত ও অনুসারী। সে দীর্ঘদিন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান অধ্যাপক ছিল।

৬. মওলবী উবায়দুল্লাহ্‌র ক্ষতিকর প্রভাব দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় দ্রুত বিস্তার লাভ করে। সে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ছাত্র–শিক্ষকদের বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন করে তোলে। সে মওলানা মাহ্‌মূদ হাসানকে ইতঃপূর্বেই সর্বাত্মকভাবে তার আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে গড়ে তোলে।[২০৮] মওলানা মাহ্‌মূদ হাসান ছিল ব্যুৎপত্তিশীল বিশিষ্ট একজন আলিম। মুসলিম সমাজে একজন বিশিষ্ট আলিম ও নেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করায় তাকে বিদ্রোহী দলের নেতা নির্বাচন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭. মওলবী উবায়দুল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হলো– দারুল উলুম দেওবন্দকে তার ষড়যন্ত্রের হেড কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করবে। ইসলামী ঐক্য এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন দেওবন্দের ডিগ্রিধারী শিক্ষিত আলিমদের মাধ্যমে ভারতব্যাপী ছড়িয়ে দেবে। কেননা দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিমরা উপমহাদেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে আছে।

৮. মওলবী উবায়দুল্লাহ্ তার ষড়যন্ত্রকে রূপ দেয়ার জন্য ১৯০৯ সালে দেওবন্দে জমীঅতুল আন্‌সার নামক এক আঞ্জুমন প্রতিষ্ঠা করে। এ আঞ্জুমনকে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আঞ্জুমন বললে অত্যুক্তি হবে না। মওলবী উবায়দুল্লাহ্ দারুল উলুম দেওবন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীদেরকে এ আঞ্জুমনের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়।

এ আঞ্জুমনের উন্নতিকল্পে ব্যাপকভাবে চাঁদা গ্রহণ করা হয়। এ চাঁদা দ্বারা আঞ্জুমনের প্রয়োজনীয় কার্য সমাধাসহ নতুন তথ্য এবং সমালোচনামূলক বিষয়ের পত্রিকা ক্রয় করে ভারত ও বহিঃভারতে বিলি করা হয়। এছাড়া আনীস আহ্‌মদ বি. এ, খাজা আবদুল হাই এবং কাযী যিয়াউদ্দীনের ন্যায় আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে মওলবী উবায়দুল্লাহ্ এ আঞ্জুমনের অন্তর্ভুক্ত করে। এদের মধ্যে রাজনীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এরা মধ্যপন্থী মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। জমীঅতুল আন্‌সার ফান্ড থেকে এদের কার্যক্রমের জন্য সম্মানী দেয়া হতো। মওলবী মুরতাযা আমাদেরকে জানায়– এ আঞ্জুমন প্রতিষ্ঠা করে মওলবী উবায়দুল্লাহ্ একটি গোপন দল গঠন করে। এ গোপন দলটি আঞ্জুমনের অভ্যন্তরীণ কাজে নিয়োজিত ছিল; কিন্তু এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রকাশ করা হয় নি। এ গোপন দল প্রতিষ্ঠা মূলত সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না বলে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ মওলবী উবায়দুল্লাহকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং নিন্দা করে।

ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে জমীঅতুল আন্‌সারের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন – (১) মওলবী উবায়দুল্লাহ্ (সাধারণ সম্পাদক) (২) মওলবী আবু মুহাম্মদ আহ্‌মদ (সহকারী সাধারণ সম্পাদক) (৩) মওলবী মুহাম্মদ মিয়াঁ (৪) মওলবী হামদুল্লাহ্ (৫) মওলবী আনীস আহ্‌মদ (৬) মওলবী খাজা আবদুল হাই (৭) মওলবী মুরতাযা (৮) মওলবী যহুর মুহাম্মদ। মওলবী মুরতাযা দেওবন্দে অধিক সময় অনুপস্থিত থাকায় জমীঅতের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করতে সক্ষম হয় নি।

৯. দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মুহাম্মদ কাসিমের তনয় শামসুল উলামা হাফিয মুহাম্মদ আহ্‌মদের তত্ত্বাবধানে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা পরিচালিত হয়। মওলবী উবায়দুল্লাহ্‌র আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এ মাদ্‌রাসাটি রাজনীতিমুক্ত ছিল। তার আগমনের পরে তার প্রভাবে এ মাদ্‌রাসার ছাত্র শিক্ষক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

১০. ভারতের মুসলমানগণ ইটালী ও তুর্কী যুদ্ধ (সেপ্টেম্বর ১৯১১– অক্টোবর ১৯১২) সংঘটিত হওয়ার কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তদুপরি প্রথম বলকান যুদ্ধ ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ (অক্টোবর ১৯১২– অক্টোবর ১৯১৩) সংঘটিত হওয়ায় এবং এ যুদ্ধদ্বয়ে তুর্কীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের সক্রিয় ভূমিকা রাখায় ভারতীয় মুসলমানদের উত্তেজনা আরও অধিক বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশের মুসলিম বিদ্বেষী পলিসির কারণে ভারতীয় আলিম সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেওবন্দের এ পরামর্শ সভায় তুর্কীদের সাহায্যার্থ চাঁদা আদায়ের

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি উত্থাপিত হলে মাওলানা মাহ্মূদ দারুল উলূম বন্ধ করে চাঁদা আদায়ের পরামর্শ দেয়। তার মতে দারুল উলূম খোলা রাখার চেয়ে তুর্কীদের সাহায্যার্থে চাঁদা আদায় শ্রেয়। মাওলানা মাহ্মূদের বিশ্বস্ত সহচর মওলবী মুরতাযা জানায় যে, মাওলানা মাহ্মূদের এ প্রস্তাবের অন্তরালে একটি অন্তর্নিহিত বিষয় বিদ্যমান ছিল। তা হলো ভারতীয় মুসলমানদেরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে *জিহাদের দিকে অগ্রসর করা। এজন্যই তিনি মাদ্রাসা বন্ধ রাখার পরামর্শ দেন। এরপর* বাস্তবেই কিছু সময়ের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ বন্ধ করে তুর্কীদের সাহায্যার্থে চাঁদা আদায় করা হয়।

১১. দারুল উলূম দেওবন্দে ব্রিটিশ বিদ্বেষীভাব প্রকাশ্যে জেগে উঠে। তদুপরি বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপও তথায় সংঘটিত হতে থাকে। এ বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের মধ্যে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কট আন্দোলনও ছিল। মওলবী ফযলুর রহমান দেওবন্দ আগমন করলে মওলবী আনীস আহ্মদ মওলানা মাহ্মূদের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেয়। দেওবন্দে বয়কট আন্দোলন *পরিচালনায় আনীস আহ্মদও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সে দেশীয় প্রস্তুত খদ্দর কাপড়ের* পোশাক পরতো। সে দেওবন্দের জনৈক সিনিয়র মওলবীকেও অনুরূপ দেশীয় প্রস্তুত খদ্দর কাপড়ের পোশাক পরিধান করার উৎসাহ প্রদান করে।

১২. ১৯১২ সালের আগস্টে ব্রিটিশ কর্তৃক কানপুর মসজিদ ধ্বংস করায় মওলবী উবায়দুল্লাহ্ এর চরম প্রতিবাদ জানায়। মওলানা মাহ্মূদ এমনিতে ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিল। ব্রিটিশ তার প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করায় ভারতকে দারুল হরব ঘোষণা দেয়ার জন্য মওলবী উবায়দুল্লাহ্ মওলানা মাহ্মূদকে উত্তেজিত করে।

১৩. *মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দারুল উলূম দেওবন্দের খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য উবায়দুল্লাহ্, আনীস* আহ্মদ ও তাদের সহকর্মীদের মাদ্রাসা থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মওলানা মাহ্মূদ দারুল উলূম কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়। ইতঃপূর্বেও তিনি দারুল উলূমের অধ্যক্ষের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। কেননা দারুল উলূমের অধ্যক্ষ মওলবী মুহাম্মদ মিয়াঁকে মওলানা মাহ্মূদের পরামর্শ ছাড়া দারুল উলূম থেকে বের করে দেন। মাদ্রাসায় অধ্যাপনার সাথে সাথে মওলানা মাহ্মূদের বিভিন্ন কাজের সহায়তার জন্য মওলবী মুহাম্মদ মিয়াঁকে দারুল উলূম দেওবন্দে নিয়োগ দান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মওলবী মুহাম্মদ মিয়াঁ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী হয়।

১৪. দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে মওলবী উবায়দুল্লাহ্কে বের করে দিলেও সে দেওবন্দে মওলানা মাহ্মূদের আবাসস্থলে যাতায়াত করতো। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে মওলানা মাহ্মূদের ভারত থেকে হেযায যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত পরামর্শের জন্য দেওবন্দে তার আবাসস্থলে ষড়যন্ত্রকারীরা মিলিত হতো।

১৫. সীমান্তে জিহাদের উদ্দেশ্যে আগন্তুক ফযলে ইলাহী, ফযলে মাহ্মুদ এবং আবদুল আযীযসহ অন্যান্য মুহাজির মওলবীরাও দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা লাভ করেছে। কাবুলের প্রধান বিচারপতি হাজী আবদুর রায্যাক্ সাহারানপুর জেলার গাঙ্গুহে ইসলামী শিক্ষা লাভ করায় আবু

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আহ্মদ ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। এরই ফলে সীমান্তে আগন্তুক ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে তিনি গাঢ় সম্পর্ক বজায় রাখেন।

১৬. দেওবন্দকে তাদের মিশনারীর দীক্ষা লাভের কেন্দ্র বানাতে ব্যর্থ হওয়ায় উবায়দুল্লাহ্ দিল্লীতে নিযারাতুল মা'আরিফ নামক একটি কেন্দ্র স্থাপন করে। আনীস আহমদ তার পিতা আলীগড় কলেজের সহকারী সম্পাদক মওলবী ইদ্‌রীস আহ্মদকে এ দীক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা বানাতে সক্ষম হয়। আর এরই প্রচেষ্টায় আলীগড়ের মুহাম্মদ ইসহাক খানকে এর পৃষ্ঠপোষক বানানো হয়। এর ফলে উপমহাদেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গও এ দীক্ষাকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশেষভাবে ভূপালের বেগম এ দীক্ষাকেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করতে রাজী হন। এ দীক্ষা কেন্দ্রের সাহায্যার্থে তিনি প্রতিমাসে দু'শ টাকা প্রদান করতেন।

এ কেন্দ্রের নামকরণ দ্বারা বোধগম্য হয় যে, এটি কুরআনের একটি প্রকাশ্য মৌলিক ও প্রকৃত ব্যাখ্যা কেন্দ্র। এখানে আরবি ভাষায় শিক্ষাও দেয়া হতো, কিন্তু এটি ছিল গৌন বিষয়।

ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে উবায়দুল্লাহ্ এবং আহ্মদ আলী যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ছিল। আবদুল হাই এবং আনীস আহ্মদ এ সংস্থা থেকে ভাতা পেতো। মওলানা মাহ্মূদ হাসান, মওলবী আবুল কালাম আযাদ, মওলবী ফযলুল হাসান এবং কসূর নিবাসী মুহ্য়িদ্দীন এ সংস্থার সদস্য ছিল।

১৭. মওলবী উবায়দুল্লাহ্ জিহাদ ফরয হওয়া সম্পর্কিত কুরআনের বিষয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করে। উবায়দুল্লাহ্ এ বিষয়ের শিক্ষাসমূহকে আনীস আহ্মদ তা'লীমে কুরআন ও কলীদে কুরআন নামক দুটি গ্রন্থে ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালে প্রাঞ্জল ও সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করে।

১৮. তা'লীমে কুরআন ও কলীদে কুরআন গ্রন্থদ্বয়ে সংক্ষিপ্তভাবে ভারতীয় মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয় যে, মুসলমানদের উপর কাফির ইংরেজদের আধিপত্য লাভ করার কারণ হলো– এরা ধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ জিহাদকে উপেক্ষা করে চলছে। আর মহানবী (স্যাঃ) এর প্রাথমিক যুগের অনুসারীরা এর উপর আমল করেই পার্থিব ক্ষমতা এবং ধর্মীয় গৌরব লাভ করেছে। সম্ভবত গ্রন্থদ্বয়ের একটি মওলবী উবায়দুল্লাহ্‌র উপদেশে আহ্মদ আলীর সহায়তায় তখনই প্রণীত হয়েছিল যখন আনীস আহ্মদ এবং আহ্মদ আলী নিযারাতুল মা'আরিফ থেকে নিয়মিত ভাতা পেতো। বিধিমতে এ গ্রন্থদ্বয়ের কপি সরকারকে প্রদান না করেই জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

১৯. নিযারাতুল মা'আরিফ কেন্দ্রে জিহাদের প্রশিক্ষণ ছাড়াও ষড়যন্ত্রকারীদের পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হয়। নিযারার এসকল কার্যক্রম সম্পর্কে মুহাম্মদ আলী নামক জনৈক ষড়যন্ত্রকারী কাবুলে অবস্থানরত ষড়যন্ত্রকারী আবদুল হককে বলেছিল– তার ভাই আহ্মদ আলী দিল্লীতে মওলবী উবায়দুল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিযারাতুল মা'আরিফের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কর্মরত আছে। সে আশংকা করছে– তার ভাই যেকোন সময়ে গ্রেফতার হয়ে যেতে পারে।

২০. মওলবী আবুল কালাম আযাদ ১৯১২ সালে কোলকাতায় জমইয়াতে হিযবুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার ও প্রসার। সে আল্‌হিলাল পত্রিকার সম্পাদকও

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রেস এক্টের অধীনে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। সে লেখক, বাগ্মী ও আলিম হিসেবে উপমহাদেশে খ্যাতিলাভ করে।

২১. জমইয়াতে হিযবুল্লাহর যে বিষয়টি বিশেষ অর্থবহ তা হল:

দেশ বিদেশে বিচরণকারী আবিদ ব্যক্তিগণ এ শাখায় যারা সদস্য হতে পারতেন; তাদের দায়িত্ব ছিল- ভ্রাম্যমান হিসেবে ইসলাম প্রচার করা। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদে আগ্রহী ব্যক্তিরাই এ শাখায় সদস্য হয়। তারা পার্থিব লোভ-লালসা ও স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়। তারা ধর্ম এবং শরীঅতের বিধান প্রচারের উদ্দেশ্যে সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে। তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের সংস্কার করে জনগণকে খাঁটি মুসলমানে রূপায়িত করে।

২২. ১৯১৪ সালের সম্ভবত নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাস হবে। সীমান্ত প্রদেশের কতিপয় ব্যক্তির সাথে মাওলানা মাহ্মূদকে পরামর্শরত অবস্থায় দেখা যায়। এদের সাথে কাবুলের দু'ব্যক্তি আগমন করেছিল। তারা মাওলানা মাহ্মূদকে নিয়ে বাসভবনেই অবস্থান করে। তথায় তখন উযারাদুল্লাহ্, আনীস আহমদ, উযারাগুল এবং হামদুল্লাহ্ ছিল। দু'মাস পর সীমান্তের এ লোকগুলো পুনরায় মাওলানা মাহমূদের নিকট আগমন করে। এদের সাথে মওলবী ফযলে রাব্বীও ছিল। এ সময়ে দু'টি বৈঠক হয়। এই বৈঠকদ্বয়ে মাওলানা হামদুল্লাহ্, উযারাগুল, আহ্সান আহ্মদ এবং যহুর আহ্মদও ছিল। এ সময়ে মুহাম্মদ মিয়াঁ, লাহোরের ওয়ালী মুহাম্মদ এবং জান মুহাম্মদও ছিল। মওলবী আহ্মদ চাকওয়ালী এবং মুহাম্মদ মুবীনও এ সময়ে এখানে উপস্থিত ছিল।[২০৯]

উল্লিখিত রেশমী রুমাল উদ্ধারের বর্ণনা হতে সি. আই. ডি-এর বর্ণনাকে আমরা যথার্থ বলে মনে করি।

রেশমী রুমাল পত্রগুলো উদ্ধার করার পর ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবী দলের সমস্ত গোপন তথ্য সম্পর্কে জানতে পারে। এদিকে শায়খুলহিন্দ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, বিপ্লবের তারিখ যদিও নির্ধারিত আছে তবুও আমার সর্বশেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন কেন্দ্র থেকে কেউ কোন অবস্থায় যেন বিপ্লব না ঘটায়। রেশমী রুমাল পত্রগুলো ইংরেজদের হস্তগত হয়ে যাওয়ায় শায়খুলহিন্দ বিপ্লবের শেষ নির্দেশ দেন নি। কেন্দ্রসমূহ বিপ্লব আরম্ভ করার তারিখ সম্পর্কে অবহিত ছিল; কিন্তু শায়খুলহিন্দের সর্বশেষ নির্দেশ না পাওয়ায় উপমহাদেশের অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রসমূহ এবং আযাদ উপজাতি এলাকা ইয়াগিস্তান থেকেও বিপ্লবের সূত্রপাত হয় নি। রাওল্যাট রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ইংরেজগণ রেশমী রুমাল পত্রে বিপ্লবের নির্ধারিত তারিখ জানতে পেরে সবধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফেলে। নির্ধারিত বিপ্লবের তারিখ ১৯১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারির পূর্বে উপমহাদেশের বিপ্লবী নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হয় এবং উপমহাদেশের সকল স্থানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যেন কোথাও কোন ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়।[২১০]

ব্রিটিশ সরকার মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দকে গ্রেফতার করে তাদের হাতে সমর্পণ করার জন্য আফগানিস্তানের আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের উপর চাপ প্রয়োগ করে। কিন্তু সরদার নাসরুল্লাহ্ খান এবং সরদার আমানুল্লাহ্ খানের হস্তক্ষেপে আমীর হাবীবুল্লাহ্

Dhaka University Institutional Repository

খান তাঁদেরকে গ্রেফতার করতে সাহস পায় নি। তবে ১ রমযান ১৩৩৫ হিজরী মুতাবিক জুন ১৯১৭ সালে মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ও তাঁর সহচরবৃন্দকে একটি সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে নজরবন্দী করে রাখা হয়।[২১১] এ সম্পর্কে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন, "হিন্দুস্থানে যখন ব্যাপক হয়রানী এবং গ্রেফতারী তৎপরতা আরম্ভ হয় তখন আমি ভীষণ চিন্তায় পড়ে যাই। অবস্থা কোন দিকে মোড় নিবে কিছুই যেন বুঝতে পারছি না। দিনের পর দিন ক্রমশ আমাদের অবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। ঘটনাক্রমে একদিন হযরত শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সাথীদের গ্রেফতারের খবর শুনতে পেয়ে অবস্থার ভয়াবহতা সম্পর্কে বুঝার আর কোন কিছু বাকী রইল না। এদিকে কাবুলের পরিস্থিতিও বেশী সন্তোষ জনক ছিল না। বরং ক্রমেই অবস্থা অবনতির দিকে যেতে লাগল।"[২১২] তিনি আরও বলেন, "আমাদের ২০/ ২৫ জনকে একটি সংকীর্ণ ঘরে নজরবন্দী করে রাখা হয়।"[২১৩] নজরবন্দী সময়ও সিন্ধী আন্দোলনের কাজকর্ম থেকে নিষ্ক্রীয় থাকেন নি; বরং নিজের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা চালিয়ে যান। পরবর্তীতে সিন্ধীকে জালালাবাদে স্থানান্তর করা হয়।[২১৪] অপরদিকে মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূর আনসারী এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আযাদ উপজাতি এলাকায় চলে যান। ১৯১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারীতে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান আততায়ীর গুলীতে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাওলানা সিন্ধী ও তাঁর সহচরবৃন্দ নজরবন্দ থাকেন।[২১৫]

আমীর হাবীবুল্লাহ্ নিহত হওয়ার পর সরদার আমানুল্লাহ্ খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় মাওলানা সিন্ধী ও তাঁর সহচরবৃন্দ আনুমানিক এক বছর নজরবন্দ থাকার পর মুক্ত হন এবং তিনি তাঁদেরকে জালালাবাদ থেকে কাবুলে ডেকে এনে সম্মান প্রদর্শন করেন। সরদার আমানুল্লাহ্ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর নজরবন্দী থাকা অবস্থায়ও মাঝে মাঝে তাঁকে ডেকে এনে আলাপ আলোচনা করতেন এবং একবার তিনি তাঁকে আর্থিকভাবে সাহায্যও করেছিলেন।[২১৬]

'রেশমী রুমাল আন্দোলন' কথাটি দ্বারা সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সংবাদ আদান প্রদানের কাজ রেশমী রুমালের মাধ্যমে করা হত। মুজাহিদগণ চিত্র শিল্পীর মাধ্যমে রেশমী রুমালে নিজের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য চিত্রায়ণ করে অপর কেন্দ্র বা অপর মুজাহিদের নিকট পাঠাতেন। কিন্তু ইতিহাস গবেষকগণের অনেকের মতে বিষয়টি এমন নয়; বরং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমূহ কার্যক্রম, কর্মসূচির মধ্যে রেশমী কাপড় একবারই ব্যবহৃত হয়েছে। যা মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর মাধ্যমে হয়েছে। সিন্ধী কাবুলে অবস্থানকালে মুজাহিদ আন্দোলনের কার্যক্রম ও তাঁদের কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে মক্কায় অবস্থানরত শায়খুলহিন্দকে অবগত করতে রেশমী কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করেছিলেন। যাকে ইতিহাসে 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়, শায়খুলহিন্দ কর্তৃক সংগৃহীত 'গালিবনামা' ও 'আনওয়ারনামা' এবং সেগুলোর ফটোকপি ভারতবর্ষে ও অন্যান্য স্থানে বিলি করার ক্ষেত্রে কাগজ ব্যবহার করার দ্বারা। এতে ধারণা করা হয় যে, রেশমী রুমালের ব্যবহার শুধুমাত্র একবারই হয়েছে; যা মাওলানা সিন্ধী করেছিলেন। শায়খুলহিন্দ মাহমুদ হাসান-এর শাগরিদ শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী বলেন, "মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারতবর্ষে যে

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে 'রেশমী রুমাল' বা 'রেশমী চিঠি আন্দোলন' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।"[২১৭]

রাউলাট রিপোর্ট ও সিন্ধীর ব্রিটিশ বিরোধী কর্মতৎপরতা:

জর্জ রাউলাট কমিটির রিপোর্টেও মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক এবং রেশমী রুমালপত্র বা রেশমী রুমাল আন্দোলন বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে এর কারণ তদন্তের জন্য ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার 'জর্জ রাউলাট' নামক একজন ইংরেজ বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ভারতে পাঠানো হয়। এ কমিটি ভারতের অনেক গুপ্ত রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে এক দীর্ঘ তদন্ত রিপোর্ট পেশ করে। 'রাউলাট রিপোর্ট' নামে খ্যাত ঐ রিপোর্টের ১৬৪ অনুচ্ছেদে 'রেশমী চিঠি আন্দোলন' (Silk letter movement) সম্পর্কে বলা হয়: সে রেশমী চিঠির ঘটনা সর্বপ্রথম উৎঘাটিত হয় ১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে। উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, রেশমী চিঠি আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য ছিল, একই সাথে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গোলযোগ এবং ভারতের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ভারত থেকে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটানো। যা দেশে ইসলামী আন্দোলন হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। আন্দোলনকে সফল করার জন্য মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ ১৯১৫ সালের আগস্টে তাঁর তিজন সাথীসহ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন। সাথী তিনজন হলেন- আবদুল্লাহ্, ফাতেহ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ আলী। মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ছিলেন শিখ ধর্মান্তরিত মুসলমান। উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ মাদ্‌রাসা হতে ধমীয় শিক্ষালাভ করেন। দেওবন্দে তিনি কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের বিষ ছড়িয়ে দেন। যাদের উপর তিনি নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দেওবন্দ মাদ্‌রাসার দীর্ঘ দিনের প্রধান শিক্ষক মাওলানা মাহমূদ হাসান।[২১৮] মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ চেয়েছিলেন, বিশ্ববিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্‌রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য আলিমদের নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী এক বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন (প্যান ইসলামীজম) গড়ে তোলা। কিন্তু তাঁর এ পরিকল্পনা দেওবন্দের মুহতামিম এবং পরামর্শসভার সদস্যদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। তারা তাঁকে ও তাঁর সহযোগীকে প্রত্যাখান করেন। মাওলানা মাহমূদ হাসান সর্বদা দেওবন্দে অবস্থান করতেন এবং মাওলানা সিন্ধীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মাহমূদ হাসানের বাড়িতে গোপন বৈঠক বসত। আরো জানা গেছে যে, সীমান্তের কিছু লোকজন এসে এখানে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মাওলানা মাহমূদ হাসান, মুহাম্মদ মিয়াঁ নামক এক ব্যক্তি ও তাঁর আরো কিছু বন্ধুসহ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্‌র পরামর্শক্রমে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। কিন্তু এ লোকটি উত্তর দিকে যাত্রার পরিবর্তে আরব দেশের হেযাযে পৌঁছেন। উবায়দুল্লাহ্ ভারত ত্যাগ করার পূর্বে দিল্লীতে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং দু'টি পুস্তক প্রকাশ করেন। সেগুলোতে তিনি বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়ে ভারতের মুসলমানদেরকে জিহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এ ব্যক্তিটি (মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী) তাঁর অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে ও মাওলানার (শায়খুল হিন্দ) প্রধান উদ্দেশ্য

Dhaka University Institutional Repository

ছিল, একই সময়ে ব্রিটিশ ভারতের উপর বহির্দেশ থেকে হামলা চালাবে এবং ভারতের অভ্যন্তরে মুসলমানগণও বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেবে। যে যুদ্ধ জিহাদকে তারা বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তার বিবরণ হল: উবায়দুল্লাহ্ এবং তাঁর সঙ্গীগণ প্রথমে ভারতের মুজাহিদদের সাথে সাক্ষাত করেন। অতঃপর কাবুলে পৌঁছেন। সেখানে তিনি তুর্কী-জার্মান মিশনের *সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিছু দিন পর তাঁর* দেওবন্দের সাথী মৌলবী মুহাম্মদ মিয়াঁ আনসারী তাঁর সাথে যোগদেন। যিনি মাওলানা মাহমূদ হাসানের সাথে মক্কায় গমন করেছিলেন এবং সেখান থেকে জিহাদের ঘোষণাপত্র নিয়ে ১৯১৬ সালে দেশে ফিরে আসেন। সেটিকে মাওলানা (শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান) হেযাযের তুর্কী সামরিক অফিসার গালিব পাশার নিকট থেকে অর্জন করেছিলেন। ঐ দলিলপত্র 'গালিবনামা' হিসেবে প্রসিদ্ধী লাভ করেছিল। মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ 'গালিবনামা' সম্বলিত প্রচারপত্রগুলো ভারতের অভ্যন্তরে ও সীমান্ত এলাকার গোত্রগুলোর মধ্যে বিতরণ করেন। উবায়দুল্লাহ্ ও তাঁর সহযোগীরা ব্রিটিশ ভারত সরকার উৎখাতের পর ভারতে একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের নীলনকশা প্রণয়ন করেন। সে অস্থায়ী সরকারের পরিকল্পনা মতে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ এর প্রেসিডেন্ট হবার কথা ছিল। তিনি (মহেন্দ্রে প্রতাপ) হলেন, একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের উদ্যমী সন্তান। ১৯১৪ সালের শেষের দিকে তাকে ইটালী, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণ করার পাসপোর্ট প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি সরাসরি জেনেভায় চলে যান এবং সেখানে নিন্দিত নেতা হরদয়ালের সাথে সাক্ষাৎ করেন। হরদয়াল তাকে নিয়ে জার্মান কাউন্সিলে যান। সেখান থেকে তিনি বার্লিন আসেন। বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে, তিনি জার্মানীদেরকে নিজের পরিকল্পনা বিষয়ে প্রভাবান্বিত করেছেন। তাকে একটি বিশেষ মিশনের সদস্য করে কাবুলে পাঠানো হয়। মাওলানা উবায়দুল্লাহ্কে ভারতমন্ত্রী (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), মাওলানা বরকতউল্লাহ্কে প্রধানমন্ত্রী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মাওলানা বরকতউল্লাহ ছিলেন কৃষ্ণ বরমার বন্ধু এবং আমেরিকান গদর পার্টির সদস্য। তিনি বার্লিন হয়ে কাবুলে আসেন। তিনি ছিলেন ভূপাল রাজ্যের একজন কর্মকর্তার সন্তান। ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং জাপান ভ্রমণ করেন। টোকিওতে ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। সেখানে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী 'ইসলামী ভ্রাতৃত্ব' (The Islamic fraternity) নামে একটি মুখপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু এর প্রচার জাপানীদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় এবং তাকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তখন তিনি জাপান ত্যাগ করে আমেরিকান গদর পার্টির সদস্যগণের সাথে যোগদেন। ১৯১৬ সালের শুরুতে জার্মান মিশন তাদের উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করে। তবে ভারতীয়রা (প্রতিনিধিগণ) সেখানে থেকেই গেলেন। কাবুলের প্রাদেশিক সরকার রাশিয়ার জার সরকার ও তুর্কীস্তান সরকারের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। যেগুলোতে (পত্র) রাশিয়াকে আহবান করা হয়েছিল, ব্রিটিশের পক্ষ ত্যাগ করতে এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের পতন ঘটাতে তাদেরকে সাহায্য করতে। পত্রসমূহে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের স্বাক্ষর ছিল। পরবর্তীতে এ পত্রসমূহ ব্রিটিশের হস্তগত হয়। জার সরকারের নিকট দেয়া পত্রটি ছিল স্বর্ণের প্লেটে খচিত। এর একটি প্রতিচিত্র আমাদেরকেও দেখানো হয়েছে। প্রাদেশিক সরকারের একটি প্রস্তাব ছিল, তুর্কী সরকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। সে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ তাঁর পুরনো বন্ধু মাওলানা মাহমুদ হাসান (শায়খুল হিন্দ)- এর নামে পত্র লিখেন। ঐ পত্রটি অপর একটি পত্রের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে যেটি ১৯১৬ সালের ৯ জুলাই (৮ রমযান) মুহাম্মদ মিয়াঁ আনসারী লিখেছিলেন। পত্র দু'টিকে একসাথে করে একটি খামে ভরে হায়দারাবাদের শেখ আবদুর রহীম সিন্ধীর নিকট পাঠানো হয়। শেখ আবদুর রহীম তখন থেকে আত্মগোপন করে আছেন। চিঠির খামের উপর লিখিতভাবে তিনি শেখ আবদুর রহীমকে আবদার করেছিলেন, ঐ পত্রটি যেন কোন *নির্ভরযোগ্য হাজী সাহেবের মাধ্যমে মক্কায় মাওলানা মাহমূদ হাসানের নিকট পাঠানো হয়। যদি* নির্ভরযোগ্য কোন হাজী সাহেব না পাওয়া যায় তাহলে শেখ সাহেব নিজেই যেন এ কাজটি সম্পন্ন করেন। মাহমূদ হাসানের নিকট পাঠানো পত্রটি ব্রিটিশের হস্তগত হয়েছিল। সেটি আমরাও দেখেছি। ঐ পত্রটি পরিষ্কার অক্ষরে হলুদ রেশমী রুমালে লিখিত ছিল। মুহাম্মদ মিয়াঁর পত্রটিতে এখানে (কাবুল) জার্মান ও তুর্কী মিশনের আগমন, জার্মান মিশনের প্রত্যাবর্তন এবং তুর্কী মিশন এখানেই অবস্থান করছে বলে লেখা ছিল। কাবুলে অবস্থিত দেশত্যাগী মুহাজির ছাত্রদের ঘটনা ও গালিবনামা প্রচারের আলোচনাও ছিল। এছাড়া অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং হিজবুল্লাহ্ সৈন্যবাহিনী গঠন বিষয়েও উল্লেখ ছিল। এই হিজবুল্লাহ্ সৈন্যরা হবে ভারতবাসী। এর কাজ হবে মুসলিম দেশ ও শাসকগণের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টির চেষ্টা করা। মাওলানা মাহমূদ হাসানের নিকট আবেদন করা হয়েছিল, তিনি যেন তুরস্কের উসমানী খিলাফতের নিকট এসব বিষয়ে অবহিত করেন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ্র পত্রে হিজবুল্লাহ গঠনের পূর্ণচিত্র বর্ণিত ছিল। এই হিজবুল্লাহর সদর দপ্তর মদীনায় স্থাপনের ইচ্ছা ছিল। মাওলানা মাহমূদ হাসানকে এর প্রধান সেনাপতি বানানোর কথা ছিল। অন্যান্য সদরদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে কনস্টান্টিনোপল, তেহরান ও কাবুলে। কাবুলের সেনাপতি হবেন, উবায়দুল্লাহ্ নিজে। এর তালিকায় তিনজন পৃষ্ঠপোষক, বারজন জেনারেল এবং কয়েকজন উচ্চ পদস্থ সৈনিকের নাম উল্লেখ ছিল। লাহোরের ছাত্রদের মধ্যে একজন মেজর জেনারেল, একজন কর্নেল এবং ছয়জন ল্যাফটেন্যান্ট কর্নেল হবার কথা ছিল। এই উচ্চ পদের জন্য যে কয়জন ব্যক্তির নাম ছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশের সাথে নিয়োগ বিষয়ে কোন সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ করা হয় নি। কিন্তু এসমূহ সংবাদ ও গঠনাদি যা রেশমীপত্রে দেয়া হয়েছিল, তা উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মনঃপূত হয় এবং তারা সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে মাওলানা মাহমূদ হাসান এবং তার চারজন বন্ধু ব্রিটিশের হাতে গ্রেফতার হন। তারা এখন ব্রিটিশের নিকট যুদ্ধবন্দি হিসেবে গ্রেফতার আছেন। গালিবনামায় দস্তখতকারী গালিবপাশা বিদ্রোহী হিসেবে তাদের সাথে বন্দি আছেন। গালিবপাশা একথা স্বীকার করেছেন যে, মাহমুদ হাসানের পার্টি আমার নিকট একটি আবেদনপত্র রেখে ছিল, তাই আমি এর উপর দস্তখত করেছি। এ পত্রের উল্লেখযোগ্য অংশের অনুবাদ হল: এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মুসলমানগণ নিজেরা সব ধরনের যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তুর্কী সৈন্য বাহিনী এবং ইসলামী মুজাহিদগণ ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে। সুতরাং হে মুসলমান ভাইগণ! তোমরা যে খ্রীষ্টান রাজশক্তির কবলে পতিত হয়েছ, তার উপর হামলা কর। দুশমনদের নিঃশেষ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অতিশীঘ্র চালিয়ে যাও। এদের উপর নিজেদের ঘৃণ্য শত্রুতার বিষয়টি জানিয়ে দাও। তোমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, মৌলবী মাহমূদ হাসান আপেনদি পূর্বে যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তিনি আমাদের নিকট

Dhaka University Institutional Repository

এসেছেন এবং আমাদের পরামর্শ কামনা করেছেন। এক্ষেত্রে আমরা তাঁর সাথে সম্মতি প্রকাশ করছি এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছি। যদি সে তোমাদের নিকট আসে, তাহলে তার উপর ভরসা রাখবে এবং তাঁকে অর্থ, জনবল ও সব ধরনের প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করবে।[২১৯]

শায়খুল হিন্দের গ্রেফতার:

'আন্ওয়ারনামা' ও 'গালিবনামা' ভারতীয় উপমহাদেশ, আযাদ উপজাতি এলাকা ইয়াগিস্তান এবং আফগানিস্তানে ব্যাপকভাবে প্রচার করার পর শায়খুলহিন্দ স্থির করেন যে, যেকোন উপায়ে হোক ইয়াগিস্তান যেতে হবে এবং সেখান থেকে উপমহাদেশ ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে পূর্ণোদ্যমে সক্রিয়ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু হিযায থেকে শেষ বিদায়ের পথে গালিব পাশার সাথে আরও বিশেষ জরুরী পরামর্শের একান্ত প্রয়োজন। এজন্য শায়খুলহিন্দ স্বীয় সহচর সমভিব্যাহারে মদীনা থেকে মক্কায় পৌঁছেন।

হিযাযের তুর্কী প্রতিনিধি গালিব পাশা তখন তায়িফে অবস্থান করছিলেন। তাই শায়খুলহিন্দ অতি সতর্কতার সাথে তায়িফ অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর সাথে ছিলেন– শায়খুল ইসলাম মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী, মাওলানা উযায়রগুল ও মাওলানা মদনীর ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়াহীদ আহ্মদ মদনী। ১৩৩৪ হিজরীর ২৪ রজব তারিখে তাঁরা তায়িফ পৌঁছে গালিব পাশার সাথে সাক্ষাত করে কতিপয় জরুরী বিষয়ে পরামর্শ করেন। আরও কতিপয় জরুরী বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি তথায় অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে ব্রিটিশের কুমন্ত্রণায় ও প্রলোভনে শরীফ হুসাইন তুর্কী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৯ শাবান মক্কা, জিদ্দা, য়্যাম্বু এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে তুর্কীদের সামান্য সৈন্যকে পরাস্ত করে জিদ্দা তাঁর দখলে নিয়ে আসে।[২২০]

শরীফ হুসাইন বিদ্রোহ করে আরবদেশ গ্রাস করার কারণে ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ ব্রিটিশ সরকারের রিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও হিযাযের বর্তমান শরীফ হুকুমতের নিন্দাবাদ আরম্ভ করে এবং তুর্কী খিলাফতের পক্ষে জোরালো আন্দোলন চালায়।[২২১]

উসমানীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে আরবদের এই বিদ্রোহ এবং শরীফ হুসাইনের ষড়যন্ত্র পুরো পরিস্থিতি পাল্টে দেয়। শরীফ হুসাইনের বিদ্রোহ ঘোষণা ও ক্ষমতা গ্রহণের পর গালিব পাশা, শায়খুল হিন্দ ও শায়খুল ইসলামকে তায়েফে অবরুদ্ধ করে। প্রায় দেড় মাস অবরুদ্ধ থাকার পর তাঁরা মক্কা শরীফে ফেরার সুযোগ পান।[২২২] এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজগণ মনে করে হিযাযের বর্তমান শরীফ হুকুমতকে সমর্থন করে তুর্কী খিলাফত ও তুর্কীবাসীদের বিরুদ্ধে মক্কা ও মদীনার আলিমগণের স্বাক্ষরিত ফতওয়া ব্যাপকভাবে ভারতের সর্বত্র প্রচার একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় এ আন্দোলন প্রতিরোধ করা অসম্ভব ও আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। সুতরাং কর্নেল ওয়ালসন ও কর্নেল লরেন্সের ইঙ্গিতে খান বাহাদুর মুবারক আলী আওরঙ্গাবাদী কতিপয় আলিমের মাধ্যমে তুর্কী খিলাফত ও তুর্কীবাসীদেরকে কাফির ও খিলাফতের অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন করে শরীফ হুসাইনের তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে হিযায দখল করা যথার্থ বলে একটি ফতাওয়া সঙ্কলন করান। এ ফতাওয়ায় শরীফ হুসাইনের অনুগত আলিমগণ স্বাক্ষর করেন। পক্ষান্তরে, হিজাযের অধিকাংশ আলিম এ ফতাওয়া সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শাইখুলহিন্দ মাহমূদ হাসানের সমীপে ফতাওয়াটি উপস্থাপন করা হলে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন।[২২৩] ফতাওয়াটি শায়খুলহিন্দ প্রত্যাখান করায় রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত করা হয়। শরীফ হুসাইন জেদ্দায় গমন করলে কর্নেল ওয়ালসন ও কর্নেল লরেন্স প্রমুখের পরামর্শে ফতাওয়া প্রত্যাখানকারীদের নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করা হয়।[২২৪]

শায়খুলহিন্দ সহচরবৃন্দের অনুরোধে মাওলানা মদনীর ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা ওয়াহীদ আহম্মদকে সঙ্গে নিয়ে আত্মগোপন করেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, আত্মগোপন করে থাকলে কিছুদিন পরে তাঁকে হিজাযের বাইরে যেকোন স্থানে পাঠিয়ে দেয়া যাবে। অন্যদেরকে গ্রেফতার করলেও তারা তাঁদেরকে পরে ছেড়ে দেবে। এদিকে ১৩৩৫ হিজরী সালের ২২ সফর সোমবার দিন মাওলানা মদনীকে গ্রেফতার করা হয়। গোয়েন্দা পুলিশ শায়খুলহিন্দকে গ্রেফতার করার জন্য তার বাসস্থানে গমন করে তাঁকে পায় নি। তাঁকে বহু অনুসন্ধান করে না পাওয়ার পর তাঁর বাসস্থানে অবস্থানরত মাওলানা হাকীম নুসরত হুসাইন ও মাওলানা উযায়রগুলকে শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা তাঁর সম্পর্কে কিছু জানেন না বলে অবহিত করেন। ইশার সময় পর্যন্ত শায়খুলহিন্দ আগমন না করলে শরীফ হুসাইন সেদিন মাগরিবের পরে শায়খুলহিন্দের সাথীদ্বয় মাওলানা উযারাগুল এবং মাওলানা সায়্যিদ হাকীম নুসরত হুসাইনকে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান শরীফ হুসাইনের এই পৈশাচিক আদেশ অবহিত হয়ে স্বেচ্ছায় বন্দি হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যেন কারো প্রতি কোন অভিযোগ উত্থাপিত না হয়, এ জন্য তিনি ইশার সময়ে ইহরামের পোশাক পরিধান করে তালবিয়া পরে কাবা গৃহে প্রবেশ করেন। সহচরদ্বয় অবশ্য গুলির মুখ থেকে রক্ষা পেয়ে গেছেন; কিন্তু শরীফ হুসাইনের আদেশক্রমে শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচর মাওলানা উযারাগুল, মাওলানা হাকীম নুসরত হুসাইন এবং মাওলানা ওয়াহীদ আহমদ মদনীকে গ্রেফতার করে জেদ্দায় ব্রিটিশ সরকারের হাতে অর্পণ করা হয় (ডিসেম্বর ১৯১৬ সাল)[২২৫] প্রায় এক মাস হেযাযে থাকার পর তাঁদেরকে মাল্টায়[২২৬] পাঠিয়ে দেয়।[২২৭] সঙ্গে তাঁর চারজন সঙ্গীও। মাল্টা ছিল তখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের হেডকোয়ার্টার। জার্মান প্রিন্স থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন এলাকার ব্রিটিশ প্রতিপক্ষের বড় বড় নেতৃবৃন্দকে ব্রিটিশরা তখন মাল্টায় বন্দি করে রেখেছিল। শায়খুল হিন্দ মাল্টায় বিশ্বনেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনার সুযোগ লাভ করেন এবং তাঁদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তারা তাঁকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য পরামর্শ দেন।[২২৮]

আমীর আমানুল্লাহ্ খানের আমলে সিন্ধীর কর্মতৎপরতা:

আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান ব্রিটিশ সমর্থক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ভাই নসরুল্লাহ খান, সরকারি কর্মকর্তা ও জনগণ ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বের স্বপক্ষে। আমীর হাবীবুল্লাহ্ ১৯২০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি জালালাবাদের নিকট লাগনাম জেলার 'গেসে' নামক কিল্লায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে তাঁর ভাই নসরুল্লাহ্ খান জালালাবাদে নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু নিহত হাবীবুল্লাহ্ খানের পুত্র আমান উল্লাহ্ খান সেনাবাহিনীর সহায়তায় নসরুল্লাহ্ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

হন। নসরুল্লাহ্ জেলে মারা যান। আমান উল্লাহ খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর সিন্ধীকে কারামুক্ত করেন।[২২৯] আমান উল্লাহ অন্যান্য স্বাধীনতাকামীদের উপরও শিথিলতা প্রদর্শন করেন, সিন্ধী ও তাঁর সহযোগীদের সাহায্য করেন। সিন্ধী এ শিথিলতা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তার দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য নেয়া সম্ভব হবে। সিন্ধী অনুমান এক বছর আট মাস *কারাবরণ করেন।*[২৩০] *সিন্ধী আমান উল্লাহ্ খানের শাসনামলে প্রায় চার বছর কাবুলে অবস্থান* করে অস্থায়ী ভারত সরকারের জন্য যেমনি কাজ করে যাচ্ছিলেন, তেমনি কাবুল সরকারের হিতসাধনে প্রয়াসী হন। আমান উল্লাহ খানের আমলে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী বিকল্পরূপে (অস্থায়ী ভারত সরকারের) সেখানে (কাবুলে) 'অলইন্ডিয়া কংগ্রেস'এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। সেটি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে কংগ্রেসের প্রথম শাখা। ড. নূর মুহাম্মদ ছিলেন এর সর্বেসর্বা। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীই এর প্রেসিডেন্ট এবং যাফর হাসান[২৩১] এর সেক্রেটারি ছিলেন। সে সময় ড. আনসারী ছিলেন 'অলইন্ডিয়া কংগ্রেস'এর সভাপতি। তাঁর সুদৃষ্টির ফলে এ শাখাটি গয়া অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করে।[২৩২]

আমীর আমানুল্লাহ্ খান ছিলেন স্বাধীনচেতা লোক। আফগানিস্তানের উপর ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হস্তক্ষেপ ও মুরব্বীয়ানা তাঁর কাছে ভাল লাগতো না। তাই তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত *হওয়া মাত্রই আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। ফলে ব্রিটিশ ভারতের সাথে তাঁর যুদ্ধ* বাঁধে (মে-জুন ১৯১৯)।[২৩৩] ইতিহাসে একে তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ বলা হয়। আমীর আমান উল্লাহ খান যুদ্ধের সূচনা করলে মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী তাঁর জুনূদুল্লাহ এবং ভারতীয় বিপ্লবী বাহিনীসহ আফগান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তারা আফগান যোদ্ধাদের সাথে কাঁদে কাঁদ মিলিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সে যুদ্ধে দেশের পূর্বাঞ্চলে আফগান সরকার কিছুটা নতি স্বীকার করলেও বিজয় আমানউল্লাহ খানের ভাগ্যেই জোটে। সেনাপতি নাদের খানের নেতৃত্বে আফগান বাহিনী কোহাট পর্যন্ত দখল করে। তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের বিবরণ দিতে আনিস সিদ্দিকী বলেন: "বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও পর্যাপ্ত গোলাবারুদের অধিকারী হয়েও স্বল্পসংখ্যক আফগান সৈন্যের কাছে তারা যে পরাজিত হতে পারে, তা ইংরেজ সেনাপতিগণ বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁরা যখন খাইবার পাশের অনতিদূরে অবস্থান করে আফগান বাহিনীর পরাজয় এবং আমানুল্লাহর নতি স্বীকারের সংবাদ শ্রবণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, তখন তাঁদের নিকট পৌঁছল পরাজয়ের মর্মন্তুদ বার্তা। তবু তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। বিপুল বিক্রমে পূনর্বার আক্রমণ করার জন্য সে স্থান থেকে সেনাধ্যক্ষগণ নতুন আদেশ জারী করলেন। যুদ্ধরত ইংরেজ সৈনিকগণ প্রাণভয়ে সে আদেশ প্রতিপালন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু পরবর্তী দিবসে বাধ্য হয়ে তারা যখন নবআয়োজনে আবার আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হলো, তখন খোসত থেকে আগত পার্বত্য যুদ্ধে বিশেষভাবে পারদর্শী আফগান বাহিনী তাদের নাস্তানাবুদ করে দিলেন। চরমভাবে পরাজিত হয়ে পালায়ন পথে অসংখ্য ইংরেজ সৈনিকের অকাল মৃত্যু হলো। বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার আমানুলাহর কাছে নতি স্বীকার করলো। তারাই প্রথম সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো। সন্ধির ব্যাপারে আমানুল্লাহ নাদির খানের পরামর্শ গ্রহণ করলেন।[২৩৪] যুদ্ধে ভারতীয় বিপ্লবীরা কিছু জনপদ ও ইংরেজ সৈন্য ছাউনী দখল করেন এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার গঠন করেন। তবে এ স্বাধীনতা বেশী দিন স্থায়ী হয় নি।[২৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৯ সালের ৮ আগস্ট রাওয়ালপিন্ডিতে বৃটিশ ভারতের গভর্নমেন্টের সাথে আমানুল্লাহ্ খান সরকারের সন্ধি হয় এবং ফলে বৃটিশ গভর্নমেন্ট আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেনেন।[২০৬]

তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে মাওলানা সিন্ধী ও তাঁর জুনূদুল্লাহ'র অংশগ্রহণ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য আফগান সরকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। ঐ যুদ্ধে সিন্ধীর ভূমিকা বিষয়ে তৎকালীন আফগানিস্তানের ব্রিটিশ দূত লর্ড হামফ্রে বলেছিলেন, "এ বিজয় আফগানিস্তানের নয়; এ বিজয় উবায়দুল্লাহ্র।"[২০৭] আফগান সরকারও মাওলানা সিন্ধী ও তাঁর সহযোগীদের সক্রিয় ও সফল ভূমিকায় স্বীকৃতি দেন। তখন থেকেই আমীর আমানুল্লাহ্ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিন্ধীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে, সিন্ধীও আফগান গভর্নমেন্টকে নিজ গভর্নমেন্ট বলে মনে করতেন এবং আফগানিস্তানের মঙ্গল সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।[২০৮] নিজের দেশের মত ভালবাসতেন। আন্তর্জাতিক চাপ না থাকলে কাবুলে থেকেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যেতেন।[২০৯] এ মর্মে সিন্ধীর ভাষ্য হলো: "আমীর আমানুল্লাহ্ খানের শাসনামলে আমি কিছু দিন, বলতে গেলে, নিজ গভর্নমেন্টেরই কতেকটা ঝলক দেখেছি। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীদের উপর আমানুল্লাহ্র যেরূপ আস্থা ছিল, আমার উপর প্রায় অনুরূপ আস্থাই তাঁর ছিল। আমি তাঁর প্রাইভেট আসরে গেলে তিনি আমার প্রতি ঐরূপ শ্রদ্ধাই জ্ঞাপন করতেন, যা তিনি তার খান্দানের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ ও জাতীয় মুরব্বীদের প্রতি প্রদর্শন করতেন। আমার কোন পরামর্শই তিনি উপক্ষো করেন নি। তাই আমি আফগানিস্তানের ভবিষ্যত গড়ার কাজে কোন ত্রুটি করি নি।" উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী আরও বলেন "যদি নওজোয়ান বন্ধুদের ভবিষ্যৎ আমার সামনে না থাকত, অস্থায়ী সরকারের কোন কোন কাজে আমার অনিবার্য পরাজয় না হতো, তবে আমি বোধ হয় আমীর আমানল্লাহ্ খানের শাসন ছেড়ে যেতে রাজী হতাম না।"[২৪০]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা, 'আযাদী আন্দোলনের বীরসেনানী মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, দারুল কুরআন শামসুল উলূম মাদ্‌রাসা, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা, ৩১ আগস্ট ১৯৯২, পৃঃ ৭।

২। আরশাদ, আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৬।

৩। মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

৪। আরশাদ, আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৬।

৫। মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

৬। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী : জীবন ও কর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯২, পৃঃ ২০।

৭। সারওয়ার মুহাম্মদ, 'খুদবাত-এ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী', সিন্ধসাগর একাডেমী, করাচী-১৯৪৪, পৃঃ ৬৬।

৮। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০- ২১।

৯। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭। আরশাদ, আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৭।

১০। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

১১। ফুয়ুযুর রহমান, মাশাহীর, উলামা-এ দেওবন্দ, লাহোর, আল-মাকতাবাতুল আযিযিয়্যা, ১৯৭৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৭।

১২। ইকরাম, এস, এম, 'মওজে কাওসার', তাজ কোম্পানী, দিল্লী, ১৯৯১, পৃঃ ২০৩।

১৩। **মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক:** পাকিস্তানের করাচীর অন্তর্গত খিড্ডাতে ২৫ মুহাররম ১২৯১ হিজরী মুতাবিক ১৫ মার্চ শনিবার ১৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা আবদুল্লাহ্। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা পিতার নিকট থেকে লাভ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর পিতার কর্তৃক স্থাপিত মাদ্‌রাসা মাযহারুল উলূমে মাওলানা আহ্‌মদ দীনের নিকট পাঁচ বছর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থ শিক্ষা লাভ করেন। ১৩০৮ হিজরী সনে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর পরামর্শক্রমে তাঁর পিতা তাঁকে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' অধ্যয়নের জন্য দেওবন্দে পাঠান। ৫ যিলকাদ ১৩১১ হিজরী মুতাবিক ১০ মে ১৮৯৪ সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং ১৩১৩ হিজরী সনে শায়খুলহিন্দ মাহমুদ হাসানের নিকট 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' অধ্যয়ন করে চূড়ান্ত ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি 'জমীঅতুল আন্‌সার'- এর সদস্য হয়ে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'জমীঅতুল আনসার' এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং জমীঅতুল উলামায়ে সিন্দ-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ৮ জুলাই ১৯২১ সালে অল ইন্ডিয়া খিলাফত কনফারেন্সের সপ্তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হন। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে 'জমইয়াতে উলামায়ে ইসলাম' স্থাপিত হয় এবং তিনি এর সভাপতি হন ও শাওয়াল ১৩৭২ হিজরী মুতাবিক ১৮ জুন ১৯৫৩ সালে বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টায় মৃত্যুবরণ করেন। (ফুয়ুযুর রহমান, মাশহীর 'উলামা-এ দেওবন্দ', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৭- ৫২২।

১৪। **আবু মুহাম্মদ আহমদ:** ২০ রমযান ১২৬৮ হিজরী মুতাবিক ৮ জুলাই ১৮৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃভূমি জেহলম জেলার পিণ্ডদাদন থানার 'বুল্যা' নামক স্থানে অবস্থিত। পরে তার পিতা চাক্‌ওয়াল শহরে স্থানান্তরিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তিনি ১২৭৪ হিজরী মুতাবিক ১৮৫৮ সালে তাঁর পিতার নিকট লেখাপড়া আরম্ভ করে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন সমাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

দারুল উলূম দেওবন্দে শায়খুলহিন্দ মাহমুদ হাসানের নিকট থেকে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' এবং গাঙ্গুহী মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গুহী এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। ১৮৮২ সালে হজ্বক্রিয়া সমাপন করেন। তিনি বাগদাদের বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত নকীব সালমানের নিকট বায়াত হয়ে খিলাফত লাভ করেন। তিনি উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর বিশিষ্ট বন্ধু এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় সদস্য ছিলেন। আযাদী আন্দোলন মিশনের পাঞ্জাব শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি শত সহস্র ব্যক্তিকে উক্ত আযাদী মিশনের সদস্য বানান। ১৯০৯ সালে দেওবন্দে অবস্থানকালে তিনি 'জমীঅতুল আন্সার'-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি ফওজের কর্নেলও ছিলেন। ৮ মে ১৯২৯ সালে সুবহে সাদিকের পূর্বক্ষণে ইন্তিকাল করেন এবং চাক্ওয়ালে তাঁর পারিবারিক কবরস্থানে সমাধিস্থ হন। (ফয়ূযুর রহমান, মাশাহীর, 'উলামা-এ দেওবন্দ', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬- ১৮।)

১৫। মুফতী আর্যীযুর রহমান বিজনৌরী, তাযকিরা শায়খুলহিন্দ, মদনী দারুত তালীফ, বিজনৌর, ১৯৬৫, পৃঃ ১৪৭।

১৬। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

১৭। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১-২২।

১৮। হাবিবুর রহমামান, মওলানা, 'জমীঅতুল আনসার কে মাকাসিদ', মাসিক আল-কাসিম, দেওবন্দ, দারুল উলূম, ১৩২৯ হিঃ, রবীউল আওয়াল সংখ্যা পৃঃ ৬।

১৯। হাবীবুর রহমান, মওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

২০। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

২১। হাবীবুর রহমান, মওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮-১০।

২২। হাবীবুর রহমান, মাওলানা, মাসিক আল্-কাসিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪- ১৫।

২৩। হাবীবুর রহমান, মাওলানা, 'জমীঅতুল আনসারকে মাকাসিদ', মাসিক আল-কাসিম (দেওবন্দ দারুল উলূম, ১৩৩০ হিজরী, জুমাদালউলা সংখ্যা), পৃঃ ৩৫- ৩৭।

২৪। শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসায়ন আহমদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪; মুফতী আযীযুর রহমান বিজনৌরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৪।

(২৫-২৬)। আযীযুর রহমান বিজনৌরী, মুফতী প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩ ও ১৭৪।

২৭। সিরাজ আহমদ, মওলবী, 'জমীঅতুল আন্সার মে মওলানা সিন্ধীকা ইসতিফা', মাসিক আল্-কাসিম, (দেওবন্দ দারুল উলূম, ১৩৩২ হিজরী, সফর সংখ্যা), পৃঃ ৫।

২৮। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪।

২৯। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

৩০। শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, নকশ-এ-হায়াত, ২য় খণ্ড, মাকতাবা-এ দীনিয়াহ্, ১৯৫৩, পৃঃ ১৩৮।

৩১। মুজিবুর রহমান, মওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

৩২। মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

৩৩। **হাকীম আজমল খানঃ** হাকীম আজমল খান, মসীহুল মুলক্ (১৮৬৭- ১৯২৭) ভারত বিখ্যাত ইউনানী চিকিৎসক। দিল্লীর বংশানুক্রমিক হাকীম পরিবারে জন্ম। পিতা হাকীম মুহাম্মদ খান, আরবি, ফারসি ও উর্দু

ভাষা, চিকিৎসা, দর্শন, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার পর কিছু কাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল মজীদ খান প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর তিব্বিয়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। রামপুর নওয়াবের খাস হাকীমরূপে কিছুকাল (১৮৯২- ১৯০২) কাটান। অতঃপর ইরাক ভ্রমণে বের হন। দেশে ফিরে কয়েক বছর দিল্লীর তিব্বিয়া কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ ভ্রমণে বের হন। ফিরে এসে লেডী হার্ডিঞ্জ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। অবার্থ চিকিৎসার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ভারতের বাহিরের দেশসমূহ থেকেও তাঁর নিকট জটিল রোগী আসত। তিনি কংগ্রেস আন্দোলনেও যোগ দেন। ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ড সেভার্স সন্ধিতে স্বাক্ষর করলে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আহ্মদাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ঐ বছর খিলাফত কনফারেন্সেও সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৪ সালে আরবদেশ ভ্রমণ করেন। ১৯২৭ সালে ইউরোপ থেকে ফিরে রামপুর রাজ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হিন্দু-মুসলিম একতায় আজীবন সক্রিয় সমর্থক এবং উভয় সম্প্রদায়ের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মহাত্মাগান্ধী তাঁকে 'ভারতের সেরা ভদ্রলোক' বলে অভিহিত করেন। (বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৬)।

৩৪। **নওয়াব ওয়াকারুল মুলক:** নওয়াব ওয়াকারুল মুলক ছিলেন একজন সমাজসেবক এবং মুসলিম লীগের প্রথম সম্পাদক। উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার এক গ্রামে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মুশতাক হুসাইন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মুরাদাবাদে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কাজ করতে গিয়ে স্যার সৈয়দ আহমদের সংস্পর্শে আসেন এবং আলীগড়ে তার অধীনে কেরানীর চাকুরি গ্রহণ করেন। পরে তিনি সাবজজ মৌলবী সমিউল্লাহ খানের অধীনেও কাজ করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুহসিন-উল-মুলকের সাথে হায়দারাবাদ গমন করেন এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে বিভিন্ন উচ্চপদে সমাসীন হন। হায়দারাবাদ থেকে অবসর গ্রহণের পর আমরোহায় অবসর জীবন যাপন করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আলীগড় কলেজ কমিটির সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি ৭৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে আমরোহায় সমাহিত করা হয়েছে। ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২- ৯৮; বাংলা বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৩৯।)

৩৫। Silken Letters Conspiracy case and who is Who, C. I. D Report, (ইন্ডিয়া অফিস, লন্ডনে সংরক্ষিত রেকর্ড) ফৌজদারী মোকাদ্দমা, ভারতের বড়লাট বনাম উবায়দুল্লাহ্ ও অন্যান্য, ১২১ নং ধারা, মোকদমার আরজীর ১৭ নং বর্ণনা।

৩৬। 'দৈনিক জমীঅত', প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬।

৩৭। মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

৩৮। নকশ-এ হায়াত, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০।

৩৯। **ডাক্তার মুক্তার আহমদ আনসারী:** ডাক্তার মুক্তার আহমদ আনসারী উত্তর প্রদেশের গাজীপুর জেলার ইউসুফপুর গ্রামে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বেনারসে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ইলাহাবাদ কলেজ থেকে এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর হায়দারাবাদের নিযাম কলেজ থেকে বি. এ পাশ করার পর লন্ডন মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস কোর্স সমাপ্ত করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেডিকেল মিশন নিয়ে তুর্কী গমন করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'স্বরাজ পার্টি' এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্টির মধ্যে সমঝোতায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের 'গোল্ডেন জুবিলী' উদ্বোধন করেন। এই স্বনামধন্য মনীষী ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রামপুর থেকে দিল্লী আসার পথে ট্রেনে আকস্মিক ইন্তিকাল করেন। (ইনতিযামুল্লাহ মুফতী 'মাশহারী জঙ্গে আযাদী' মুহাম্মদ সাইদ এন্ড সন্স, করাচী, ১৩৭৬ হি., পৃঃ ২৮৯- ২৯০; নকশ্ এ হায়াত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৯- ২০২।)

Dhaka University Institutional Repository

৪০। **মাওলানা আবুল কালাম আযাদ:** মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দশ বছর বয়সে পিতা মুহাম্মদ খায়রুদ্দীনের সাথে কোলকাতায় আগমন করেন। গৃহে অধ্যয়ন করে মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি আরবি, ফারসি, উর্দু, ইসলামী সাহিত্য, দর্শন, ভূগোল ও ইতিহাস শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন। উর্দু দৈনিক 'আল হিলাল' (প্রথম প্রকাশ ১৯১২) সম্পাদনা করার সময়ে ভারতের ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অন্তরিনাবদ্ধ হন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বহুবার ও বহুবছর কারাজীবন যাপন করেন। ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর সাথে অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি তিনবার ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন (১৯২৩, ১৯৩৯, ১৯৪৬)। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৯৪৭- ১৯৫৮)। তাঁর সময়ে পাকভারতে তিনি ছিলেন আরবি, ফারসী, উর্দু ভাষায় অপ্রাতিদন্দ্বী আলিম হিসেবে স্বীকৃত। তিনি বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পবিত্র কুরআনের একটি উর্দু অনুবাদ ও ভাষ্যতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। (আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলী (অনু), 'ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম' মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, স্বপ্নিল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ভূমিকা দ্রষ্টব্য, বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩)।

৪১। **মাওলানা মুহাম্মদ আলী:** মাওলানা মুহাম্মদ আলী ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের রামপুর রাজ্যে অংশগ্রহণ করেন। আলীগড়ের ছাত্ররূপে এদেশের বি. এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং অক্সফোর্ড থেকে বি. এ ডিগ্রী লাভ করেন। প্রথমে রামপুর রাজ্যের প্রধান শিক্ষা অধিনায়ক ছিলেন। পরে ইস্তিফা দিয়ে বড়োদা সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ভারতীয় জনসাধারণ বিশেষত মুসলমানদেরকে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ মুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনিই ছিলেন গত শতাব্দীর প্রথম দুই যুগের রাজনৈতিক মঞ্চের প্রভাবশালী অধিনায়ক। ভারতীয় মুসলিম লীগের (১৯০৬) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রাজদ্রোহের অপরাধে বহুবার কারারুদ্ধ ও অন্তরিত হন। খিলাফ ও অসহযোগ আন্দোলনের নায়ক; ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন; কিন্তু পরে 'নেহেরু রিপোর্ট' প্রকাশিত হলে কংগ্রেসের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে জেরুজালেমের মসজিদুল আক্সার পাশে সমাহিত করা হয়। তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ইংরেজি কমরেড ও দৈনিক উর্দু হামদর্দ পত্রিকায় বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে অনলবর্ষী লেখা বের হয়। (মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., 'মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ১- ১১। বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯৬)।*

৪২। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

৪৩। মুহাম্মদ মিয়াঁ, মওলানা, আসীয়ানে মাল্টা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

৪৪। **মাওলানা শওকত আলী:** মাওলানা শওকত আলী (১৮৭৩- ১৯৩৮) উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। রামপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। বেরেলী ও আলীগড়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে সিভিল সার্ভিসে যোগদেন (১৮৯৫- ৯৬)। মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি ব্রিটিশের উপেক্ষা, বঙ্গভঙ্গরদ, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাখান, দেশবাসীদের হাতে ক্ষমতা ত্যাগে অস্বীকৃতি এবং ব্রিটিশের মুসলিম বিরোধী পররাষ্ট্রনীতির কারণে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চাকরিতে ইস্তিফা দিয়ে এবং ইউরোপীয় প্রীতি বর্জন করে তিনি আযাদী আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এক মুহূর্তের জন্যও স্বদেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করেন বি। নেহেরু রিপোর্টের বিরোধিতা (লক্ষ্ণৌ অধিবেশন আগস্ট ১৯২৮) এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের সংগঠন থেকে শুরু করে ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশন পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিটি দাবির প্রতি বলিষ্ট সমর্থন জানান। খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০- ২২) যোগাদান করে রাজরোষে পতিত হন এবং কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ হন। (বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃঃ ৪২৩)।

৪৫। **মওলানা যাফর আলী খান:** মওলানা যাফর আলী খান (১৮৭৩- ১৯৫৬) বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি, কবি ও উর্দু সাহিত্যিক। পাঞ্জাবের সিয়ালকোট জেলার কোটমর্থ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। আলীগড় থেকে বি. এ ডিগ্রী লাভের পর নবাব মুহাসিনুল মুলক এর সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। বোম্বে থেকে হায়দারাবাদ গমণ করে

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদকের পদ গ্রহণ করেন। পরে হায়দারাবাদ রাজ্যের স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হন। লাহোর থেকে যমীনদার পত্রিকা প্রকাশ করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় রাজনীতিতে অতিবাহিত হয়। তিনি পাঞ্জাব এসেম্বলীর সদস্য ছিলেন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরে তিনি মুসলিম লীগের সদস্য হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানের সংসদ সদস্যও ছিলেন। তিনি কবি, প্রবন্ধকার এবং বক্তা হিসেবে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেন। তিনি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিষয়ে কবিতা রচনা করতেন। তিনটি কাব্য সংগ্রহ বাহারিস্তান, নিগারিস্তান এবং চমনিস্তান নামে প্রকাশিত হয়। তরিকায়ে মারিফায়ে মাযহাব, সায়িম্ম গালাবায়ে রোম, জঙ্গে রোম ও জাপান (কাব্য নাটক) তাঁর অনন্য বিখ্যাত গ্রন্থ। (বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃঃ ১৮৫)।

৪৬। মুহাম্মদ মিঁয়া, মওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।

৪৭। Silken Letters Conspiracy case and who is Who, C. I. D Report, (ইন্ডিয়া অফিস, লন্ডনে সংরক্ষিত রেকর্ড) ফৌজদারী মোকাদ্দমা, ভারতের বড়লাট বনাম উবায়দুল্লাহ্ ও অন্যান্য, ১২১ নং ধারা, মোকদ্দমার আরজীর ২১ নং বর্ণনা।

৪৮। মুহাম্মদ মূসা, শায়খ, উপমহাদেশের মুজাহিদীনের অবদান, হোছাইনিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ৬০।

৪৯-৫০। ঐ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।

৫১। হ্যাপী, (উর্দু অনুবাদ) হুকুমতে খুদ এখতিয়ারী, কুতুবখানা ইমদাদিয়া, করাচী, ১৯৫৭, পৃঃ ৩।

৫২। মুহাম্মদ মিয়াঁ, মওলানা, আসীরানে মাল্টা, আল্-জমইয়াত বুক ডিপো, দিল্লী, ১৯৭৬, পৃঃ ১৪- ১৫।

৫৩। Andrews, C. F, The Rise and Growth of the congress in India, George Allen And Unwin, London, ১৯৩৮, পৃঃ ১২১.

৫৪। মুহাম্মদ মিয়াঁ, মওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

৫৫। মুহাম্মদ মিয়াঁ, মওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬- ১৮।

৫৬। রাওলাট কমিটি রিপোর্ট, কাশিরাম প্রেস, লাহোর, ডিসেম্বর ১৯১৮, পৃঃ ২২৬।

৫৭। রহিম, এম. এ, 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)', আহ্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৬৯।

৫৮। মুহাম্মদ মিয়াঁ, মওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

৫৯। আবদুল জলীল, এ. এম. এম, দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ, ইসলামী গবেষণাকেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ১০৫।

৬০। মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

৬১। 'দৈনিক জামীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত; পৃঃ ২২৬।

৬২। 'দৈনিক জামীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত; পৃঃ ২২৬।

৬৩। আবদুল জলীল, এ. এম. এম, দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ, ইসলামী গবেষণাকেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ১০৫।

৬৪। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫। **মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসুর আনসারী:** তাঁর মুল নাম ছিল মুহাম্মদ মিয়াঁ আনসারী। তিনি ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবীর দৌহিত্র এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রধান মাওলানা আবদুল্লাহ্ আনসারীর পুত্র। তাঁর জন্মভূমি সাহারানপুর জেলার ইটা নামক স্থানে। তিনি গালাওঠীর মানবাউল উলুম মাদ্‌রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্‌রাসা থেকে ১৩২১ হিজরী সনে তিনি শিক্ষা সমাপন করে চূড়ান্ত ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর শায়খুল হিন্দের কুরআনের অনুবাদ কার্যে সহায়ক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। তিনি ভারতীয় বিপ্লবী দলের সদস্য হন এবং 'জমীঅতুল আন্‌সার'-এর সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করেন। তিনি শায়খুলহিন্দের সাথে মক্কায় গমন করেন এবং হিযাযের গভর্নর গালিব পাশা প্রদত্ত 'গালিবনামা' শায়খুলহিন্দের নির্দেশে ভারতে নিয়ে আসেন। ইতঃপূর্বে 'রেশমী রুমালপত্র' ব্রিটিশ সরকারের হস্তগত হয় এবং ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। তিনি আত্মগোপন করে য়্যাগিস্তানের স্বাধীন এলাকায় চলে যান। সেখানে কিছুদিন থাকার পর কাবুলে আগমন করে সেখানে 'গালিবনামা' প্রচার করেন। আমীর আমানুল্লাহ্ খানের শাসনামলে তিনি পুনঃ কাবুলে আগমন করে বিদ্যা ও বুদ্ধির বদৌলতে রাজনৈতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হন। রাজনীতি ও ইসলামী প্রশাসন সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। হুকুমতে ইলহী, আসাস-এ ইন্‌কিলাব, দসতূর-এ আমানত এবং আনওয়াউদ্ দুওয়াল তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থ। শেষ বয়সে তিনি আফগানিস্তানের *জালালাবাদে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং এখানেই তিনি ৬ সফর ১৩৬৫ হিজরী মুতাবিক ১১* জানুয়ারি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। (মাহবুব রেযবী, সায়্যিদ, তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১- ৯৩)।

৬৬। **খান আব্দুল গাফ্‌ফার খান:** খান আব্দুল গাফ্‌ফার খান ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে পেশওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি *ছিলেন ইতমানযুয়ীর অধিবাসী শীর্ষ স্থানীয় সংগ্রামী পুরুষ। তাঁর বড় ভাই ডা. খান পশ্চিম পাকিস্তানের* প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বিশ বছর বয়সে শায়খুলহিন্দের হাতে বায়াত হয়ে জিহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শায়খুলহিন্দের বিপ্লবী দলে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। তিনি হাজী তুরঙ্গাজয়ী ও শায়খুলহিন্দের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করতেন। খান আব্দুল গাফ্‌ফার খান একজন উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক ও নিখিল ভারতের কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। রাওলাট এ্যাকট বিরোধী ও অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে উপমহাদেশের রাজনীতিতে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত হন। 'খোদায়ী খেদমতগার' নামে একটি সেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। তিনি ছিলেন ভারত বিভক্তির বিপক্ষে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিকিৎসার জন্য লন্ডন গমন করেন। চিকিৎসা শেষে আফগানিস্তানে এসে বাস করতে থাকেন এবং সেখান থেকে পাখতুনিস্তান আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনি প্যাকিস্তানে ফিরে আসেন। মুহাম্মদ উসমান ফারকলীত, মাওলানা খান আবদুল গফ্‌ফার খান, আল-জমইয়াত, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, ১৯৫৮, পৃঃ ১০৯; বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৯; আব্দু রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭; 'নকশ-এ হায়াত' ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৯)।

৬৭। মুহাম্মদ মিয়াঁ, মওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০- ২১।

৬৮। গোলাম রসুল মিহর, সরগুযাশ্‌তে মুজাহিদীন, কিতাব মনযিল, লাহোর, ১৯৫৬, পৃঃ ৫৫৫- ৫৫৬।

৬৯। ঐ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫৬।

৭০। মুহাম্মদ মিঁয়া, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

৭১। ঐ, প্রাগুক্তা, পৃঃ ২১।

৭২। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪১।

৭৩। আবদুর রহমান, মাওলানা, তাহরীকে রেশমী রুমাল, ক্লাসিক, লাহোর, ১৯৬০, পৃঃ ১৭১- ১৭৩।

৭৪। ঐ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫। ঐ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯-১৬০।

৭৬। মুহাম্মদ মিয়াঁ, সায়্যিদ, 'আসীরানে মাল্টা', আল-জমইয়্যাত বুক ডিপো, দিল্লী, ১৯৭৬, পৃঃ ৩১- ৩৩।

৭৭। 'আসীরানে মাল্টা', প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১- ৩৩।

৭৮। 'আসীরানে মাল্টা', প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২- ৩৩; তাহির মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯- ১০।

৭৯। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৬।

৮০। আবদুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮১- ১৮২।

৮১। আবদুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৮।

৮২। আবদুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৭।

৮৩। আবদুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৭- ১৪০।

৮৪। আবদুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০- ১৪১।

৮৫। আবদুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩- ১৪৬।

৮৬। শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৯।

৮৭। **শায়খ আবদুর রহীম:** তিনি ছিলেন হায়দারাবাদী এবং মাওলানা সিন্ধীর অকৃত্রিম নওমুসলিম বন্ধু। তিনি ভারতীয় বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি মাওলানা সিন্ধীকে আফগান সীমান্তে পৌঁছানোর কাজে বিশেষ সহায়তা করেন। আচার্য কৃপনালী ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভাই। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক অমুসলিম মুসলিম হয়। তাঁদের মধ্যে ডাক্তার শামসুদ্দীন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ডাক্তার শামসুদ্দীন মুসলমান হওয়ার পর তিনি তাঁর মেয়েকে তাঁর নিকট বিবাহ দেন। কাবুল গমনের পর সিন্ধী শায়খ আবদুর রহীমের সাথে পত্রালাপ করতেন। রেশমী রুমালপত্র শায়খ আবদুল হক এর নিকট আনার সময়ে খান বাহাদুর রব নেওয়াজ খানের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের হস্তগত হয়। এরপর তিনি গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে আত্মগোপন করেন এবং অবশেষে সম্ভবত সরহিন্দে অসুস্থ হয়ে ইন্তিকাল করেন। তাঁর আত্মগোপন করে থাকায় মিশনের ব্রাঞ্চ হায়দারাবাদ সিন্ধের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। (নকশ-এ হায়াত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪- ১৯৫)।

৮৮। শায়খুল ইসলাম মাওলানা মদনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৯।

৮৯। মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

৯০। মুজিবুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯-১০।

৯১। শায়খুল ইসলাম মাওলানা মদনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৯।

৯২। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩, ১৪৬; 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭।

৯৩। গোলাম রসুল মিহর, মওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫৮- ৫৫৯।

৯৪। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩, ১৪৬; 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭।

৯৫। শায়খুল ইসলাম হুসায়ন আহমদ মদনী, মাওলানা, সফরনামায়ে আসীরে মাল্টা, মদনী দারুত তালীফ, বিজনৌর, ১৯৭০, পৃঃ ১৬।

৯৬। ঐ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০- ১১।

৯৭। মুহাম্মদ মিয়াঁ মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

৯৮। আবদুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৬।

৯৯। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

১০০। Silken Letter conspiracy case and who is who-এর সি. আই. ডি রিপোর্টের ১২৫ নং বর্ণনা।

১০১। আযীযুর রহমান বিজনৌরী, মুফতী, তাযকিয়া-এ শায়খুলহিন্দ, দারুত তালীফ, বিজনৌর, ১৯৬৫, পৃঃ ২১৪।

১০২। ঐ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৫।

১০৩। **আমীর হাবীবুল্লাহ খান:** আমীর হাবীবুল্লাহ খান (১৮৭২- ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন আমীর আব্দুর রহমানের পুত্র। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১ অক্টোবর থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আফগানিস্তানের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি জালালাবাদের নিকট গোশ নামক কেল্লায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সমর্থক ও অনুগত। ভারতীয় বিপ্লবী দলকে 'অস্থায়ী ভারত সরকার' গঠনের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তবে তুর্কী বাহিনীর কাবুলের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ভারতে আক্রমণ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকলেও এ পরিকল্পনা ব্রিটিশকে জানিয়ে দেন। এতে মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর কাবুল গমনের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যাহত হয়। (Wensinck, M. T. H. Houtsma, A. J. (ed) Encyclopaedia of Islam (III), Lieden, London, ১৯০৬; Ludwing, W. Adamec, Afghanistan (১৯০০-১৯২৩), California University, California, ১৯৬৭, পৃঃ ৮৩-১০৭। মির্যা মুহাম্মদ ওহীদ (সম্পাদিত) দারিয়া-এ মা'আরিফ-এ ইসলামিয়া, ৯ম খণ্ড, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, ১৯৭২, পৃঃ ১৮৬; বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৬৫; নকশ-এ হায়াত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭২- ১৭৪)।

১০৪। আযীযুর রহমান বিজনৌরী, মুফতী, প্রাগুক্ত; পৃঃ ২১৬।

১০৫। ঐ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮।

১০৬। 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭।

১০৭। **শায়খ মুহাম্মদ ইবরাহীম:** মাওলানা সিন্ধীর বন্ধু এবং করাচীর মাওলানা মুহাম্মদ সাদিকের ভাতিজা। তিনি পোনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বি. এ অনার্স এবং অর্থনীতিতে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কাবুলে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। তিনি সিন্ধীর পূর্বেই কাবুল গমন করে ১৯১৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে হাবীবিয়া কলেজের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশের চরম বিরোধী একজন মহান বিপ্লবী নেতা। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মুহাম্মদ আলী কাসূরী, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রফেসর বরকতুল্লাহ্- এর সাথে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কাবুলে ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে সরকারকে জিহাদে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে মাওলানা কাসূরীকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। ১৯১৬ সালের জুন মাসে মুহাম্মদ আলী কাসূরীসহ শায়খ ইবরাহীমকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করে দেয়া হয়। ১৯১৬ সালের ১০ জুলাই উপজাতি এলাকা স্বাধীন সীমান্তে তাঁরা পৌঁছে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। (Silken letter conspiracy case and who is who-এর সি.আই.ডি রিপোর্টের দ্বিতীয় বিবরণ)।

১০৮। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাওলানা, কাবুল মেঁ সাত সাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

১০৯। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫০- ১৫২।

১১০। আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৭।

Dhaka University Institutional Repository

১১১। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাওলানা, কাবুল মেঁ সাত সাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।

১১২। ঐ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪।

১১৩। আযীযুর রহমান বিজনৌরী, মুফতী, তাযকিয়া-এ শায়খুলহিন্দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮।

১১৪। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাওলানা, কাবুল মেঁ সাত সাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪।

১১৫। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৫; আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯-১১০।

১১৬। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাওলানা, কাবুল মেঁ সাত সাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬-৬৭।

১১৭। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬২।

১১৮। মোদাব্বের, মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।

১১৯। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬০।

১২০। আয়বেক, যাফর হাসান, আপবীতি, মনসুর বুক হাউজ, লাহোর, ১৯৬৮, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

১২১। 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৮।

১২২। তাহির, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

১২৩। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৫।

১২৪। আব্দুল জলীল এ.এম. এম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।

১২৫। তাহির, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

১২৬। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭২- ১৭৩।

১২৭। নূর-উদ-দীন আহম্মদ, (অনূ) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

১২৮। পেশোয়ার কলেজের ছাত্র লতীফ খান, কোহাট স্কুলের ছাত্র ফকীর শাহ্ এবং পীর বখ্শ্ কোহাটের পুলিশ আবদুল মজীদ এ চারজন নওজোয়ান পেশোয়ার থেকে কাবুল গমন করেন। (Silken Letter Conspiracy Case and who is who-এর আবদুল বারীর জেরার সময়ে তাঁর জবানবন্দী)।

১২৯। আয়বেক, যাফর হাসান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।

১৩০। রাওল্যাট রিপোর্ট, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৬।

১৩১। **মাওলানা সাইফুর রহমানঃ** মাওলানা সাইফুর রহমানের পরিবারের লোকেরা ছিলেন কান্দাহারের অধিবাসী। তবে তিনি পেশওয়ারে বসতি স্থাপন করেন। তিনি মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর নিকট হাদীস শিক্ষা করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। দিল্লীর ফতেহপুরী মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। শায়খুলহিন্দের উৎসাহে বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং তাঁরই পরামর্শে সীমান্ত এলাকায় হিজরত করেন। সীমান্তের লৌহমানব হাজী তুরঙ্গাজয়ী এবং সীমান্তের মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ইংরেজ ছাউনী ও সৈন্যস্থাপনায় হামলা করতেন। 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৮।

১৩২। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাওলানা, কাবুল মেঁ সাত সাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।

১৩৩। Silken Litter conspiracy case and who is who-এর মুক্তিফৌজ সম্পর্কিত বর্ণনা; A. H. M. Mujtaba Hossain, 'Shaikhul Hind Mawlana Mahmud Hasan: His

Dhaka University Institutional Repository

Contributions to Education and politics', The Dhaka University studies 'A', December, ১৯৮৪.

১৩৪। তাহির, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

১৩৫। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাওলানা, কাবুল মেঁ সাত সাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১- ৬৫।

১৩৬। তাহির, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

১৩৭। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাওলানা, কাবুল মেঁ সাত সাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

১৩৮। তাহির, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

১৩৯। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৬।

১৪০। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাওলানা, কাবুল মেঁ সাত সাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।

১৪১। যাফর হাসান, আয়বেক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

১৪২। 'নকশ-এ হায়াত' ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৮।

১৪৩। যাফর হাসান, আয়বেক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

১৪৪। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৮।

১৪৫। যাফর হাসান, আয়বেক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

১৪৬। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৯; 'দৈনিক জমীঅত' দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০।

১৪৭। মোদাব্বের, মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭।

১৪৮। 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০।

১৪৯। 'নকশ-এ হায়াত' ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৩।

১৫০। মওলানা আদ্‌রাবী, মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত, শায়খুল ইসলাম মওলানা মদনী (রাঃ) : জীবন ও সংগ্রাম, ঢাকা, জামান প্রিন্টার্স, ১৯৯১, পৃঃ ৫৮।

১৫১। মুহাম্মদ মিয়াঁ, মাওলানা, আসীরানে মাল্টা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৮।

১৫২। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪।

১৫৩। মুহিউদ্দীন খান, মওলানা, হায়াতে মওলানা হুসাইন আহ্‌মদ মদনী, আশরাফিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৬৪।

১৫৪। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪।

১৫৫। মুহিউদ্দীন খান, মওলানা, হায়াতে মওলানা হুসাইন আহমদ মদনী, আশরাফিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৬৪।

১৫৬। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪।

১৫৭। 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৫৮। **আন্ওয়ার পাশা:** আন্ওয়ার পাশা (১৮৪১- ১৯২২) তুর্কী সেনানায়ক ও অন্যতম রাজনৈতিক নেতা। প্রথমদিকে তিনি আন্ওয়ার নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তুর্কী ও আলবেনীয় মাতাপিতার সন্তান। সেনাবাহিনীতে যোগদানের পর স্যালনিকার নব্যতুর্কী আন্দোলনের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। নিয়ামী বে-এর সহযোগিতায় ম্যাসতোনিয়ায় বিদ্রোহ সৃষ্টি করে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদকে ১৮৭৬-এর শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করেন। ১৯১২ সালে ত্রিপলী অভিযানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে তিনি আদ্রিয়ানোপল পুনরুদ্ধার করেন (১৯১৩)। তুর্কী সমর সচিব নাযিম পাশার হত্যায় তাঁর ভূমিকা ছিল। নব্যতুর্কী প্রধানমন্ত্রী মাহ্মুদ শওকত পাশাকে হত্যা (জুন, ১৯১৩) করা হলে ১২০০-এর অধিক সামরিক কর্মচারীকে বরখাস্ত করেন। ১৯১৪ সালের ৩ জানুয়ারি নিজেকে সমর-সচিব বলে ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন জার্মান সমর্থক। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক-জার্মান পক্ষ অবলম্বনের চেষ্টা করে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে তিনি অকৃতকার্য হন (১৯১৪- ১৫)। ক্রমে তুরস্কের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন। মিত্রশক্তির বিজয়ের পর পলায়ন করে জার্মানি ও রাশিয়ায় বাস করেন। সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনাকালে বুখারাতে নিহত হন। (বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০)।

১৫৯। মুহিউদ্দীন খান, মওলানা, হায়াতে মওলানা হুসাইন আহমদ মদনী, আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৬৪।

১৬০। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪; 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৩।

১৬১। আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৪।

১৬১। **(ক) গালিবনামা:** গালিবনামা সম্পর্কে রাওল্যাট রিপোর্টের বর্ণনা এই- ১৩৩৩ হিজরী মুতাবেক আগস্ট, ১৯১৫ সালে মওলানা মাহ্মুদ হাসানের জনৈক শাগরেদ মওলবী উবায়দুল্লাহ্ কাবুলে গমন করেন। তথায় তিনি পৌঁছে আফগানিস্তানে আগত ভারত প্রবাসী নেতৃবর্গ এবং জার্মান ও তুর্কী মিশনের প্রতিনিধিবর্গের সাথে মিলিত হয়ে কাবুলের আমীর হাবীবুল্লাহ্র প্রতি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এ সময়েই মওলবী মাহ্মুদ হাসান মক্কায় গমন করেন। তিনি *ভারতবাসীর প্রতি গালিব পাশার স্বাক্ষর-যুক্ত ঘোষণাপত্র* মওলবী মুহাম্মদ মিয়াঁর মাধ্যমে মওলবী উবায়দুল্লাহ্র নিকট প্রেরণ করেন। এ ঘোষণাপত্রে ভারতীয়দেরকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, ব্রিটিশকে পরাজিত করার পর উপমহাদেশে অস্থায়ী সরকার স্থাপিত করা হবে। এ সরকারের প্রেসিডেন্ট হবেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ সিং। তিনি ১৯১৪ সালে ইউরোপে গমন করে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তিসমূহের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। (রাওল্যাট রিপোর্ট, পৃঃ ২৫৩- ২৫৪)।

১৬২। রাওল্যাট রিপোর্ট, পৃঃ ১২৭।

১৬৩। মুহাম্মদ মুসা, শায়খ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১।

১৬৪। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।

১৬৫। **আমীর আমান উল্লাহ খান** ঃ আমীর আমান উল্লাহ খান (১৮৯২-১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন আফগানিস্তানের আমীর ও বাদশাহ। পিতা আমীর হাবীব উল্লাহ খান। তিনি পিতৃব্য নসরুল্লাহ খানকে সিংহাসনচ্যুত করে ক্ষমতায় আরোহন করেন। জনমতের চাপে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে) সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে আফগানরা জয় হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে *আমান উল্লাহ স্ত্রীসহ ইউরোপে ভ্রমণ করেন এবং সেখান থেকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে বলপূর্বক* আফগানদের উপর ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পড়াবার ও পর্দাপ্রথা বিলোপ করার চেষ্টা করেন। ফলে সমগ্র দেশে বিদ্রোহ শুরু হয়। অবশেষে জনরোষে পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইনায়াতুল্লাহ্

Dhaka University Institutional Repository

খানের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করে ইউরোপ গমন করেন। সুইজারল্যান্ডে নির্বাসিত জীবন যাপনকালে যুরিখে তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৭৩, পৃঃ ১১৪।

১৬৬। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।

১৬৭। আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫।

১৬৮। মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬।

১৬৯। আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫- ১৮৬।

১৭০। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

১৭১। মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

১৭২। আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৬।

১৭৩। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

১৭৪। আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৬।

১৭৫। 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৩; 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪।

১৭৬। আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯০- ১৯১।

১৭৭। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২২।

১৭৮। তিনি স্থানীয় নেতা না মাহমুদ হাসান ও উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর মনোনিত নেতা তা স্পষ্ট নয়। মওলানা আদ্‌রাবী (মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০- ৬১; সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, (মওলানা আশিকুর রহমান কাসেমী অনূদিত), মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, আল্-আমিন প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ১৪৯।

১৭৯। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২২।

১৮০। আব্দুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯২।

১৮১। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২২- ২২৩।

১৮২। আব্দুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯২।

১৮৩। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৫।

১৮৪। শায়খুল ইসলাম মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৫।

১৮৫। সায়্যিদ আহমদ আকবরবাদী, 'আন্‌ওয়ারনামা হিন্দুস্তান মেঁ', মাসিক আল-বুরহান, দিল্লী, ডিসেম্বর, ১৯৪৮, একবিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৩৫৩।

১৮৬। শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭।

১৮৭। আব্দুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩।

১৮৮। 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৩।

১৮৯। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০। আব্দুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩।

১৯১। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

১৯২। ঐ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

১৯৩। আব্দুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১।

১৯৪। আব্দুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

১৯৫। আব্দুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫-১৯৬।

১৯৬। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

১৯৭। 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০।

১৯৮। আবদুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯১।

১৯৯। 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০।

২০০। Silken Letter conspiracy case and who is who-এর সি. আই. ডি রিপোর্টের রেশমী রুমালের বর্ণনা।

২০১। 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০-২৩১।

২০২। 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০- ২৩১; আব্দুল জলীল, এ. এম. এম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০-১১১।

২০৩। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১; আবদুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯২।

২০৪। 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩২, ২৩০- ২৩৩।

২০৫। আবদুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩- ১৯৫।

২০৬। আবদুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০- ২৩৪; 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭০।

২০৭। Silken Letter conspiracy case and who is who- এর সি. আই. ডি রিপোর্টের ফৌজদারী মামলার আরজি।

২০৮। এ তথ্যটি যথার্থ নয়। বরং শায়খুলহিন্দ তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মাওলানা সিন্ধীকে প্রভাবিত করেছিলেন।

২০৯। Silken Letter conspiracy case and who is who- এর সি. আই. ডি রিপোর্টের ফৌজদারী মামলার আরজি।

২১০। রাওল্যাট রিপোর্ট, পৃঃ ১২৬- ১২৭।

২১১। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাওলানা, কাবুল মেঁ সাত সাল, পৃঃ ৭৮; শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ মাওলানা হুসায়ন আহ্মদ মদনী, 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭১।

২১২। মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা, আযাদী আন্দোলনের বীরসেনানী মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, প্রকাশক, মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, ৩১ আগস্ট ১৯৯২, পৃঃ ১৩।

২১৩। আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১২। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

২১৪। 'দৈনিক জমীঅত', প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৪।

২১৫। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাওলানা, কাবুল মেঁ সাত সাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮; 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭১।

২১৬। মাওলানা মদনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৪- ১৭৫; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

২১৭। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২১- ২২৭।

২১৮। রাউলাট রিপোর্টের একথা সত্য নয়; বরং সত্যটি হল, শায়খুলহিন্দ মাওলানা সিন্ধীকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য প্রভাবান্বিত করেছিলেন। ('নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৯।)

২১৯। Rowlatt sedition Committee Report, 1918, Chapter XIV, পৃঃ- ১২৫- ১২৭; 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮- ২৪৪।

২২০। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।

২২১। শায়খুল ইসলাম মাওলানা সায়্যিদ আহ্মদ মদনী, সফরনামা-এ আসীরে মাল্টা, মদনী দারুত তালীফ, বিজনৌর ১৯৭০, পৃঃ ৫৮।

২২২। তাহির, মুহাম্মদ, পৃঃ ২১; 'আসীরানে মাল্টা' পৃঃ ৪৩।

২২৩। সফরনামা-এ আসীরে মাল্টা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮- ৬০।

২২৪। মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩।

২২৫। মুহাম্মদ মিয়াঁ, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪- ৪৫।

২২৬। **মাল্টা:** মাল্টা ইউরোপের অর্ন্তভুক্ত একটি দ্বীপ। প্রথমে সেটি পর্বতপ্রাচীর বেষ্টিত একটি বিশাল কিল্লা ছিল। উক্ত কিল্লায় যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জামাদি, অস্ত্র-শস্ত্র এবং সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখা হত। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিপদজনক বন্দিদেরকে সেখানে আটক রাখা হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে সেটি বিশ্বযুদ্ধ ও বন্দিখানা রূপে ব্যবহৃত হয়। সেখানে এমন সব যুদ্ধবন্দি ও রাজনৈতিক নেতাদের আটক রাখা হত, যাদেরকে ভয়-ভীতি, প্রলোভন দিয়েও বশে আনতে পারত না। তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে ভয়ানক আতংক সৃষ্টিকারী বন্দিখানা। ('সফরনামা-এ আসীরে মাল্টা', পৃঃ ৮৪- ৮৫)।

২২৭-২৮। তাহির, মুহাম্মদ, পৃঃ ২১-২৬,; "আসীরানে মাল্টা" পৃঃ ৪৩-৪৬।

২২৯। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭১-১৭২।

২৩০। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৪- ১৭৫।

২৩১। আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৭।

২৩২। **যাফর হাসান:** যাফর হাসান ১ম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরের অন্যান্য কলেজ ছাত্রদের (১৫ জন) সাথে তুরস্কের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে কাবুলে উপনীত হন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের পক্ষে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাথে যুদ্ধ করা। কিন্তু আফগান সরকার তাঁদেরকে কাবুলে রেখে দেন। পরবর্তী সময় তাঁদের অনেকে মওলানা সিন্ধী গঠিত 'খোদাই লশকর'-এ যোগদান করেন। যাফর হাসানও ঐ সময় কাবুলে মওলানা সিন্ধীর নিকট সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি সিন্ধীর সাথে রাশিয়া ও তুরস্ক ভ্রমণ করেন এবং ১১ বছর তাঁর সাথে কাটান। তিনি তুরস্কে সিন্ধীর সাথে একযোগে ১৯২৪ সালে একটি রাজনৈতিক 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করেন। ১৯২৬

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সিন্ধী হেযায গমন করলে যফর হাসান তুরস্কেই থেকে যান এবং সেখানে নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে আর্টিলারি বিভাগে ক্যাপ্টেন রূপে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন এবং সেখানেই জীবন সাঙ্গ করেন। (মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩)।

২৩৩। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

২৩৪। আনিস সিদ্দিকী, 'হতভাগ্য বাদশা আমানুল্লাহ', খুলনা, প্রাগুক্ত, ১৯৬৯, পৃঃ ৩৬।

২৩৫। 'দৈনিক জমীঅত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪।

২৩৬। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

২৩৭। মুজীবুর রহমান, মওলানা, 'মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর রোজনামচা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃঃ ভূমিকা দ্রষ্টাব্য; 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০।

২৩৮। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

২৩৯। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৫।

২৪০। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আফগানিস্তান ত্যাগ এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ব্রিটিশদের বিরোধিতা:

তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে মাওলানা সিন্ধী আমীর আমান উল্লাহর সরকারে যেমনিভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আফগান সরকারের কল্যাণসাধন করছিলেন, তেমনিভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন।[১] উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী আমীর আমানুল্লাহ্ খানের শাসনামলে তিন বছর আট মাস (১-৩-১৯১৯ থেকে ২২-১০-১৯২২) এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মোট সাত বছর সাত দিন কাবুলে থাকার পর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে তা ছাড়তে বাধ্য হন এবং ১৯২২ সালের ২২ অক্টোবর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার পথে যাত্রা করেন।[২] মাওলানা যাফর হাসান বলেন, "মাওলানা সিন্ধী অক্টোবর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আফগানিস্তানে অবস্থান করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেন। অতঃপর আমান উল্লাহ খানের উপর ব্রিটিশের চাপ অব্যাহত থাকলে তিনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর কাবুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কাবুলে জিহাদের ময়দানকে যিনি সরগরম রাখতেন, তাঁকে নীরবে নিঃশব্দে কাবুল ছেড়ে চলে যেতে হয়।"[৩] এটা জানা কথা, সিন্ধী কাবুলে নির্বাসিত জীবন যাপন করতেন। তাঁর বিপ্লব-পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পরেও তিনি ও তাঁর সহযোগীরা নামেমাত্র হলেও সেখানে একটা অস্থায়ী ভারত সরকার জিইয়ে রেখেছিলেন। সেটা আপাতত অন্যান্য দেশের, বিশেষত ব্রিটিশ ভারতের দৃষ্টিতে অশোভন ঠেকলেও আমানুল্লাহ্ খান সরকার সহানুভূতিমূলকভাবে তাতে কোন আপত্তি করেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপে তাঁকে ১৯২২ সালে সেই অস্থায়ী সরকার বন্ধ করে দিতে হলো। যতটুকু মনে হয়, সিন্ধী কাবুলকে নিজ দেশের মতই আপন করে নিয়েছিলেন। কারণ দেশে ফেরার কোন পথ তাঁর ছিল না। তিনি আফগানিস্তানের কাজ করেই আনন্দ লাভ করতেন। কিন্তু স্বদেশকে স্বাধীন করার যে বাসনা তাঁর মনে প্রজ্বলিত ছিল, তা কখনো নির্বাপিত হয় নি। যদি আন্তর্জাতিক চাপ না থাকতো এবং তিনি কাবুলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারতেন, তবে বোধ হয় তিনি কোন সময় কাবুল ছাড়ার চিন্তা করতেন না।[৪] উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী নীতিবান লোক ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা, মান-ইজ্জত বা আরাম-আয়েশের জন্য নীতি বর্জন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যদি দেশের স্বাধীনতার চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে কাবুল সরকারের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতেন, তবে তাঁকে কাবুল ছেড়ে হয়তো দেশে দেশে ফিরতে হতো না। কাবুলে অবস্থানের বহু দিন পর তিনি যখন মক্কায় বসে ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে আত্মকথা (যাতী ডায়েরি) লিখেছিলেন, তখনো তিনি এই আশাই পোষণ করছিলেন যে, হয়তো বা একদিন বিপ্লবী দলের লোকেরা আবার স্বাধীন ভারতে মিলিত হবে। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী বলেন, "শেষ বছর আমি যখন কাবুল থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম, তখন আমীর আমানুল্লাহ্ খান আফগানিস্তানে আমাদের অস্থায়ী সরকারের কাজ বন্ধ করে দেন। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিধিনীতি পালন করা ছিল আবশ্যকীয়। আমি এটাকে শর্ত হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি যখন কোন অঙ্গীকার করতে ইতস্তত করছিলেন, তখন আমি কাবুল ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমি নিজেকে একটুখানি পরিবর্তিত করে নিলে আরাম ও

Dhaka University Institutional Repository

সম্মানের সাথে কাবুলেই থাকতে পারতাম। কিন্তু তাতে আমার নওজোয়ান বন্ধুদের ভবিষ্যত বিনষ্ট হয়ে যেতো। এ জন্য কাবুল ত্যাগ করা আমি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলাম। আমরা অবশ্য এখন নিশ্চিতভাবে একত্রে থাকতে পারছিনা। কিন্তু কেউ আমার প্রতি এ অভিযোগ আনতে পারছেনা যে, আমি নিজ স্বার্থে অপরের ক্ষতি করেছি। যদি কোন সময় সুযোগ আসে, *তবে আমরা সকল বন্ধু আবার একত্র হবো।*"[৫]

শুধু উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীই কাবুল ত্যাগ করেন নি, শত শত লোক– যাঁরা তুরস্কের জন্য জিহাদ করতে বা মাতৃভূমি ভারতকে মুক্ত করার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আযাদ সীমান্ত এলাকায় বা আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিলেন, সীমান্ত যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, কষ্ট ভোগ করেছিলেন, বিপ্লব-পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর তাঁরা প্রায় সকলেই ধীরে ধীরে কাবুল ছেড়ে চলে যান; কেউ রাশিয়ায় গিয়ে সমাজবাদী হয়ে যান, কেউ আযাদ ইয়াগিস্তান এলাকায় এসে জিহাদ করে প্রাণ হারান, আবার কেউ নিঃস্ব হয়ে বা ব্রিটিশের অনুগত হয়ে ভারতে ফিরে আসেন, হয়তো বা কেউ ধর-পাকড়ের ভয়ে চিরতরে আত্মগোপন করেন বা ধরাপৃষ্ট থেকেই বিদায় নেন। এক সময় যে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী কাবুলে জিহাদী কর্মকাণ্ডকে সরগরম করে রেখেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকেও নীরবে নিঃশব্দে কাবুল ছেড়ে চলে যেতে হলো। স্বাধীনতার জন্য তাঁরা কতইনা মূল্য দিলেন! আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের আন্দোলনের যবনিকাপাত ঘটলেও মূলত সেই আন্দোলন যুগে যুগে যুগিয়েছে স্বাধীনতার ইন্ধন।[৬] উল্লেখ্য, সিন্ধীর কাবুল ত্যাগের পর আমীর আমান উল্লাহ খান বেশী দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন নি; বরং ইংরেজ ষড়যন্ত্রের কারণে কাবুল ছেড়ে রোমে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন (১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে)[৭]।

কাবুলে অবস্থানকালীন উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী জুনূদুল্লাহ সংগঠন ও অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যে সব উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন তা হল:

১. জার্মান মিশনের সদস্যদেরকে ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দিতে সক্ষম হন।

২. রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন।

৩. রাশিয়া, জাপান ও তুর্কী মিশনে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে এবং উত্তম ব্যবস্থাপনার দ্বারা তাদের সজ্জিত করেন। যদিও নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে মিশনসমূহ ব্যর্থ হয়েছে।

৪. নিজের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব দিয়ে আফগান শাসকদেরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে সক্ষম হন।

৫. আমীর আমান উল্লাহ খানের উপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করেন যে, বাদশা হওয়ার পরও আমীর আমানউল্লাহ্ আফগানিস্তানের সকল বিষয়ে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর পরামর্শকে গুরুত্ব দেন।

৬. তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে তিনি আফগান পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন এবং নিজের বাহিনীকে (জুনূদুল্লাহ) যুদ্ধে প্রেরণ করেন। সে যুদ্ধে আফগানিস্তান জয়লাভ করে। ব্রিটিশ আফগানিস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ভারতবর্ষের মুহাজির তরুণদেরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এত সক্রিয় ও শক্তিশালী করে তোলেন যে, আফগান সরকারকে সকল প্রকার সাহায্য করতে তাঁর কোন প্রকার বেগ পেতে হয় নি।

৮. আমীর আমানউল্লাহ খানের দরবারে শায়খুলহিন্দের মর্যাদা ও আন্দোলনকে অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরতে সক্ষম হন।[৮]

ক) রাশিয়া ভ্রমণঃ

সিন্ধী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ অক্টোবর কাবুল ত্যাগের পাসপোর্ট লাভ করেন এবং ২২ অক্টোবর কাবুল ত্যাগ করে।[৯] তুরস্ক যাবার পথে সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে সোভিয়েত রাশিয়ার 'তিরমিজ'-এ পৌঁছেন। রাশিয়ায় তখন জারের শাসন খতম হয়েছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর থেকে রাশিয়ার লেনিন (১৮৭০-১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ) এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে নতুন মতবাদ ও নতুন জীবনধারার জোয়ার নামে। সমাজবাদী রাশিয়ার উত্থান তখন জোর কদমে চলছে। সিন্ধী রাশিয়ায় সাত মাস অবস্থান করে লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সোশ্যালিজম সম্পর্কে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেই জীবনধারায় বেশ প্রভাবান্বিত হন। তিনি সেখানে সমাজবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখতে পেয়ে নিজে অনুপ্রাণিত হন। সেখানে অবস্থান করে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক গতিধারাও পর্যবেক্ষণ করেন।[১০] সেখানে তিনি 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'- এর সদস্য এবং এর আফগানিস্তান-শাখার প্রেসিডেন্ট রূপে সরকারি মেহমান ছিলেন এবং তাঁদের শ্রদ্ধাভাজনও ছিলেন। এই ভ্রমণ তাঁর জীবন-দর্শনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এর প্রতিফলনও ঘটে।[১১] তিনি জার-এর শাসনামলে কী কী দোষ ও দুর্বলতা ছিল, যার কারণে তার পতন হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের কী কী গুণ ও কারণ রয়েছে, যে কারণে সে বিজিত হয়েছে, পৃথিবীতে এর কী প্রভাব পড়ছে; তা উপলবিব্ধর চেষ্টা করেন।[১২] রাশিয়া ও তুরস্কের তদানীন্তন সভ্যতা ও জীবনবাদকে তিনি তাঁর রচনা ও বক্তৃতায় ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লবের মধ্যে তিনি শাহ্ ওলীউল্লাহ্র চিন্তাধারার প্রতিফলন খুঁজে পান, ঐ সমাজবাদী আন্দোলনে তিনি শাহ্ সাহেবের দর্শনের ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ করেন। সোভিয়েত রাশিয়া তাঁকে সেখানকার সমাজবাদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সকল প্রকার সুবিধা প্রদান করেন। সিন্ধীর সহযোগী ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম যুবকরা অনুবাদের মাধ্যমে রাশিয়ার সমাজবাদ অনুধাবনে তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। কারণ তিনি আরবি, ফারসি ও উর্দু ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না।[১৩] তিনি সেখানে সমাজবাদী নেতৃবৃন্দের সাথে ঘটিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পান। সিন্ধী সমাজবাদ বিষয়ে রাশিয়ার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের অসাধারণ কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত হন বটে; কিন্তু সমাজবাদের ধর্মহীনতায় শংকিত হন। যেহেতু নতুন রাশিয়ার সমাজবাদ ছিল ধর্মহীনতার উপর, আর উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ছিলেন খাঁটি মুসলমান। তাই ইসলামের প্রতি তার অবিচল অটল ভক্তিতে কোন ফাটল সৃষ্টি হয় নি। সিন্ধী রাশিয়ার সমাজবাদ ভারতে বহন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সাথে সাথে সমাজতন্ত্রের ধর্মহীনতার অভিশাপ থেকে বাঁচার চিন্তাও করেন। তিনি সাম্যবাদী আদর্শের ভাল দিকগুলোর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেন এবং কোন ইসলামী দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে তা কীভাবে করতে হবে, এসব বিষয়ে গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[১৪] সিন্ধীর ভাষায়, "সোশ্যালিজম সম্পর্কে পড়াশুনার ফল এ দাঁড়াল যে, আমি আমার ধর্মীয় আন্দোলন যা ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহর দর্শনের একটি শাখার ভিত্তিতে রচনা করেছিলাম, তাকে যুগের এই ধর্মহীনতার হামলা থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, তার কৌশল উদ্ভাবনে সক্ষম হই।[১৫]

খ) তুরস্কে ভ্রমণ ও ব্রিটিশ বিরোধী কর্মতৎপরতা:

রাশিয়ায় সাত মাস অবস্থান করার পর সিন্ধী তাঁর সাথী মাওলানা যুফার হাসান সহ ১৯২৩ সালে আংকারায় পৌঁছেন। মস্কোর তুর্কী রাষ্ট্রদূত ও রুশ পররাষ্ট্র দপ্তর মিলে তাঁদের সফরের ব্যবস্থা করেন এবং পথনির্দেশ করে দেন। ফলে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা তাঁদের এ সফর সম্পর্কে জানতে পারেনি।[১৬] অতঃপর আংকারা থেকে ইস্তাম্বুল গমন করেন। ইস্তাম্বুলে তখন আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা কামাল পাশার রাজত্ব। সেখানে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮ সাল) তুরস্কে ইসলামী খিলাফত প্রথা উঠিয়ে দিয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এতে মুসলিম বিশ্বের শেষ ভরসাস্থল তুরস্কের পতন হয়। সেখানে আরবি অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষর এবং ইউরোপীয় আচার অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতি চালু করা হয়। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কারমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সিন্ধী তিন বছর (১৯২৩-১৯২৬ সাল) তুরস্কে অবস্থান করে কামাল পাশার আধুনিক তুরস্ক ও ধর্ম-নিরেপক্ষ জাতীয়তাবাদ পর্যবেক্ষণ করেন।[১৭] সিন্ধী ঐ সংস্কার ও জাতীয়তাবাদে প্রভাবান্বিত হন এবং ভারতে ন্যাশনাল স্টেট গঠনের চিন্তা করেন। আংকারায় তিনি ইসলামী ঐক্য (প্যান-ইসলামবাদ) সম্পর্কে পড়াশোনা করেন এবং এটা অনুভব করলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে প্যান-ইসলামের কোন কেন্দ্র গড়ে উঠার সম্ভাবনা নেই। এজন্যই তিনি তুর্কীদের ন্যায় বহির্দেশের সাথে কোন সম্পর্ক না রেখে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বীয় ইসলামী আন্দোলনকে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এর আওতাভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং কংগ্রেসের অধীনে 'সর্বরাজ্য পার্টি' নামে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ভাবলেন, ইসলামী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে হলে কংগ্রেসের মাধ্যমেই করতে হবে। ১৯২০ সালে যফর হাসানের সহযোগিতায় এবং তুরস্ক সরকারের অনুমোদনক্রমে তিনি তাঁর দলের রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচি উর্দুতে ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশ করেন।[১৮] সিন্ধীর অনেক হিন্দু বন্ধু উর্দু পড়তে জানতেন না বিধায় এর ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ করেন।[১৯] ভারতের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ভারত সরকারের জন্য ১৯২৪ সালে ইস্তাম্বুল থেকে উর্দুতে প্রকাশিত উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর কর্মসূচি:

১। ভারতর পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ও আযাদ ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) সরকার গঠন।

২। ভারতে মুসলমান, অন্যান্য সংখ্যালঘু ও ইসলামের স্বার্থ সংরক্ষিত করা।

৩। ভারতে, শ্রমিকশ্রেণী তথা কৃষক, মজুর ও বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্য থাকবে এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা; জমিদারি ও পুঁজিবাদকে দেশ থেকে উৎখাত করা, তা হলে যেন লোকেরা কম্যুনিজমের লোভ দেখে প্রতারিত না হয়।

৪। সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য এশিয়াটিক ফেডারেশন গঠন করা।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বরাজ্য পার্টি:

সর্বরাজ্য পার্টির সদস্যপদ:

সর্বরাজ্য পার্টির সদস্যগণ তাঁদের জীবন-পদ্ধতির মান দেশের কৃষকদের চেয়ে উন্নত রাখার চেষ্টা করবেন না। অর্থাৎ এতটুকু আয় দিয়ে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করবেন, যতটুকু দিয়ে মধ্যম শ্রেণীর কৃষকরা করে থাকে; এর বেশী তাঁদের যে অর্থ বা সম্পত্তি হবে, তা পার্টিকে দেবেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি:

সর্বরাজ্য পার্টি ভারতকে একটি দেশ বলে মনে করবেন না; ভারতে একক জতীয়তাবাদ সৃষ্টির কোন চেষ্টাকে তাঁরা আযাদীর বুনিয়াদ বলে সমর্থন করবেন না। বরং তাঁরা দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন, যার জন্য নিম্নের পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে:

ভৌগোলিক দিক থেকে ভারত উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ-এই তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত। তাই ঐ অঞ্চলগুলোকে অভিন্ন ভাষা, অভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও অভিন্ন তমদ্দুনের ভিত্তিতে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হবে। অতঃপর ঐ প্রদেশগুলোর প্রত্যেকটিকে একটি গণতান্ত্রিক স্টেটে পরিবর্তন করা হবে। প্রত্যেকটি স্টেটের গণতান্ত্রিক সরকার পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা এবং বহির্বাণিজ্য ছাড়া অন্য সব বিষয়ে স্বাধীন থাকবে। যেমন: উত্তর পশ্চিমে ভারত-এই অঞ্চলটি পূর্ব পাঞ্জাব, পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও গুজরাট-এরূপ কয়েকটি গণতান্ত্রিক স্টেটে বিভক্ত হবে। অনুরূপভাবে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতকেও কয়েকটি গণতান্ত্রিক স্টেটে বিভক্ত করা হবে।

এই গণতান্ত্রিক দেশগুলো কেন্দ্রীয় ফেডারেল গভর্নমেন্টে যোগদানের পূর্বে ইচ্ছা করলে কয়েকটি দেশ মিলে তাদের অভিন্ন তমদ্দুন ও আচার-অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র একটা *ফেডারেশন গঠন করতে পারে। যেমন: পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর,* সিন্ধু ও বেলুচিস্তান এই ক'টি দেশ আপোসে ভিন্ন একটা ফেডারেশন গঠন করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করতে পারে। এমনিভাবে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের গণতান্ত্রিক দেশগুলো ইচ্ছা করলে সর্বসম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র একটা ফেডারেশন গঠন করে কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারে প্রবেশ করতে পারে।

ব্যবস্থাপক সভা

এই গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রত্যেক সজ্ঞান প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষকে ভোটাধিকার দেয়া হবে। সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণী (Social Class) যেমন- কৃষক, মজুর, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি তাদের নিজ নিজ সংখ্যানুপাতে ব্যবস্থাপক পরিষদের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এর ফলে এই সব গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে কৃষক, মজুর ও বুদ্ধিজীবী লোকদের প্রাধান্য বজায় থাকবে এবং এই ব্যবস্থাপক পরিষদ খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আর্থ-সামাজিক মূলনীতি

জনস্বার্থে যাবতীয় উৎস জাতীয় মালিকানাধীন থাকবে। ব্যক্তিগত মালিকানা (স্থাবর-অস্থাবর) সীমিত করা হবে অর্থাৎ নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত সম্পদ ও সম্পত্তি জাতীয় মালিকানাধীন থাকবে। সংগতিসম্পদের উপর কর আরোপ করা হয়, যার সর্বোচ্চ সীমা হবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। দেশের ভূমি জাতীয় মালিকানাধীন থাকবে। জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন করা হবে। যেসব গণতান্ত্রিক দেশে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য থাকবে, সেখানে সর্বরাজ্য পার্টি হযরত উমরের সিদ্ধান্ত মাফিক জমির মালিকানা ত্যাগের জন্য এবং ইমাম আবূ হানীফার সিদ্ধান্ত মুতাবিক চাষাবাদ ছাড়ার জন্য জমিদারদেরকে বাধ্য করবে। প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারকে অতটুকু ভূমি অবশ্যই দিতে হবে, যতটুকু তারা নিজেরা চাষাবাদ করতে সক্ষম।

সুদী লেনদেন বন্ধ করা হবে। শ্রমিক শ্রেণীর পূর্বকার ঋণ মওকুফ করা হবে।

সরকারি মালিকানায় প্রদত্ত কারখানাগুলো মজদুরদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। মজদুরদেরকে মুনাফার অংশ দেয়া হবে।

শ্রমিকদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সাহায্য দেয়া হবে। তাদের জন্য পরিচ্ছন্ন বাসভবনের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হবে।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কো-অপারেটিভ সোসাইটির হাতে দেয়া হবে। ব্যবসায়ীরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে যোগদান করে সোসাইটির সদস্য হতে পারবে।

বহির্বাণিজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের হতে থাকবে। প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্টদের ধর্মকে স্টেট-ধর্মরূপে পরিগণিত করা যাবে। তবে শর্ত হলো-ঐ ধর্ম যেন 'পার্টির' উপর্যুক্ত আর্থ-সামাজিক নীতির পরিপন্থী না হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র:

প্রত্যেকটি স্টেটের ধর্মগুলোর সাথে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সম্পর্ক থাকবে না। কোন ধর্মে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের থাকবে না। তার মানে কেন্দ্রীয় সরকার হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার।

পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা ও বর্হিবাণিজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে।

গণতান্ত্রিক স্টেটসমূহ তাদের সংখ্যানুপাতে আর্থিক, তামাদ্দুনিক ও সামরিক গুরুত্বের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারে প্রতিনিধি প্রেরণ করবে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

সাম্রাজ্যবাদের অবসান এবং উল্লিখিত নীতিমালা অনুসারে এশিয়ার আযাদ গভর্নমেন্টসমূহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এশিয়াটিক ফেডারেশন গঠন করা হবে, যাতে রাশিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী আরো ভাবলেন, এর ফলে তাঁর ইসলামী আন্দোলন যে কোন প্রতিকূল ঝড়ঝাপটার হাত থেকে রক্ষা পাবে; ইমলামের প্রচার ইউরোপেও বৃদ্ধি পাবে। এর কপিসমূহ তিনি গোপন ডাকযোগে ভারতের নেতাদের নামে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো বা তার কিছুটা অংশ ভারত সরকারের হাতে পড়ে। সরকার সেগুলো প্রবেশ ও প্রচার বন্ধ করে দেন। ১৯২৫ *সালের ১৮ মে লাহোরের 'জমিদার' এবং 'সিযাসত' পত্রিকায় ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হয়।*[২১]

'জমিদার' পত্রিকার নিষেধাজ্ঞাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

জমিদার, ১৮ মে ১৯২৫

একটি পুস্তিকার প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা,

সিমলা ১৫ই মে: সামুদ্রিক শুল্কনীতির আওতায় সরকার ভারতে একটি উর্দু পত্রিকা বা এর অনুবাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই পত্রিকার নাম 'ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধীনে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ২য় রূপ' অথবা 'কাবুলে কংগ্রেস কমিটির প্রতিষ্ঠা এবং মহাভারত সর্বরাজ্য পার্টির কর্মসূচি'। এই পুস্তিকাটি লিখেছেন উবায়দুল্লাহ্ ও যাফর হাসান। পুস্তিকাটি ইস্তাম্বুলের মাহমূদ-বে প্রেস ১৯২৪ সালে প্রকাশ করেছেন। উক্ত ব্যক্তিদ্বয় হলেন যথাক্রমে কাবুলের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারি।

সিয়াসত, ১৮ মে ১৯২৫

কনস্টান্টিনোপলে প্রকাশিত উবায়দুল্লাহ্র রচনাবলির প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা,

সিমলা, ১৫ মে: সামুদ্রিক শুল্কনীতির আওতায় ভারত সরকার ভারতে একটি পুস্তিকার প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছেন– পুস্তিকাটি উর্দু ভাষায় হোক বা অন্য কোন ভাষায়ই হোক। পুস্তিকাটির শিরোনাম হলো: 'কংগ্রেসের অধীনে ভারতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়' বা 'কাবুলে কংগ্রেস কমিটির প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় মহারাষ্ট্রের স্বরাজ পার্টির কর্মসূচি'। পুস্তিকাটি কনস্টান্টিনোপলের মাহমূদ– বে প্রেস থেকে ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এতে কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক– উবায়দুল্লাহ্ ও যফর হাসানের দস্তখত রয়েছে।[২২]

যাফর হাসান তুর্কী ভাষায়ও ঐ প্রচারপত্রের অনুবাদ করেন এবং তা তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী গভর্নমেন্ট যেন এটা বুঝতে পারেন যে, তুর্কী সরকারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন উদ্দেশ্য উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ও তাঁর 'সর্বরাজ্য দলের' নেই, বরং তাঁদের উদ্দেশ্য হলো নিজ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চিন্তা-চেষ্টা করা। উর্দু কপিগুলো ভারত সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ায় কিছুটা পরিবর্তন সহকারে ঐ কর্মসূচির ইংরেজি অনুবাদও করানো হয় এবং ভারতীয় বিশ্বস্ত লোকজনের মাধ্যমে তা গোপনে ভারতে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

সিন্ধী ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে তাঁর প্রচারিত কর্মসূচি সম্পর্কে লালা লাজপত রায়ের (১৮৫৬-১৯২৮) সাথে সামনা-সামনি আলোচনা করেন। ড. আনসারীর সাথেও পত্রযোগে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কিন্তু কেউ তাঁর ঐ কর্মসূচিকে পছন্দ করেন নি। অথচ তাঁরা সিন্ধীকে বিকল্প পথও দেখাতে পারেন নি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্রুর সংগে পত্রালাপ করলে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

সিন্ধীর রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মসূচির কিছুটা প্রশংসা করেন। সেজন্য তিনি আনন্দ অনুভব করেন। তিনি তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, তাঁর মুরব্বীরা তাঁর কথায় সায় দেন নি, অথচ কোন ভাল বিকল্পও পেশ করতে পারেন নি। বরং তাঁরা তাঁকে হাজার/ দুই হাজার বছর পেছনে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী বলেন, "ইস্তাম্বুলে লালা লাজপত রায়ের *সাথে ভাবের বিনিময় হয়; তেমনি ড. আনসারীর সাথেও বিস্তারিত কথাবার্তা হয়। আমার* মুরব্বীরা সেই কর্মসূচি মানতে পারেন নি, আবার ভাল বিকল্পও বাতলাতে পারেন নি। পরন্তু চেষ্টা করেছেন যেন আমাকে হাজার দু'হাজার বছর পেছনে নিয়ে দাঁড় করাতে পারেন। হাঁ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে তা ভাল লেগেছে বলে তিনি দু'একটি কথা লিখে জানিয়েছেন। সেটা ছিল আমার জন্য আনন্দের বিষয়।"

সিন্ধী তাঁর ঐ কর্মসূচিতে অহিংসনীতিকে অবশ্য পালনীয় বলে গণ্য করেন। তিনি 'আত্মকথায়' বলেছেন, এতদিন তিনি অহিংসনীতিকে একটি নীতিমূলক বিষয় বলে মনে *করতেন। কিন্তু এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি গ্রহণ করা* যায়, সেটা তিনি মহাত্মাগান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) থেকেই শিক্ষা করেছেন। তিনি আরো লিখেছেন, মহাত্মাগান্ধী তাঁকে হযরত ঈসার (আঃ) শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সিন্ধী আরো লিখেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হতো; তাই এই শিক্ষা সেখানেই পাওয়া যাবে, মুমিনের হারাধন মনে করে সেখান থেকেই তা লুফে নিতে হবে।[২৩]

গ) মক্কা ভ্রমণ:

১৩৪৪ হিজরী মুতাবেক ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে হজ্জ মৌসুমে পবিত্র মক্কায় খিলাফতের অধিবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা কামাল পাশা কর্তৃক খিলাফত প্রথা রহিত হবার (৩ মার্চ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ) তিন দিন পর মক্কার শরীফ হুসাইন নিজেকে ইসলামের খলীফা বলে দাবী করেন। কিন্তু ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে ওয়াহাবী মতাবলম্বী *ইবন্ সউদ তায়েফে আক্রমণ করলে শরীফ হুসাইন ব্রিটিশ জাহাজযোগে সাইপ্রাস পলায়ন* করেন। ইবন্ সউদ মক্কার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি খিলাফত অধিবেশন আহ্বান করেন। সে অধিবেশনে ভারতসহ মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিগণ সমবেত হন। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর বন্ধুরাও সেখানে উপস্থিত হন। তাই তিনি ভারতীয় বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইটালীর পথ ধরে মক্কায় পৌঁছার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ অধিবেশন শেষ হওয়ার পর ১৩৪৫ হিজরী সফর মুতাবেক ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্টে তিনি ইটালী ও সুইজারল্যান্ড হয়ে মক্কায় পৌঁছতে সক্ষম হন।[২৪]

তিনি নিজের রাজনৈতিক নাজুক অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ ছিলেন। তাই হেযায গভর্নমেন্টকে তিনি এ মর্মে নিশ্চয়তা দেন যে, তিনি কোন রাজনৈতিক প্রপ্যাগান্ডা করবেন না। হেযায সরকার তাঁকে প্যান-ইসলামবাদী না ভেবে জাতীয়তাবাদী বলে ধরে নিলেন এবং এমনি করে তিনি সেখানে নিরাপদে থকার সুযোগ পেলেন। গভর্নমেন্ট তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় *স্বাধীনভাবে থাকতে দেন। মামুলি কোন সাহায্যের জন্য তিনি কোন সময় আবেদন করলে* সরকার সেই প্রয়োজন মেটাতেন।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

হেযাযে প্রবেশকালে তিনি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। সেখানে যারা তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলন, তারা তাঁকে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মাঝে ডুবে থাকতে দেখেছেন।[২৬]

মক্কায় দীর্ঘ বার বছর অবস্থান করে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী লেখা-পড়া, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।[২৭]

সিন্ধী মক্কায় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তিনজন ভারতীয় ও একটি আরব পরিবার দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন। শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব দিহ্লবী এবং আবদুস্ সাত্তার দিহ্লবী *আবুশ শরফ মুজাদ্দিদীর গ্রন্থগারসমূহ থেকে তিনি সাহায্য গ্রহণ করেন। আরব খান্দানের শায়খ* মুহাম্মদ আবদুর রায্যাক ও শায়খ আবুস্ সামাহ্ যাহেরের নিকট থেকেও তিনি শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্যপ্রাপ্ত হন।[২৮]

সিন্ধী বলেন, "তিনজন ভারতীয় এবং একটি আরব পরিবার দ্বারা জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি। এদের মধ্যে প্রথম শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব দেহলবী, দ্বিতীয় আব্দুস সাত্তার বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব দেহলবী, তৃতীয় আবুশ্ শরফ মুজাদ্দিদী। তাঁদের লাইব্রেরি থেকে ফায়দা উঠিয়েছি। আরব পরিবার দ্বারা উদ্দেশ্য, শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রাযযাক বিন হামযাহ (শায়খুল হাদীস মক্কা) এবং শায়খ আবুস্সামে আব্দুস যাহির ইমামুল হরমের পরিবার।[২৯]

মক্কায় থাকাকালে সিন্ধী ১৩/ ১৪ বছর (১৯২৬- ১৯৩৯) ধরে কুরআন ও শাহ্ ওলীউল্লাহ্র '*হুজ্জা-তুল্লাহিল্ বালিগা*' গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তফসীর-এ- কুরআনের যে *জায়গাগুলো তাঁর কাছে ইতোপূর্বে কঠিন বলে মনে হতো, শাহ ওলীউল্লাহ্র নীতি অবলম্বনে* তিনি সেগুলো পুরোপুরি আয়ত্ব করেন।

ঐ জ্ঞানচর্চায় তিনি কুরআনে যুগোপযোগী বাস্তব পদক্ষেপের একটা উচ্চ আদর্শ দেখতে পান। তিনি শাহ্ সাহেবের বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ যথা: বুদুর-এ-বাযিগাহ, খায়র-এ-কাসীর, তাফ্হীমাত এ-ইলাহিয়াহ্, সাত্-আত্ ইত্যাদি ভালরূপে অধ্যয়ন করেন। তাছাড়া শাহ্ সাহেবের রচনাবলি আয়ত্ব করার জন্য যেসব সাহায্যকারী গ্রন্থ রয়েছে, যেমন মাওলানা রফী উদ্দীনের তাক্মীলুল্- আয্-হান, মাওলানা ইসমাঈল শহীদের আবাকাত্, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেমের কাসেমুল্- উলূম, তাকবীর-এ দিল্ পযীর ও আব-এ-হায়াত সেগুলো তিনি ব্যবহার করেন। তিনি সেখানে ঐ সব কিতাব এবং কুরআন শরীফ শিক্ষাও দেন। আল্লামা মূসা জারুল্লাহ্ মক্কায় উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর নিকট শাহ্ ওলীউল্লাহর দর্শন অধ্যয়ন করেন। আল্লামার ভাষায়, উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী আরবীতে, দেড়শ' দিনে পুরো কুরআনের তফসীর বর্ণনা করেন। আল্লামা মূসা দু'হাজার চারশ' পৃষ্ঠায় তা লিপিবদ্ধ করেন। তন্মোধ্যে করাচীস্থ 'বায়তুল্ হিকমত'- এর সেক্রেটারী আবু সাঈদ গুলাম মুস্তফা সিন্ধী ১ম খণ্ড (পৃঃ ৩৪৪) করাচী থেকে প্রকাশ করেছেন, যাতে সূরা-এ-ফাতিহা ও বাকারার তফসীর স্থান পেয়েছে। এ তফসীর ছাড়াও সিন্ধী 'কুরআনী দস্তুর এ-ইনকিলাব' নামক অন্য একটি গ্রন্থও রচনা করেন, যা ১৯৪৩ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭।

২। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

৩। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭।

৪। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

৫। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪-৩৫।

৬। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫-৩৬।

৭। 'দৈনিক জমী'অত', দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৫।

৮। মুজীবুর রহমান, মওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

৯। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৯।

১০ 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭- ১৭৮।

১১। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

১২। সাঈদ আহমদ, আকবরবাদী, মাওলানা, 'মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী আওর উনকে নাকিদ', মাকতবা- এ রাহমানিয়া, দেওবন্দ, ১৯৭২, পৃঃ ৩৭- ৩৮।

১৩। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

১৪। সাঈদ আহমদ, আকবরবাদী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮; মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।

১৫। আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৭-৪০৮।

১৬। 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭।

১৭। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

১৮। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

১৯। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬২; 'নকশ-এ হায়াত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭।

২০। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫২- ৪৬০; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭-১০০।

২১। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

২২। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩-৬৪।

২৩। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭-৩৮।

২৪। আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৮।

২৫। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

২৬। মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা, আযাদী আন্দোলনের বীরসেনানী মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, চৌধুরীপাড়া- ঢাকা, ৩১ শে আগস্ট, ১৯৯২, পৃঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

২৭। আবুদর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, ৪০৯।

২৮। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

২৯। আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৯।

৩০। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর কর্মতৎপরতা:

মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন-শোষণ থেকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যেই কাবুল গমন করেন। কিন্তু তাঁর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও দেশে ফেরার পরিবেশ না থাকায় তিনি আর দেশে ফিরেন নি। তাই মস্কো, আংকারা এবং মক্কায় ভ্রমণ ও অবস্থান করেন।[১]

হেযাযে সুদীর্ঘ প্রবাস জীবনে, মাওলানা সিন্ধী তাঁর চিন্তা ও গবেষণার ফলাফল এবং অভিজ্ঞতা ভারতবাসীর গোচরে আনয়ন করতে এবং জীবনের মূল্যবান সঞ্চয় সর্বস্তরের গণমানুষের মাঝে বিতরণ করতে সর্বত্র সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু অবস্থা প্রতিকূলে থাকার কারণে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়ে উঠছিল না।[২] এভাবে দীর্ঘ ২৪ বছর নির্বাসিত জীবন কাটানোর পর[৩] ১৯৩৬ সাল থেকেই 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে ভারতে ফিরিয়ে আনার কূটনৈতিক চেষ্টা তদবীর করতেছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের নিশ্চিত আশা তাঁর না থাকায় তিনি নৈরাশ্যের শিকারেই পরিণত হন।[৪] ব্রিটিশ শাসকদের কাছে সিন্ধী ছিলেন তাদের শাসন ক্ষমতা মূলোউৎপাটন-পরিকল্পনার হোতা।[৫] তাঁর কতিপয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুও তাঁকে ভারতে না প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ দেন। তাদের ধারণা, সিন্ধীর ন্যায় একজন সংগ্রামী ও স্বাধীনতাকামী নেতা হয়তো ভারতে পরাধীন জীবন যাপন করে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন। তবে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (১৮৭৮-১৯৫৭) সিন্ধীকে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য উৎসাহিত করেন এবং এর জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁকে দরখাস্ত করতে অনুরোধ করেন।[৬] তদানুসারে তিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকটে দরখাস্ত করেন। চৌধুরী গুলাম রসূল ও স্যার আবদুল্লাহ্ হারূন সর্বপ্রথম সিন্ধীর প্রত্যাবর্তনের জন্য চেষ্টা তদবীর করেন। এদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' এবং ভারতের অন্যান্য দল চেষ্টা করতে থাকে। সিন্ধুর প্রাদেশিক সরকার তাঁর জন্য জামিন হন।[৭]

এভাবে সকলের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১ নভেম্বর ১৯৩৮ সালে তিনি দেশে ফেরার অনুমতি লাভ করেন এবং ১ জানুয়ারি ১৯৩৯ সালে তাঁকে পাসপোর্ট দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ বছর ৭ মার্চ হজ্জ সম্পাদন শেষে সিন্ধী দেশে ফিরে করাচী বন্দরে অবতরণ করেন।[৮]

দেশে ফেরার পূর্বক্ষণে ভারতীয় উপমহাদেশের পত্র-পত্রিকাসমূহে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর জীবনী প্রকাশিত হতে থাকে। তাতে কিছু ভুলভ্রান্তি লক্ষ্য করে মক্কা থেকে ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে গুলাম রসূল সম্পাদিত 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় (লাহোর) তিনি নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন।[৯] তখন ভারতের অন্যান্য পত্রিকাগুলোতেও তাঁর স্বরচিত জীবনীটি পুনর্মুদ্রিত হতে থাকে। 'কায়েদ-এ-মাহ্' পত্রিকায় ১৩৫৮ হিজরী সনের রবীউল আউওয়াল মোতাবিক ১৯৩৯ সালের মার্চ-এপ্রিলে তা পুনঃ প্রকাশিত হয়। উক্ত আত্মজীবনীতে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেন।[১০] তিনি বলেন, "দেশে ফিরে আমার প্রোগ্রাম এ ধরনের হবে আশা করছি:

Dhaka University Institutional Repository

১। সর্বদা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাধারণ সদস্য হয়ে থাকব।

২। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসনীতি অবলম্বন করব।

৩। ইমাম ওলীউল্লাহ্র দর্শন শিক্ষা দেয়া, প্রচার করা এবং এর প্রতি জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে জেনারেল শিক্ষিত ব্যক্তি ও ধর্মীয় আলীমদেরকে আহ্বান করব। কোন হিন্দু বা খ্রীষ্টান এ দর্শন শিখতে চাইলে তাকে পূর্ণ সাহায্য করব।

৪। পরিস্থিতি কখনো অনুকূলে আসলে মহাত্মাগান্ধীর অহিংসনীতি অবলম্বনে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে ইমাম ওলীউল্লাহ্র চিন্তাধারার আলোকে অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য স্বতন্ত্র দল গঠনের কর্মসূচি পেশ করব।"[১১]

ক) করাচীতে অবতরণ ও বিবৃতি প্রদান:

৭ মার্চ ১৯৩৯ সালে মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী সিন্ধীয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর হজ্জযাত্রীবাহী 'আল-মদীনা' নামক জাহাজে করে করাচী পৌঁছলে তাঁর প্রতি বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মুসলিম লীগ, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং জমীঅতুল উলামা-এর সাংবাদিকবৃন্দ জাহাজ ঘাটে সমবেত হন। নেতৃবৃন্দের মধ্যে সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাহ্ বখ্শ এবং রাজস্বমন্ত্রী এলাহী বখ্শও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্টীমার থেকে অবতরণ করার পর সামরিক কায়দায় সিন্ধীর প্রতি অভিবাদন জ্ঞাপন করা হয়। অতঃপর তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কুসল বিনিময় করেন। ব্রিটিশ ভারত সরকারের সংগে আলাপ-আলোচনা করে দেশে ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা রাখার জন্য সিন্ধী প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানায়।

করাচীতে অবতরণের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে নিজ নিজ দলে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। সিন্ধী কোন দলের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন, তা নিয়ে এক সমস্যার সম্মুখীন হন। তাই তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্পর্কে সিন্ধী তার মতামত স্পষ্ট করে বলেন, "যারা এ উদ্দেশ্যে আমার নিকট যাতায়াত করছেন যেন আমি মুসলিমলীগের লোক বলে নিজের পরিচয় দেই, তাঁরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ মনোরথ হবেন।"[১২]

সিন্ধী জোর দিয়ে আরো বলেন, "কংগ্রেস আমার স্বর্গ, আমি কখনো এর বাইরে যাবো না। বিশেষ পর্যালোচনা সহকারে এবং সুদৃঢ় মতামত নিয়েই আমি বহু বছর আগে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হই। ঐ সময় আমি কাবুলে একটি কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করি। তদবধি আমি কংগ্রেসের একজন দ্বীন সেবকরূপে এর বাণী প্রচারকল্পে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছি।"

পরিশেষে তিনি বলেন, "ধর্মের উপর সুদৃঢ় আস্থা রেখে আমি বলতে চাই যে, আমি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী। কোন গোঁড়ামিতে আমি বিচলিত হবো না। কিছু গ্রহণ করার পূর্বে সে সম্বন্ধে আমি পুরোপুরি অবহিত হতে চাই। কংগ্রেসেও যদি দেখতে পাই যে, তাঁদের কার্যের সাথে আমার মতের অমিল রয়েছে, তখন আমি আমার নিজস্ব দল গঠন করবো। তথাপি আমি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকবো। কারণ এর আদর্শ হলো ভারতের মুক্তি।"[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা, উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী করাচী বন্দরে অবতরণ করার পর সেখান থেকেই তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করেন। দীর্ঘ ২৪ বছরের প্রবাস জীবনে তাঁকে যে সংকটের মোকাবেলা করতে হয়েছে, সেসব কথা বলার জন্য ব্যাকুল হন।[১৪]

খ) দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কর্মতৎপরতা:

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী সর্বপ্রথম ৩ জুন ১৯৩৯ সালে 'জমীঅত উলামা-এ-হিন্দ'-এর প্রাদেশিক শাখা 'উলামা-এ-বাঙালা'-এর কলকাতায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এ অধিবেশনের মাধ্যমে তিনি যে সকল প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক সংগঠন দলগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এসময় তিনি প্রায় ২৪ বছরের (১৯১৫-১৯৩৯) নির্বাসন-লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, "দুই শতাব্দীর উন্নতির ফলে ইউরোপে যে নব বিপ্লব সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কে এ দেশের জনসাধারণ অনবহিত। তাদেরকে সেই বিপ্লবের অনুসরণ করতে হবে; অতীতের জ্ঞান-গরিমার দোহাই দিয়ে কোন লাভ নেই; পৃথিবীর জাতিপুঞ্জে স্বজাতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; ইউরোপীয় রাজনীতির আলোকে এদেশে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটাতে হবে; ভারতীয় কৃষক-মজুরদের জীবনের মানকে ইউরোপীয় কৃষক-মজুরদের সমতুল্য করতে হবে।" উক্ত সমাবেশে সিন্ধী ইউরোপীয় সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক বক্তব্য রাখেন। ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, "এখানকার হিন্দুসভ্যতা ও আধুনিক মুসলিমসভ্যতা- উভয়ই ধর্মভিত্তিক, আর ইউরোপের বর্তমান আধুনিক সভ্যতা হলো ধর্মবিবর্জিত; তবে সেটা হলো দর্শন ও বিজ্ঞানভিত্তিক। তাই এদেশে বিবর্তন আনতে হলে সেই সভ্যতাকেও বুঝতে হবে।"[১৫]

উক্ত অধিবেশনে সিন্ধী ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্পর্কে আরো বলেন, 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'কে ভারতের সকল রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ধরে নেয়া উচিত। মুসলিম সমাজে মুসলিম লীগের ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকলেও তা কংগ্রেসের সমকক্ষ হতে পারে না। এ দেশের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ নিজেদের ধর্মীয় দর্শনের সাথে ইউরোপীয় দর্শনের সমন্বয় সাধন করতে পারেন। শুধু ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানকে জাতীয় আন্দোলনে অঙ্গীভূত করলেই দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। ইমাম ওলীউল্লাহর বৈপ্লবিক রাজনৈতিক কর্মসূচি অবলম্বন করলে ইসলামের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক রক্ষা পাবে। ইউরোপের বিপ্লবীরাও তাঁর চিন্তাধারা ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। তাঁর রাজনীতি অনুসরণ করতে পারলে জমীঅতে উলামায়ে হিন্দের পক্ষে ইউরোপীয় বিপ্লব অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।"[১৬]

ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পারিক যোগসূত্র বিশ্লেষণ করে 'উলামা-এ-বাঙালা'- এর ঐ সমাবেশে সিন্ধী বলেন, "ইউরোপের রাজনীতি ধর্মবিবর্জিত; দর্শন ও বিজ্ঞানই হলো তাদের *সমাজের ভিত্তি; এদেশের ধর্মবিদরা নিজেদের ধর্মীয় দর্শনের সাথে ইউরোপীয় অর্থনীতির* সমন্বয় সাধন করতে পারেন।[১৭]

ঐ অধিবেশনে তিনি আরও বলেন, "দেশীয় আলিম ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উচিত হবে, ব্রিটিশ সরকারের দুইশত বছর ধরে জড়-গজানো শাসনব্যবস্থা থেকে যথাসম্ভব সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করা; ইউরোপের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পরিহার করা; ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করা। সূফীবাদের উৎস সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য হল, "ইসলামী দর্শন তথা সূফীবাদ হলো মূলত হিন্দু আধ্যাত্মবাদ, যাহা ভারতীয় মুসলিম সুফীদের দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করেছে, আর ইমাম ওলীউল্লাহ ছিলেন এ পূর্ণতা সাধনের শিক্ষাগুরু।[১৮]

গ) যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি গঠন:

১০ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সালে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী কংগ্রেসের অধীনে 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি, নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এ পার্টির সদর দফতর করেন সিন্ধুতে। এ পার্টির প্রচার ও প্রসার না ঘটায় এটি অনেকটা কাগজে-কলমেই ছিল। ইহা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। তবে অন্য কোন এলাকাবাসী 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর' পার্টিতে যোগদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তার জন্য গঠনতন্ত্রে ব্যবস্থাও রাখা হয়। করাচী, লাহোর ও দিল্লীকে এ পার্টির তিনটি আঞ্চলিক উপ-দফতর রাখা হয়। এ পার্টির আদর্শ ও কর্মসূচি বর্ণনা করে উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ১৯৩৯ সালের ১০ ডিসেম্বর 'দারুর-রাশার সিন্ধসাগর' থেকে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধে তিনি 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি, নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, গংগা-যমুনা হলো হিন্দু সভ্যতার উৎস, আর সিন্ধু হলো মুসলিম সভ্যতার সূতিকাগার। যদি উক্ত দুই অঞ্চলের লোকদেরকে সিন্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে দুই এলাকার লোকদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করা সম্ভব হয় তাহলে জটিল সমস্যাসমূহেরও সুরাহা করা যাবে।[১৯] প্রবন্ধের মূলকথা হল:

১. উপমহাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের ভাঙা-গড়ার পেছনে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য রয়েছে। উভয় ধর্মের মানবসেবকগণ শাহ ওলীউল্লাহর দর্শনকে সামনে রেখে অগ্রসর হলে ভারত মিলন মোহনায় পরিণত হবে। অহিংসনীতি অবলম্বন করে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করাই হলো এ দলের (যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি) রাজনৈতিক দর্শন। ভারতবর্ষের কৃষক, শ্রমিক, মজুর ও মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ইউরোপের কৃষক, মজুর ও কারিগরদের সমপর্যায়ের করা।

২. ভারতবর্ষকে একটি দেশ না ধরে ইউরোপের ন্যায় কয়েকটি দেশের যৌগিক বলে গণ্য করতে হবে। অভিন্ন ভাষা ও আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে দেশের প্রদেশগুলোকে পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে।

৩. নারী-পুরুষ সবাইকে সমান অধিকার দিতে হবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জাতীয়তাবাদের উন্নতি করতে হবে।

৪. জনসাধারণকে মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে হবে। নাগরিকগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

৫. ইউরোপের উন্নত শিল্পবিপ্লবকে ভারতবর্ষে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. চিন্তা, নৈতিকতা, রাজনীতি ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে শাহ ওলীউল্লাহ্র দর্শনকে পার্টির যুক্তিসংগত আদর্শ বলে গণ্য করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. গোটা ভারতবর্ষকে একটি ফেডারেশনের অধীনে নিয়ে আসতে হবে এবং ফেডারেশনের পূর্ণতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ দিন ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীন থাকতে হবে।

৮. উর্দু বা ইংরেজিকে ফেডারেশনের রাষ্ট্র ভাষা করতে হবে।[২০]

৯. নারী-পুরুষ সবাইকে দেশরক্ষার কাজে অংশ নিতে হবে।

১০. ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে উপযুক্ত লোক এদেশের সাহায্যে এগিয়ে আসলে তাদের স্বাগত জানাতে হবে।[২১]

১১. যেসব ভারতীয় ভাষা এ যাবত আরবি হরফে লিখিত হয়ে আসছে, সেগুলোর জন্য পৃথক পৃথক হরফের ব্যবস্থা করতে হবে; নতুবা সেগুলোকে রোমান হরফে লিখতে হবে, যাতে টাইপ-রাইটারের ব্যবহার অধিকতর সহজ হয়।

১২. ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে উর্দুকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে রোমান অক্ষরে লিখতে হবে।

১৩. কৃষকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

১৪. পার্টির জমিদার সদস্যরা কৃষকদের নিয়ে প্রণীত তাঁদের চুক্তি পুরোপুরি মেনে চলবে; অনুরূপভাবে কৃষক সদস্যরাও সরকারের নির্দিষ্ট খাজনা এ জমিদারদের প্রাপ্য অংশ সঠিকভাবে আদায় করবে।[২২]

সুফীবাদ সম্পর্কে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী উক্ত প্রবন্ধে বলেন, "বাদশা আকবরের শাসনামল (১৫৫৬- ১৬০৫) থেকেই ভারতবর্ষের মুসলিম চিন্তাবিদগণের একটি দল ইবনে আরাবীর দর্শন বা বেদান্ত দর্শনের সংস্কার ও পূর্ণতা সাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন।"

ভারতীয়দের জীবনধারার জন্য একটি অভিন্ন রাজনৈতিক ভিত্তিপ্রস্তর করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। শাহ ওলীউল্লাহ-এর দর্শনই হলো উক্ত সব প্রচেষ্টার মূল। উবায়দুল্লাহ সিন্ধির মতে, "এ *দর্শন দ্বারা সকল ধর্মের মধ্যে একটি ঐক্যমত ও সেতুবন্ধন তৈরী করা যেতে পারে এবং এর* মধ্যে মানবতার পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসের ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।"[২৩]

ঘ) দর্শন সেবা সমিতি গঠন:

২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সালে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী 'যমুনা-নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি'র অধীনে পীরঝাণ্ডার (হায়দারাবাদ) 'দারুর রাশাদ' মাদ্‌রাসায় এবং ২ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সালে করাচীর মাযহারুল উলূম মাদ্‌রাসায় আলিমদের নিয়ে 'জমীঅত-এ-খুদদামুল হিকমত' নামক একটি 'দর্শন সেবা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী দর্শনের সেবা ও হেফাযত করা এবং মুসলিমদের পারস্পারিক অনৈক্য দূর করাই ছিল এ সমিতির মূল লক্ষ্য। এ সময় 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি'র রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল দিল্লী, লাহোর এবং করাচীতে। পীরঝাণ্ডার দারুর রাশাদ মাদ্‌রাসা, করাচীর মাযহারুল উলূম মাদ্রাসা ও দেওবন্দের দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় ছিল এর জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী-এর মুর্শিদের তৃতীয় খলীফা মাওলানা রশীদুদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন দারুর রাশাদ কেন্দ্রের সভাপতি। মাযহারুল উলূম মাদ্‌রাসা ও দারুল উলূম মাদ্‌রাসা কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন উক্ত মাদ্‌রাসাদ্বয়ের তত্ত্বাবধায়কগণ। শাহ ওলীউল্লাহকে সমস্ত উলূম-এ শরীআহ্ তথা কুরআন-হাদীস, দর্শন ও রাজনীতির ইমাম মেনে তাঁর রচনাসমূহকে মূল ভাষায় শিক্ষা করা ও শিক্ষাদান করা ছিল 'জমীঅত-এ-যুদদামুল হিকমত'- এর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত *'বায়তুল হিকমত'-এর মূল উদ্দেশ্য। 'বায়তুল হিকমত'-এর নীতিমালার মধ্যে কুরআন এবং* শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র দর্শন শিক্ষা দেয়া হবে এবং এর গ্রন্থাগারে এমন সব গ্রন্থ সংগ্রহ করা হবে, যাতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় দার্শনিকগণের সাথে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা সহজতর হয়, এটাও ছিল।[২৪]

১২ জুলাই ১৯৪০ সালে মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী প্রদেশের ঠাট্টা জেলার কংগ্রেস কমিটির কনফারেন্সে লিখিত উদ্বোধনী ভাষণে কংগ্রেসের প্রতি প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জ্ঞাপন করেন। কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে তাঁর সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র দর্শন ও কুরআন অনুধাবনে সহায়তা হয়েছে বলেও তিনি ব্যক্ত করেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনে ১৮৫৭ সালের স্বাধীকার সংগ্রামের পর দেওবন্দ মাদ্‌রাসার ভূমিকা ও দিল্লীর মুসলিম নেতাগণ কিভাবে 'কো-অপারেটর' ও 'নন-কো-অপারেটরে' বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন তাও বিশ্লেষণ করেন। ঐ বক্তৃতায় ইউরোপের উদারনীতি ও প্রযুক্তিনীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, "উদারনীতির ফলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশ গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়েছে এবং শিল্পবিপ্লবের ফলে বিশেষ আর্থিক উন্নতি লাভ করেছে। তাই ভারতীয়দেরকেও সে পথে ধাবিত হতে হবে।"[২৫]

থাট্টা কংগ্রেসের অধিবেশনে শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী মত প্রকাশ করেন যে, ইউরোপে যে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে তা ভারতে আজ না হয় কাল অবশ্যই ঘটবে; তা না হলে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক উন্নতি থেকে বঞ্চিত হতে থাকবে। এবং দেশবাসী পরিণত হবে পরের অস্পৃশ্য দাসে। তবে উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের প্রশংসা করার সাথে সাথে এর একটি দুর্বল দিকও তুলে ধরেন। তাঁর ভাষায়- সেখানের বৈজ্ঞানিক আর উন্নতির সাথে ধর্মীয় আইন-কানুনের কোন সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণত সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করারই উপক্রম হয়েছে। সিন্ধী ধর্ম ত্যাগ করতে পারবেন না বলে উল্লেখ করে বলেন, ধর্মহীনতা থেকে বাঁচতে হলে, 'ওয়াহদাতুল অজুদ'-এর প্রচার ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। কারণ এটি হিন্দু দর্শনের সারকথা। এভাবে একজন বৈজ্ঞানিককেও আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করানো সম্ভব। শাহ্ ওলীউল্লাহ্ তা মেনে নিয়ে যে দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেটা দ্বারা সব ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ পিপাসা মিটাতে পারে।[২৬] উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়ে বিলাসী জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে; এমনকি তারা পরিশ্রম ও করতে চায় না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিও আগ্রহ থাকে না। কিন্তু এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগে তাদেরকে সব কিছুই করার মানসিকতা থাকতে হবে।[২৭]

উব্যায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ভারতের বঙ্গ ভঙ্গ রদ ও খিলাফত আন্দোলনের জয়-পরাজয় সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, কলকাতার নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর (১৮৪৮- ১৯২৫) নির্দেশে নিজ দেশের জন্য বঙ্গ ভঙ্গ রদ আন্দোলন হয় এবং তা জয়যুক্ত হয়। কিন্তু খিলাফত আন্দোলন করা হয়েছিল তুরস্কের জন্য। আর তুরস্কের জনগণের নেতৃত্বস্থানীয়রা ছিলেন ইউরোপীয়

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শের পক্ষে। ভারতীয় মুসলমানরা খিলাফত আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু তুরস্কসহ মুসলিম দেশের যথাযথ সমর্থনের অভাবে তা ব্যর্থ হয় এবং তুর্কীরা খিলাফত তুলে দিয়ে ইউরোপীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় সরকার গঠন করেন এবং তুরস্কের উন্নতি সাধনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন।[২৮]

থাট্টা সমাবেসে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ১৯১৬ সালের 'লক্ষ্ণৌ-চুক্তি' ও মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ও সমর্থক বৃদ্ধি সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করেন। ১৯১৬ সালের 'লক্ষ্ণৌ-চুক্তি' তে প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহকে সংখ্যালঘিষ্ট প্রদেশে পরিণত করার গলদ সিন্ধী তুলে ধরেন। আলীগড়পন্থীরা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপরীতে আলাদা (স্বতন্ত্র) একটি রাজনৈতিক দল (মুসলিম লীগ, ১৯০৬) গঠন করেন এবং যাতে দেওবন্দের প্রতিক্রিয়াশীল লোকজন প্রাধান্য লাভ করেন; এমনিভাবে সাধারণ মুসলমানরাও কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তবে উদারপন্থী কতিপয় মুসলিম পূর্ববৎ কংগ্রেসের সমর্থক রয়েছেন বলে উল্লেখ করেন।[২৯]

একজন কংগ্রেস নেতা হয়েও উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের অনুদারতা ও উদাসীনতা সমর্থন করেন নি। এ প্রসংগে তাঁর মত হলো- কংগ্রেসীরা নিজেদেরকে স্বাধীকারের একচ্ছত্র অধিকারী মনে করেছেন। কংগ্রেস হিন্দুদেরকে তাদের আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে এবং মুসলমানদের অধিকারটুকু ফিরিয়ে দিলে ব্যাপারটা এরূপ দাঁড়াতো না। হিন্দুদের অবিচার ও অত্যাচারের ফলেই 'জমীঅতুল উলামা' ও 'আহরার পার্টির' দেওবন্দী নেতৃবৃন্দ আজ জনসাধারণের সামনে কংগ্রেসের নাম নিতে ভয় পাচ্ছে। মুসলিমরা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সাথে খিলাফত ও স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তারা সর্দার প্যাটেলের (১৮৭৫- ১৯৫০) একনায়কত্বের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছেন। উদারপন্থী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টার ফলেই কংগ্রেস উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে এবং সুরাট অধিবেশনের (১৯০৭) পর থেকেই কংগ্রেস বিপ্লবী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বিপ্লবীদের খাতীরে মহাত্মাগান্ধী খিলাফত আন্দোলনের প্রথম ভাগেই উদারপন্থী লোকদের কংগ্রেস থেকে বের করতে থাকেন। বর্তমানে বিপ্লবীরা কংগ্রেস চালাতে ব্যর্থ হলে উদারপন্থী কংগ্রেসীরাই পুরনো আদর্শ বদলে বিপ্লবী মনোভাব নিয়ে কংগ্রেসে প্রাধান্য বিস্তার করছেন। আশংকা হচ্ছে বঙ্গাদেশ ভারত থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সাহসিকতা ও মহাত্মাগান্ধীর পুরনো সম্ভ্রম এখন কংগ্রেসকে টিকিয়ে রেখেছে।[৩০]

ঙ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশনীতির সমর্থন:

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী দেশে (ভারতবর্ষে) প্রত্যাবর্তনের সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯- ১৯৪৫) চলছিল। তখন তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করার কথা বলেন। তিনি তাঁর কাবুল গমন এবং ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের পূর্বেকার নীতি সম্পর্কে বলেন, তখন ধর্মীয় কর্তব্যের প্রয়োজনেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন এবং সে যুদ্ধে তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি বদলে যাওয়াতে ব্রিটিশদের সাথে মুসলমানদের

Dhaka University Institutional Repository

কোন ধর্মযুদ্ধ নেই। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশদের বিরোধিতা করা ভ্রমাত্মক ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর মতে, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে অহিংসনীতি অনুসরণ করে যতখানি উন্নতি করা সম্ভব হবে, তা অন্য কোন ভাবে সম্ভব হবে না।[০১]

১৯৪০ সালের ১২ জুলাই- এর থাট্টা অধিবেশনে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ব্রিটিশ রাজত্বের ফায়দা উল্লেখ করে বলেন, "শতাব্দীকাল ইংরেজ শাসনের মধ্যে দিয়ে ভারতীয়রা গণতন্ত্র শিক্ষা লাভ করেছে; তাদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ভারতের তরুণদের গণতান্ত্রিক মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে; ভারতের রাজা, বাদশা এবং নওয়াবদের শাসন ব্যবস্থাও এখন পার্লামেন্টের পরামর্শেই চলছে; ব্রিটিশ শাসন যেমন গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছে, তেমনি তা ভারতকে মেশিনারি ও শিল্পকারখানার সাথেও পরিচিত করেছে; মেশিনে কাজ করার জন্য কারিগর তথা শ্রমিক-মজুর সৃষ্টি করেছে; যাতে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে মেশিনের ন্যায় দায়িত্ব পালন করেছে। তাই ব্রিট্রিশ সরকারের প্রতি ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।"[০২]

অতঃপর উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী তাঁর নবগঠিত 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি' বিষয়ে আলোচনা কালে বলেন, "এ পার্টিতে হিন্দু-মুসলিম বিভেদের সব পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে মুসলমানদের অধিকার নিশ্চিত করা কংগ্রেসের কর্তব্য। এ নতুন পার্টিতে (যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি) মুসলিমদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই সমঝদার মুসলিম নেতৃবৃন্দকে এখন কংগ্রেসে টেনে আনা সম্ভব হবে।" সিন্ধী তাঁর কর্মসূচি বিষয়ে বলেন, "কাবুলে তিনি সাত বছর ভারতীয় জাতীয় স্বার্থে কাজ করেছেন, এখনও তিনি পরীক্ষামূলকভাবে সাত বছর তাঁর সংস্কারমূলক কাজ করবেন। তবে তাঁর দল 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি' নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না।[০৩]

সিন্ধী মনে করেন, একটি ফেডারেশন গঠন ছাড়া ভারতের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই।[০৪] পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিকান্দার হায়াত খান (১৮৯২- ১৯৪২) ও গান্ধী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলে সিন্ধী উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কেননা তিনি ধারণা করতেন, অহিংসনীতি অবলম্বন করলেই স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা যাবে। তবে সিকান্দার হায়াত খানকে ঐ অধিবেশনে সিন্ধী স্মরণ করিয়ে দেন যে, কংগ্রেসের সহযোগিতা ছাড়া বিনা শর্তে ব্রিটিশদের সহায়তা করলেই স্বায়ত্তশাসন পাওয়া যাবে না। সিন্ধী আহ্রারদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ করা উচিৎ। যুদ্ধশেষে 'হোমরুল' (স্বায়ত্বশাসন) না পাওয়া গেলে একজনের স্থলে দশজনকে যবেহ দেয়া যাবে।"[০৫]

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে (১৮৮৯- ১৯৬৪) ভবিষ্যত বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টি রেখে আপাতত কিছুটা পিছু হটতে এবং ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করবেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি প্রত্যাশা করতেন যে, তাঁর অনুরোধ পালনের পর মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মহাত্মাগান্ধী ও জওহরলাল নেহেরু একত্রে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে বড়লাটের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীকার অর্জনের ব্যাপারে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। সিন্ধী মনে করেন, গান্ধীর ১৯৩০ সালের ডাকা অসহযোগ আন্দোলন আর ১৯৪০ সালের অসহযোগ আন্দোলন এক হতে পারে না। কেননা যুদ্ধের সময়টি হলো নাজুক সময়।

Dhaka University Institutional Repository

তাই থাট্টা কংগ্রেসের অধিবেশনে মন্তব্য করেন, গান্ধীর সাথে তাঁর দেখা হলে ১৯৩০ সাল ও ১৯৪০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পার্থক্য তুলে ধরবেন।[৩৬]

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সালে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী 'আমরা কী চাই' শীর্ষক একটি উর্দু প্রবন্ধে তাঁর 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি' –এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতিমালা প্রকাশ করেন। প্রবন্ধের শীর্ষভাগে সিন্ধী ১৮৫৭'র স্বাধীকার সংগ্রামের পর মুসলমান নেতৃবৃন্দ কীভাবে আলীগড় ও দেওবন্দকেন্দ্রিক–এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আলীগড় প্রতিষ্ঠা করেছে মুসলিমলীগ আর দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছে জমীঅত–এ–উলামায়ে হিন্দ।"[৩৭]

নিচে উক্ত প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হল:

উক্ত উর্দু প্রবন্ধে সিন্ধী 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি' গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি মুসলিমলীগ ও জমীঅত–এ–উলামায়ে হিন্দ–এর যথাক্রমে চিন্তাবিদ ও প্রগতিবাদী অস্থিরমতি শক্তিবর্গের কাছে তাঁর দলের কর্মসূচি পেশ করতে চেয়েছেন। তাঁর ধারণা উক্ত দুই সংগঠনই মুসলমানদের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের আন্দোলন প্রায় থেমে যাচ্ছে।

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী তাঁর 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি'র কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অংশে ভারতের রাজনীতিতে মুসলমানদের ভূমিকা উক্ত পার্টির আয়ত্বে আনার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে বহিরাগত কোন মুসলিম শক্তি বা বহিঃশক্তি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ করতে চাইলে সিন্ধী তা ভারতের মুসলিম শক্তির মাধ্যমে মোকাবিলা করার মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমাদের উপস্থিতিতে তারা ইসলামের নামে ভারতের মাটিকে পদদলিত করার চেষ্টা করবে। আমরা কি মুসলমান নই? আমাদের কি নিজ দেশ শাসন করার কোন অধিকার নেই? এতে সন্দেহ নেই যে, আমাদের শাসন ক্ষমতা দৃঢ় করার অধিকার বহির্বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু তাঁরা ভারত আক্রমণ করে তা জয় করার চেষ্টা করবেন– তাঁদের সেই পদক্ষেপ আমরা কখনো মেনে নিতে পারি না। আমরা ভারতে ভারতীয় শাসন কায়েম করবো– এটা আমাদের অধিকার। এ বিষয়ের উপর আমরা যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারি এবং এমনিভাবে শ'–দেড়শ' বছরের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা দূর করতে পারি।"

সিন্ধী আরও বলেন, "মুঘল শাসনের শেষ দিকে শাহ আবদুল আযীযের দল যখন দিল্লীর দুর্বলতা দূর করতে চাইলেন, তখন তাদেরকে কোন মুসলিম শক্তি সাহায্য করে নি। আমাদের পূর্বপুরুষরা নিজ দেশে শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। তাই আমরা ঐ উচ্চ ধারণা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। আমাদের ভারতীয় দিশারিগণ বহুকাল ধরে শুনিয়েছেন–কবিতার একটি চরণ:

"নানা ব্যাখ্যার দরুণ বিগড়ে গেছে আমাদের স্বপ্ন।"

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁরা এই বিগড়ে যাওয়ার কারণ ভালরূপে খতিয়ে দেখেন নি। আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এর একমাত্র কারণ হলো– ভারতের মুসলমানদের দৃষ্টি সব সময় বিদেশী সাহায্য–সহযোগিতার উপর নিবদ্ধ ছিল বা নিবদ্ধ রাখা হয়েছিল। নিজ সিদ্ধান্তঅনুসারে নিজ দেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নি। সেই চিন্তার উদ্রেকের সুযোগও দেয়া হয় নি। যাঁরা এই ভ্রান্ত পথে পদচারণা করেছেন, তাদেরকে প্রথম যুগের জন্য ক্ষমার চোখে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এই জাগরণের যুগে যখন দিবালোকের ন্যায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন বহিরাগত পথনির্দেশের উপর ভরসা করা আমাদের জন্য বিষবৎ; তাই যাঁরা আমাদেরকে এখনো সেই ভ্রান্ত ধারণায় ফেলে রাখতে চান, তাঁদেরকে ক্ষমা করা যেতে পারে না।"

সিন্ধীর চিন্তা–চেতনা সর্বসাধারণের চিন্তা–ধারার চেয়ে অনেকখানি অগ্রবর্তী। তিনি ভারতীয় বলতে শুধু ভারতীয় মুসলমানদের বুঝাতেন। তাই ভারতীয় শব্দের পরে মুসলমান শব্দটি সংযোজন করা প্রয়োজন মনে করতেন না। তাঁর মতে, "সত্যিকার অর্থে ভারতীয় হলেন তারাই যাঁরা ভারতের বিশৃঙ্খলা, বিচ্ছিন্নতা ও অস্থিরতা দুর করে তাতে ঐক্য সৃষ্টি করেছেন এবং দেশকে সঠিক পথে এনে দিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, এখানে প্রথমত ভেল এবং গুণ্ড সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করতো। তাদের ইতিহাস আমাদের জানা নেই। আমরা এখন এতটুকু জানি যে, ভারতে আর্যরাই প্রথমত মোটামুটি একটা ঐক্য এনেছিলেন এবং মহান অশোকের ন্যায় এমন একজন সম্রাট সৃষ্টি করেছিলেন, যিনি প্রায় গোটা ভারতে একটা কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দুর করেছিলেন। আর্যরাই প্রথম ভারতীয়, যারা ভেল ও গুণ্ডদের ভারতীয়ত্ব বিলীন করে দেন (যদি তাঁরা আদৌ এখানে কোন ভারতীয়ত্ব সৃষ্টি করে থাকেন)। এরপর ইসলাম তার প্রথম যুগেই ভারত সীমান্তে উপনীত হয়। কাবুল এবং গজনী, যে অঞ্চলকে ইতিহাসে ভারতের প্রান্তিক অঞ্চল ধরা হয়, সেই এলাকাটি হযরত উসমানের খিলাফতের যুগে বিজিত হয়। তবে একটি নতুন আন্দোলনরূপে ইসলাম ৪শ' বছর পরেই ভারতে প্রবেশ করে।

গজনী কেন্দ্র থেকে মাহমূদ অগ্রসর হন এবং মুসলমানরা ৫– ৬শ' বছরের মধ্যে ভারতের বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলোকে নতুনভাবে একত্রিত করেন। অশোকের পর ভারতে আবার আলমগীরের ন্যায় ভারত বিজয়ী বাদশা সৃষ্টি হন, যিনি পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সারা দেশ শাসন করেন এবং সমগ্র দেশব্যাপী একক নিয়ম–কানুন–এর প্রচলন করে দেখিয়েছেন। এটা ছিল দ্বিতীয় শক্তি, যা আর্যদের ভারতীয়ত্বকে এমনভাবে নিশ্চিন্ন করে দেয়, যেমনটা আর্যগণ ভেল ও গুণ্ডদের ভারতীয়ত্বকে করেছিলেন। কিন্তু আর্যদের পতন এমন ছিল না, যেমনটি ছিল গুণ্ড ও ভেলদের। তাই এটা বলাই অধিকতর সমীচীন হবে যে, মুসলমানরাই প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় এবং হিন্দু তথা আর্যরা হলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারতীয়।

আলমগীরের পরে ভারতে আবার বিশৃঙ্খলা শুরু হলে ব্রিটিশরা এসে তা দূর করেন। এখন যদি ব্রিটিশরা নিজেদেরকে ভারতীয় বলতে রাজী হন এবং তাদের একটি শাখা তথা এ্যাংলো–ইন্ডিয়ানদের ন্যায় ভারতকে নিজেদের দেশ করে নেন, তবে আজ তাদেরকেই প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় বলা যাবে এবং মুসলমান ও হিন্দুদের যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভারতীয়

Dhaka University Institutional Repository

বলা হবে। কিন্তু এখনো ব্রিটিশরা ভারতীয়ত্ব গ্রহণে প্রস্তুত নন। এজন্য বর্তমানে মুসলমানদেরকেই প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় বলে পরিগণিত করা যাবে।"

উক্ত প্রবন্ধে তিনি (সিন্ধী) মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘিষ্ঠ বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে হীনমণ্যতায় না ভোগার পরামর্শ দেন। এ প্রসঙ্গে সিন্ধীর মন্তব্য হলো, "যেসব মুসলমান নিজেদের সংখ্যার ফিকিরে রয়েছেন, তাঁদের ভেবে দেখা উচিত, ইংরেজরা কি তাঁদের সংখ্যাধিক্যের বদৌলতে ভারত শাসন করছেন? সত্য কথা হলো– সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাস্বল্পতার উপর শাসন করে না, এবং তা নির্ভর করে সঠিক চিন্তাধারার উপর। যে সম্প্রদায়ের কাছে মানবতার উন্নতির জন্য সঠিক চিন্তাধারা থাকে এবং তাদের সাংগঠনিক শক্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও দৃঢ় হয়, তাঁরাই সঠিকভাবে দেশ শাসন করতে পারেন। এই যোগ্যতাপ্রাপ্ত এখন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যতটুকু রয়েছে, তা হিন্দুদের মধ্যে নেই। মানবতার সঠিক চিন্তা মুসলমানদের কয়েক ঘণ্টায় শেখানো যায়। কিন্তু এই চিন্তা বোঝার মত লোক হিন্দুদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়।" শাসন ক্ষমতা পরিচালনার জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও চিন্তাধারার প্রয়োজনীয়তার কথা সিন্ধী উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ভারতবর্ষকে সঠিক পথে পরিচালনার যথেষ্ট যোগ্যতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা রয়েছে। সিন্ধী যুক্তি দেন যে, মুসলমানরা প্রশাসনিক দক্ষতার পাশাপাশি ইউরোপীয় অস্ত্রের ব্যবহারও শিখে ফেলেছেন। এজন্য বর্তমান যুগে ঐ সঠিক পরিকল্পনা ও চিন্তাধারা কাজে লাগানোর সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ ও সামর্থ তাঁদেরই রয়েছে।

সিন্ধী মুসলমানদেরকে বাদশা আলমগীরের চিন্তাধারাকে ভুলে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আলমগীরের সাম্রাজ্যবাদকে নিজেদের লক্ষ্যবস্তু গণ্য করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর মতে, *বহির্দেশীয় মুসলমানদের হতবুদ্ধিসুলভ কর্মসূচিতে নিজেদের জড়ানো ভারতীয়* মুসলমানদের উচিত নয়। তাঁদের উচিত হলো নিজ ঘরের উপর কব্জা জমানোর জন্য অবিরাম চেষ্টা করা। যদি এই কাজে একশ' বছরও লেগে যায়, তবু তাঁদের কর্মসূচি পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই।[৩৮]

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব থাকবে নাকি তা উৎখাত করা হবে, এ সম্পর্কে সিন্ধী ঐ প্রবন্ধে বলেন, "যতদিন ভারতবাসী এ মর্মে নিশ্চিত না হবে যে, তারা লড়াই করে দেশ জয় করতে পারবে, ততদিন অসহযোগ আন্দোলন বর্জন করতে হবে। চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত ছোট ছোট লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে রাজনৈতিক শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।"[৩৯]

সিন্ধী তাঁর বিগত কর্মজীবনের ইতিহাস টেনে বর্তমান রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে বলেন, "মৌলিক কর্মসূচি অকৃতকার্য হওয়ার পর তিনি এখন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের *মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই কংগ্রেসের অধীনে এমন একটি দল গঠন* করতে হবে, যাঁরা 'হোমরুল' অর্জনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করবেন এবং নৈরাজ্য ও কম্যুনিজমের উর্ধ্বে থাকবেন। কিন্তু যতদিন এদেশের উপর ব্রিটিশ রাজত্ব থাকবে, ততদিন জনসাধারণের জন্য 'হোমরুল' ছাড়িয়ে পরবর্তী কর্মসূচি গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এ পরিস্থিতিতে জনগণের সংগে নেতাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে; তাদেরকে সঠিক

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচি না দিয়ে বিগত অর্ধ শতক বছরের ন্যায় অযথা রাজনৈতিক শ্লোগানে মুখরিত করা সমীচীন হবে না।"[৪০]

২৩ মার্চ ১৯৪০ সালে লাহোরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিমলীগের বার্ষিক অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' অর্থাৎ 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হয়। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ছিলেন লাহোর প্রস্তাবের বিরোধী। ১৯৪১ সালের জুন মাসে মাদ্রাজ প্রদেশের 'কুম্বাকুনাম'– এ পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আয়োজিত এক জনসভায় সিন্ধী সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। উক্ত 'কুম্বাকুনাম'–এর সমাবেশে সভাপতির ভাষণে সিন্ধী মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনারা ভারতবর্ষের কোন অংশকে পাকিস্তান বলবেন না। আপনারা পাকিস্তান স্কীম প্রণেতাদের কথা কানে আনবেন না।"[৪১]

১৯৪৪ সালে মার্চ মাসে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী উত্তর–পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি দিল্লী থেকে দেওবন্দ, লুধিয়ানা ও কাসুরসহ বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ পূর্বক লাহোরে উপস্থিত হন। *এ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তিনি* অবিরাম পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। অসুস্থতা নিয়েও তিনি সিন্ধু হায়দারাবাদের 'জমীঅতে তোলাবায়ে আরাবিয়া'র বিশেষ অনুরোধে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ এপ্রিল হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত তোলাবায়ে আরাবিয়ার সভায় সভাপতিত্ব করেন। এটাই ছিল সিন্ধীর জীবনে সভাসমিতিতে শেষ যোগদান। ঐ অধিবেশনে তিনি জিহাদের ব্যাখায় বলেন, "জিহাদের দু'টি স্তর রয়েছে। কখনো মুসলমান বাদশাহর অধীনে থেকে জিহাদ করা ফরজ হয়ে যায়। আবার কখনো শাসন ক্ষমতা এবং সামরিক বাহিনী না থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের উপর জিহাদ করা ফরজ হয়ে যায়। তখন নিজেরা দল গঠন করে যুদ্ধে নামতে হয়। যাকে ইউরোপে বলে শিল্পবিপ্লব।" আর সে বিপ্লবের জন্যই তিনি কংগ্রেসের অধীন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন।[৪২]

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী তোলাবায়ে আরাবিয়ার উক্ত অধিবেশনে এটাও স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন, "তিনি কংগ্রেসের অধীনে থাকলেও মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ও মাওলানা *আবুল কালাম আজাদের ন্যায় মহাত্মাগান্ধীর অনুসারী নন। গান্ধীর অহিংস নীতির সাথে তাঁর* মিল–গরমিল দু'টোই আছে। কারণ মহাত্মাগান্ধী কখনো সন্ত্রাস ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে রাজী নন।" তবে সিন্ধী প্রয়োজনে সন্ত্রাস ও আইন অমান্য আন্দোলনেও যোগদান করবেন। ইউরোপীয়রা যেভাবে তাদের বিপ্লবকে সুদৃঢ় করেছেন উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীও তেমনি শাহ্ ওলীউল্লাহ্–এর কাঙ্ক্ষিত ইনকিলাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। আর এ ইনকিলাবের শিক্ষা নিতে হবে ইউরোপ থেকে। কেননা তিনি বুঝেছিলেন এদেশের পুরনো হাতিয়ার এখন প্রায় অকেজো হয়ে যাচ্ছে। তাঁর মতে, তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা ও আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লাহ্ খান তা ভাল করেই বুঝেছিলেন। তাই সিন্ধী ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সামরিক শিক্ষা ইউরোপ থেকেই গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। আর এজন্য ইংরেজি ভাষাভাষীদের সাথে বিশেষ করে ইংরেজদের সাথে থাকা প্রয়োজন। তাই সিন্ধী সাধারণ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমাদের উচিত ইংরেজি শিক্ষা করা। এতে তোমরা ইউরোপের বিপ্লব বুঝতে সক্ষম হবে।" আরবী মাদ্‌রাসার ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, "প্রথমে দেওবন্দের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী কিতাবসমূহের পাঠ শেষ করবে, তার সাথে যুক্তিবিদ্যাও শিখবে। এতে শাহ ওলীউল্লাহ্‌র দর্শন

Dhaka University Institutional Repository

বুঝতে সহজ হবে। প্রতিটি আরবি ছাত্রকে প্রাইভেটভাবে কিছু ইংরেজি শিখতে হবে যাতে তারা শুদ্ধ করে ইংরেজি লিখতে ও পড়তে সক্ষম হয়।" সিন্ধী আরো বলেন, "আমি পরিষ্কারভাবে জানতে চাই যে, আমরা ব্রিটিশের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার চিন্তা বাদ দিয়েছি। বর্তমানে আমরা ডমিনিয়ন স্টেটস অর্জন করতে চাই।" জমিদারশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে সিন্ধী 'তোলাবায়ে আরাবিয়ার' উক্ত অধিবেশনে বলেন, "কৃষকদের শিক্ষিত করতে হবে; আইন পরিষদে তাদের প্রতিনিধি থাকবে; জমিদারদের সাথে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবে না; কৃষকরা আইন পরিষদে বসেই জমিদারদের কাছ থেকে তাদের ন্যায্য অধিকারটুকু আদায় করবে।"[৪০]

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী হায়দারাবাদের জলসায় যোগদানের পর অসুস্থতা সত্ত্বেও একজন সফর সঙ্গী নিয়ে ১৯৪৪ সালের জুন মাসে সিন্ধু প্রদেশের আরবি মাদ্‌রাসাসমূহ পরিদর্শনে যান। কিন্তু স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হলে সফর কর্মসূচি বাতিল করে করাচীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ৪ আগস্ট ১৯৪৪ সালে সিন্ধী লারকানা জেলার শাহদাদ-কোটে 'মুহাম্মদ কাসেম ওলীউল্লাহ্ কি থিয়লজিক্যাল স্কুল' -এর উদ্বোধন করার মত দিয়েছিলেন। কিন্তু অসুখ আরও বেড়ে যাওয়াতে ২ আগস্ট ১৯৪৪ সালে সিন্ধী তাঁর লিখিত ভাষণ শাহদাদ কোর্টে পাঠিয়ে দেন। সেই ভাষণ নির্ধারিত সময়ে উক্ত অনুষ্ঠানে পাঠ করে শুনানো হয়। এটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ। উক্ত মুদ্রিত ভাষণে সিন্ধী বলেন, "এ দেশকে ইউরোপ থেকে সামরিক নীতি ও শিল্পনীতি ধার করতে হবে। তবে সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষা নিতে হবে ইমাম ওলীউল্লাহ্ থেকে। যিনি ছিলেন অর্থনীতি ও দর্শন বিষয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর সমাজবাদই ইসলামের সাথে খাপ খায়।" উক্ত লিখিত ভাষণে তিনি আরও বলেন, "উত্তম মর্যাদা লাভ করতে হলে এদেশকে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে আরো দশ-বিশ বছর শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে হবে।"[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩।

২। মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

৩। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩।

৪। মুহাম্মদ সারওয়ার, 'খুতুবাত-এ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী', সিন্ধসাগর একাডেমী, লাহোর ১৯৪৪, পৃঃ ৭৮।

৫। Rowlatt Sedition Committee Report, Chapter- XIV, 1918, P- 125.

৬। মুহাম্মদ সারওয়ার, খুতুবাত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১।

৭। মুহাম্মদ সারওয়ার, খুতুবাত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩- ৮০।

৮। মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০।

৯। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১।

১০। মুহাম্মদ সারওযার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।

১১। আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৯।

১২-১৩। দৈনিক আজাদ, কলিকাতা, ফাল্গুন ২৪, ১৩৪৫/ মার্চ ৮, ১৯৩৯; মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত পৃঃ ৪১- ৪২।

১৪. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।

১৫. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২- ৪৩।

১৬. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮; আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।

১৭. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮; মুহাম্মদ, মুহাম্মদ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩- ৪৪।

১৮. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

১৯. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৭- ১৭৮, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

২০. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৯-১৮৪।

২১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।

২২. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬।

২৩. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮২- ১৮৩; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

২৪. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬-৪৭।

২৫. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮।

২৬. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮।

২৭. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২- ১১৩; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., পৃঃ ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯।

২৯. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪- ১১৫।

৩০. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯- ৫০।

৩১. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮।

৩২. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।

৩৩. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০- ৫১।

৩৪. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩।

৩৫. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১।

৩৬. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১- ৫২।

৩৭. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২।

৩৮. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩- ১০৯; মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫-২০৩।

৩৯. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬।

৪০. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., পৃঃ ৫৫।

৪১. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪।

৪২. মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১-১৫৬।

৪৩. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭-৫৮; মুহাম্মদ সারওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৭- ১৫৯।

৪৪. মুহাম্মদ সারয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭- ১৬৮, ১৭২- ১৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পলাশী যুদ্ধের পরাজয় ও প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয়দের ব্যর্থতার পর ব্রিটিশ সরকার স্বাধীকার আন্দোলনের জন্য মুসলমানদেরকে এককভাবে দায়ী করে যে নিপীড়ন ও নির্যাতন শুরু করতে থাকে তা ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বেশি দিন স্থায়ী হতে দেন নি। সেই ভারতীয় সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ছিলেন অন্যতম প্রাণপুরুষ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ভারতের অবহেলিত ও চেতনালুপ্ত অসহায় মুসলমানদের দুর্দশা লাঘবের নিমিত্তে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুমহান ব্রত গ্রহণ করে চরম সংকটময় মুহূর্তে যথার্থ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে জাতিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর সময়োচিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন অনেকখানি সহজতর হয়েছে। সিন্ধী ছাত্রজীবন থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশকে ব্রিটিশ মুক্ত করার স্বপ্ন লালন-পালন করছিলেন। প্রবল শক্তিধর ইংরেজদের জেল, যুলুম, নির্যাতন-নিপীড়ন কোন কিছুতেই তাঁকে আমরণ স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে এতটুকু পিছাতে পারে নি। তাই তো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী একটি অমর নাম, দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল চিন্তানায়ক, বিশিষ্ট সংগঠক, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বপ্নদ্রষ্টা ও কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

ইংরেজগণ ক্ষমতাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ভারতীয়দেরকে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। তাদের এই দুরভিসন্ধিমূলক ভাবনার বিপরীতে অগ্রসরমাণ নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন সংগ্রামী সুনাগরিক গঠনের মহৎ উদ্দেশ্যে শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান-এর সাহায়তায় সিন্ধী বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কাঙ্খিত ব্যক্তি তৈরী হবার পর তিনি তাঁদেরকে নিয়ে ভারতকে ব্রিটিশদের কবল থেকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ বিপ্লবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি করে বহিরাক্রমণ করা। এ লক্ষ্যে সিন্ধী জমীঅতুল আন্সার ও নিযারাতুল মা'আরিফ ইত্যাদি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এসব সংগঠনের সামাজিক পরিচিতি যা-ই থাকুক না কেন মূল উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লব এবং মুজাহিদ বাহিনী গঠন করা। বস্তুত এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপমহাদেশের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিতও হয়। এর মাধ্যমে তিনি দেশের জনগণকে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনায় সজাগ করতে থাকেন এবং বিশ্বের উচ্চস্তরের রাজনীতিবিদদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে। শায়খুলহিন্দ নেপথ্যে থেকে এসব প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন। প্রকাশ্যে নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী। দেশের অভ্যন্তরে জনমত সৃষ্টির পর আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে সিন্ধী ও মাহমূদ হাসান ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে জাপান, চীন, বার্মা, ফ্রান্স, আফগানিস্তান, রাশিয়া, জার্মান এবং আমেরিকা ইত্যাদি স্থানে মিশন প্রেরণ করেন। অতঃপর মাহমূদ হাসান হিযায এবং উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী স্বয়ং আফগানিস্তানে গমন করেন এবং অত্যন্ত গোপনে ব্রিটিশ-ভারত আক্রমণের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। এসময় তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে তাঁকে সহযোগিতা করেন মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসুর আনসারী, মাওলানা তাজ মাহমূদ আমরূঠী,

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ দীনপুরী, আবদুর রহীম সিন্ধী, মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক, ডাক্তার মুখতার আহমদ আনসারী, হাকীম আবদুর রাযযাক, খান আবদুল গাফ্ফার খান, হাজী তুরঙ্গাজয়ী, মুল্লা সান্ডাকে, মাওলানা মুহম্মদ আহ্মদ চাকওয়ালী, মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী, মাওলানা ফযল মাহমুদ, মাওলানা ফযলে রাব্বী, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও তৎকালীন *ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ-মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, নওয়াব ওকারুল মুলক্*, মাওলানা হাসরত মোহানী, হাকীম আজমল খান, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, মাওলানা শওকত আলী, সশস্ত্র বিপ্লবের সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করে সিন্ধীকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের ন্যায় হিন্দু, শিখ, বাঙালি নেতৃবৃন্দরাও তাকে সহযোগিতা ও পরামর্শ দেন।

১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর কাবুলে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও অধ্যাপক বরকতুল্লাহর নেতৃত্বে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করা হয়। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী উক্ত অস্থায়ী ভারত সরকারের ভারতমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে অনেকখানি এগিয়ে নেন।

হিযাযে অবস্থানকালীন সময় মাহমূদ হাসান ও হিযাযের গভর্নর গালিব পাশার সাথে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে যে আলোচনা ও চুক্তি হয় উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী তা আফগানিস্তান, সীমান্তের আষাদ এলাকা ও ভারতের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও মদীনায় তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি আনওয়ার পাশার সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনান্তে স্বাধীনতা আন্দোলনে সহযোগিতা দানের ব্যাপারে দুটি চুক্তি সম্বলিত 'আনওয়ারনামা' স্বাক্ষরিত হয়। এর একটি ছিল 'অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ও তুর্কী চুক্তি' এবং দ্বিতীয়টি ছিল 'তুরস্ক-আফগান চুক্তি'। দ্বিতীয় চুক্তির মর্ম হলো- আফগান সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ১৯১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তুর্কী বাহিনী আফগান সীমান্তের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করা এবং সাথে সাথে ভারতে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটানো। এ পত্রের উত্তরে মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী কাবুল থেকে মাহমূদ হাসানের নিকট একজন দক্ষ কারিগরের হাতে রুমালে রেশমী সুতা দিয়ে বয়ন করে পত্র লিখেন। পত্র মাহমুদ হাসানের নিকট প্রেরণ করার সময়ে পথিমধ্যে ইংরেজ সৈন্যগণ তা উদ্ধার করে। ইংরেজ সরকার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার তারিখ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যুদ্ধ প্রতিহত করার সকল ব্যবস্থা নেয় এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করতে থাকে। সিন্ধীর 'রেশমী রুমালপত্র' বা 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। একজন শিখ ধর্মান্তরিত নওমুসলিম হওয়ার পরও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি যে অবদান রাখেন, তা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সিন্ধী কাবুলে সাত বছর অবস্থান করেন এবং এই সময়ে সিন্ধী তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতা সম্বলিত কাহিনী নিয়ে লিখা 'যাতী ডায়েরী' বা 'আত্মজীবনী' ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মূল্যবান দলীল।

নানা বাধা, বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতাকে নিজের বিবেক, বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়ে মোকাবেলা করতেন। ততই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কাবুল থেকে রাশিয়ায় এবং রাশিয়া ত্যাগ করে তুরস্কে আশ্রয় নেন। অতঃপর মক্কায় গিয়ে বার বছর অবস্থান করেন। তাঁর সংগ্রামী জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভারতে অবস্থানকালে তিনি একজন নিবেদিত

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক ও গবেষক এবং মাহমূদ হাসানের একনিষ্ঠ কর্মী; কাবুলে গিয়ে হন সফল কূটনীতিক, অস্থায়ী ভারত সরকারের স্বদেশমন্ত্রী এবং জুনুদুল্লার অধিনায়ক; রাশিয়ায় গিয়ে হন সমাজবাদের ভক্ত; তুরস্কে গিয়ে হন কামাল পাশার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ও সংস্কার আন্দোলনের শ্রোতা ও পর্যালোচক; মক্কায় গিয়ে হন জ্ঞানসাধক, গবেষক ও শাহ্ ওলীউল্লাহ্র আর্থ-সামাজিক ও *রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিশ্লেষক; অতঃপর দেশে ফিরে একজন সফল বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক,* রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুটা ব্রিটিশ তোষণনীতি গ্রহণ করলেও ভারতবাসীর প্রতি যত প্রকার অবিচার হওয়ার আশংকা রয়েছে, সেগুলো দূর করার জন্যই "'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি' গঠন করে সিন্ধী তাঁর আন্দোলনকে চলমান রাখার চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে অনেক খানি এগিয়ে নিয়ে গেলেও ভারত স্বাধীন হওয়ার মাত্র তিন বছর পূর্বেই মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে সংগ্রামী পুরুষ উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিশিষ্ট- এক

রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা:

ছোটবেলা থেকেই সিন্ধীর মনে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। তিনি 'আত্মকথায়' (যাতী ডায়েরী ১৯৪৪) বলেছেন, ছোটবেলায় নিজ পরিবারের বৃদ্ধাদের মুখে পাঞ্জাব বিপ্লব (শিখ-ব্রিটিশ যুদ্ধ ১৮৪৬ ও ১৮৪৯)-এর বেদনাদায়ক কাহিনী শুনে এমনিতেই তাঁর মন ছিল বিষায়িত। তদুপরি কৈশোরে ইসলামী সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে ইসমাঈল শহীদের জিহাদ মুখর জীবনী পড়ে এবং পরবর্তী সময় দেওবন্দের ছাত্রজীবনে সেখানকার শিক্ষক আবদুল করীম দেওবন্দীর নিকট তাঁর স্বচক্ষে দেখা দিল্লীর পতনের (১৮৫৭) ইতিহাস জেনে তাঁর রাজনৈতিক অনুভূতি আরো শাণিত হয়ে উঠে। তিনি ইসমাঈল শহীদের জিহাদ সংক্রান্ত কিছুটা লেখার মর্মানুসারে নিজের রাজনৈতিক তথা জিহাদ বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। তাঁর এই জিহাদ ভাবাপন্ন হওয়ার মানে ছিল-রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন হওয়া। কারণ তাঁর ঐ জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভূমিকে ব্রিটিশদের কব্জা থেকে মুক্ত করা। তিনি যখন অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাশেষে তাঁর মুর্শিদের খলীফা আবুল হাসান তাজ মাহমুদের নিকট ইমরোটে (শুক্কুর) শিক্ষাদানরত ছিলেন, তখন চারজন মুজাহিদের একটি দল গঠন করেছিলেন এবং নিজেই দলের আমীর ছিলেন। তাঁর ভাষায়, "আমি ইমরোটে চারজন ছাত্রের একটি দল গঠন করি। এর উদ্দেশ্য ছিল জিহাদ করা। আমি ঐ দলের দলপতি ছিলাম। ঐ দলটি ইসমাঈল শহীদের যুদ্ধাদর্শে গঠন করা হয়েছিল। আমি ঐ দলের সূত্র ধরে জিহাদের কাজ শুরু করি।"

দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে সিন্ধী তাঁর ওস্তাদ মাহমুদ হাসানের সাহচর্য ও তাঁর বিপ্লবের কর্মসূচিতে প্রভাবান্বিত হন। দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় ছাত্র-শিক্ষক নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী ও সংগ্রামী রাজনীতি আরম্ভ করেছিলেন বলেই তো তিনি মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের আদেশে সেখান থেকে বিতাড়িত হন। 'জমীঅতুল আন্‌সার' ছিল প্রকারান্তরে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এতে তিনি সেক্রেটারিরূপে পরোক্ষভাবে রাজনীতিই করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "আমি যখন সিন্ধু থেকে দেওবন্দ্ গেলাম এবং 'জমীঅতুল-আন্‌সার'-এর কাজ শুরু করলাম, তখন আমার সামনে ছিল শায়খুলহিন্দের যুদ্ধের আদেশ।" 'জমীঅতুল আন্‌সার'-এর অন্যতম সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ছিল মাহমুদ হাসান পরিকল্পিত ব্রিটিশ উৎখাতের অভিযান পরিচালনার জন্য একটি ছদ্মবেশী বাহিনী গড়ে তোলা। তাই স্বভাবতই বলা যায়, সিন্ধীও ব্রিটিশ উৎখাতের পরিকল্পনায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন এবং ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি কাবুল গমন করেন।

দেওবন্দের আলিমগণ গোড়া থেকেই প্যান-ইসলামবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মুসলিম দুনিয়ার প্রতিনিধিরূপে তুরস্ক-খলীফার প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। সিন্ধীও প্রথম জীবনে প্যান-ইসলামী চেতনায় অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং ঐ প্রেরণা নিয়েই কাবুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু কামাল পাশা কর্তৃক খিলাফত রহিত করার পর তিনি প্যান-ইসলামবাদ ত্যাগ করে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি বলেন, "পুরনো তুরস্ক পরাজিত হয়ে ধ্বংস হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গিয়েছিল; নব্য তুরস্কের পক্ষে খিলাফত সামলানো মুশকিল ছিল। সেই দেশটি এখন খিলাফত রহিত করে ইউরোপের আদর্শে জাতীয় সরকার গঠন করেছে এবং নিজ দেশের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেছে। এক সময় আমি ব্রিটিশবিরোধী শক্তিগুলোর সাথে জড়িত ছিলাম। তখন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমি প্যান-ইসলামবাদকে ফরয বলে মনে করতাম। আমরা সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি। তখনকার ধর্মীয় সিদ্ধান্তকে আমি এখনো সঠিক বলে মনে করি। কিন্তু আজ পরিস্থিতি পালটে গেছে। এখন ব্রিটিশের সাথে মুসলমানের কোন ধর্ম-যুদ্ধ নেই।"

সিন্ধী কাবুলে গিয়ে আফগান সরকারকে ব্রিটিশ বিরোধী করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তুর্কী-জার্মান মিশনের সাথে কাবুলাগত কূটনীতিক রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকতুল্লাহ্ গঠিত অস্থায়ী ভারত সরকারের সদস্য হয়ে তিনি আফগান সরকারের কর্মকর্তাদের এবং শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরকে অনেকটা ব্রিটিশবিরোধী করে তুলতে সক্ষম হন। আফগানিস্তানের অধিবাসীরা স্বভাবতই ধর্মভীরু ছিলেন। তুরস্কের খিলাফতের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাই তাঁরা ছিলেন তুর্কীপন্থী। খলীফার দেশ তুরস্ককে আক্রান্ত দেখে তাঁরা মর্মাহত হন। অন্যদিকে আমীর হাবীবুল্লাহর ব্রিটিশ প্রীতির দরুণ আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব চলে গিয়েছিল ভারতীয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মুঠোয়। এ দিক থেকেও আমীর হাবীবুল্লাহর প্রতি বেশীরভাগ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও দেশবাসী অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে তুর্কী-জার্মান মিশন, বিশেষত উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় মুজাহিদদের ব্রিটিশ বিরোধী প্রপ্যাগান্ডার ফলে সোনায় সোহাগা হয়। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এঁরা জিহাদের যে প্রচারণা চালান, তাতে সরকার বিরোধী আফগান কর্মকর্তা এবং খিলাফতপন্থী গোঁড়া মুসলমানদের মনে ব্রিটিশবিরোধী জিহাদী মনোভাব আরো তীব্র আকার ধারণ করে। আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে তুরস্ক বাহিনী কর্তৃক ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করার যে পরিকল্পনা মাহমূদ হাসান করেছিলেন, কাবুলে সমবেত ভারতীয় মুজাহিদদের সহযোগিতায় সেটাকে বাস্তবায়িত করা এবং তদনুযায়ী আফগান সরকারকে রাযী করানোর জন্য সিন্ধী যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। কিন্তু কাবুলের শাসনকর্তা আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের ব্রিটিশ- প্রীতি, তাঁর নিরপেক্ষতা ঘোষণা, মতান্তরে তাঁর চরবৃত্তির দরুণ ঐ পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়। ফলে ব্রিটিশ গর্ভনমেন্টের ইঙ্গিতে ও আমীর হাবীবুল্লাহ্র আদেশে নেতাদের সাথে মাওলানা সিন্ধীও এক বছর আট মাস কারাবরণ করেন। আমীর হাবীবুল্লাহ্র মৃত্যুর পর আমীর আমানুল্লাহ্ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সিন্ধী মুক্তি লাভ করেন। তিনি তৃতীয় ইঙ্গা-আফগান যুদ্ধের সময় আমীর আমানুল্লাহর সহায়তা করেন এবং যুদ্ধশেষেও প্রশাসনিক কাজে তাঁকে গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে সেবাসুলভ মনোভাব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেন।

সিন্ধী আফগান সরকারের হিতসাধন করেছেন, ভাল কথা। কিন্তু তিনি যে মিশনটি নিয়ে তথায় গিয়েছিলেন, সেটা তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এখানে তাঁর প্রজ্ঞা হলো এই যে, তিনি ঐ ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিতে কসুর করেন নি। এই ব্যর্থতার পরেও দেওবন্দের আলিম সমাজ ব্রিটিশ আনীত আধুনিকতার পথে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করেন নি; আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি দেশবাসীকে উৎসাহিত করেননি; প্যান-ইসলামবাদও ত্যাগ করেননি। কিন্তু সেই স্কুলের ছাত্র হয়েও সিন্ধী গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন যে, ব্রিটিশের ন্যায় মহান শক্তির

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সম্মুখ জিহাদ করে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা যাবে না; তুরস্ক বা আফগানিস্তান বা অন্য কোন দেশের উপর তোয়াক্কা করে ব্রিটিশের সাথে যুদ্ধ করার ঝুঁকি নেওয়া মোটেই সমীচীন হবে না। বরং ব্রিটিশের সাথে আপাতত সহযোগিতা করে এবং ইউরোপ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করে নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে হবে এবং যথাসময় দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তি নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার অভিযান চালাতে হবে। একবার ঢাকার নওয়াব শামসুদ্‌দৌলাহ (১৭৭০- ১৮৩২) অযোধ্যার শাসনকর্তা ওযীর আলী খান, কাবুলের অধিপতি যামান শাহ্ এবং ইরান ও ফরাসি সরকারের সাথে আঁতাত করে ইংরেজ শাসন উৎখাতের একটা নীলনকশা এঁকেছিলেন (১৭৯৬-৯৮)। তাঁর ঐ নীলনকশা প্রস্তুতির কাজ শুরু হয় মুর্শিদাবাদে। তিনি পরবর্তী কর্মসূচি গ্রহণ করেন ঢাকায়। জাহাজযোগে বংগদেশ আক্রমণ করার জন্য তিনি মাসকটের আরবদের সংগেও যোগাযোগ করেছিলেন এবং তদনুসারে ১৭৯৬- ৯৭ সালে আরবদের জাহাজ সশস্ত্র সেনাবাহিনী ও সামরিক সাজসরঞ্জাম নিয়ে কলকাতা বরাবর বঙ্গোপসাগরে এসে নোঙর করেছিল। জাহাজে অবস্থানরত সেনাপতিরা নওয়াব শামসুদ্‌দৌলার নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে ঐ নীলনকশা ফাঁস হয়ে পড়ে এবং ১৭৯৯ সালে নওয়াব শামসুদ্‌দৌলাহ্ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের অভিযোগে সভাকবি মির্যা জান তাপিশ ও সভাসদ নান্‌কু মিঞাসহ ইংরেজ সরকারের হাতে বন্দী হন এবং কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে সাত বছর (১৭৯৯- ১৮০৬) কারাবরণ করেন। মাওলানা মাহমূদ হাসান ও মাওলানা সিন্ধীর পরিকল্পনাও কতকটা ঐরূপ ছিল। পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ায় এঁদেরকে কারাবরণ করতে হয়। মাওলানা মাহমূদ ও মাওলানা সিন্ধীসহ ভারতের বিপ্লবী দল তুরস্কের সাহায্যের উপর ভর করে তাঁদের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর মাওলানা সিন্ধীর মনে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অন্য শক্তির উপর ভরসা করা যে কতটা অসংগত, সেটা তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন। তখন থেকেই তাঁর মনে স্বাবলম্বনের চিন্তা উদিত হয় এবং তিনি দেশে ফিরে বারবার দেশবাসীকে এ মর্মে সতর্ক করে দেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলন নিজ বাহুবলেই করতে হবে; কোন বিদেশের মুখপানে চাওয়া হবে নিরর্থক। স্বাধীনতার জন্য বারবার ছোটখাট যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে বৃহত্তর অভিযানের প্রস্তুতি নিতে হবে। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে- "ভারতীয়দের উচিত, বহির্দেশীয় মুসলমানদের কোন বিব্রতকর কর্মসূচিতে জড়িত না হওয়া। তাদের কর্তব্য হলো নিজ দেশের উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। যদি এ পথে একশ' বছরও লেগে যায়, তথাপি কর্মসূচিতে পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। আমার মতে, ভারতবাসীদের জন্য কংগ্রেসের অহিংসনীতি অতদিনই মেনে চলা প্রয়োজন, যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করে স্বদেশ জয় করতে পারবে বলে তাদের বিশ্বাস অর্জিত না হয়। এই নীতি প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। দৃঢ়ভাবে এটা পালন করা উচিত। যতদিন তারা শেষ সুযোগের জন্য প্রস্তুত না হবে, ততদিন ছোটখাট লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া মোটেই সমীচীন হবে না।"

১৯১৬ সালে শরীফ হুসাইন আরব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে হিজাযে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বাধীন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তুরস্কের জাতীয়তাবাদীরা ১৯২০ সালের ২৮ জানুয়ারি 'মীসাক-এ-দিল্লী'র (National pact)- এর মধ্য দিয়ে আরব-প্রধান অঞ্চলসমূহের উপর থেকে তাঁদের শাসনাধিকার প্রত্যাহার এবং মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহের

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষাণবেক্ষণের দায়িত্ব খলিফার হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯২২ সালের নভেম্বরে তুরস্ক তাদের জাতীয় পরিষদে সুলতান খলীফা ৬ষ্ঠ মুহাম্মদকে পদচ্যুত করে এবং তদস্থলে আবদুল মজীদকে (১৮৬৮- ১৯৪৪) সুলতান না করে কেবল খলিফারূপে নির্বাচিত করে তাঁকে পার্থিব ও প্রশাসনিক ক্ষমতাবিহীন খলীফা বলে ঘোষণা করে। একই সময়ে আংকারার জাতীয় পরিষদ তুরস্ককে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলে আখ্যায়িত করে। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ কামালপন্থী গভর্নমেন্ট আইন রচনা করে খিলাফত রহিত করেন। কামাল পাশা দেশ বিজয়ের পরক্ষণেই সমাজ সংস্কারে হাত দেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিন (১৮৭০- ১৯২৪) কর্তৃক সমাজবাদের ভিত্তি রচিত হয়। আমীর আমানুল্লাহ্ ১৯১৯ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত আফগানিস্তানের বাদশা ছিলেন। তিনিও তাঁর দেশকে আধুনিকায়িত করার চেষ্টা করেন।

সিন্ধী ছিলেন সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক। তিনি আরব ও তুরস্কের জাতীয়তাবাদ প্রত্যক্ষ করেন; রাশিয়ার সমাজবাদে প্রভাবান্বিত হন; কামাল পাশা ও আমীর আমানুল্লাহর সংস্কার অভিযানে যুক্ত হন। এসব রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সমাজ সংস্কার সাধনের প্রেক্ষাপটে মাওলানা সিন্ধী প্যান-ইসলামবাদ ত্যাগ করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে তাঁর রাজনীতির মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেন; রাশিয়ার অনুসরনে ভারতে একটি ন্যায়নিষ্ঠ, কৃষক-শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব বিশিষ্ট ও পুঁজিবাদীদের জুলুমমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। সামরিক শক্তি প্রয়োগে ব্রিটিশ উৎখাতের পরিকল্পনাও তিনি এ সময়ে পরিত্যাগ করেন। এ সময় তিনি জিহাদের মানে প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযান-এই ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন যে, এর আরো একটি অর্থ আছে এবং তা হলো মুসলিম বাদশার অবর্তমানে জিহাদ বলতে বোঝায় সমাজ-বিপ্লব। প্যান-ইসলামবাদ সম্পর্কে তিনি বলেন: "আনুমানিক তিন বছর আমি তুরস্কে ছিলাম। আমি সেখানে প্যান-ইসলামবাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, অদূর ভবিষ্যতে এর কোন কেন্দ্র গড়ে উঠার সম্ভাবনা নেই। তাই আমি তুর্কীদের জাতীয়তাবাদের অনুসরণে আমার ইসলামী আন্দোলনকে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের' আওতাধীন করা জরুরী বলে মনে করলাম এবং এর অধীনে স্বনীতি অনুসারে ভিন্ন একটি পার্টির (সর্বরাজ্য পার্টি) মেনিফেস্টো তথা গঠনতন্ত্র ও উদ্দেশ্যাবলী ছেপে দিলাম।" কামাল পাশা ও আমানুল্লাহ্ খানের সমাজ সংস্কার সম্পর্কে তিনি বলেন: "শায়খুল হিন্দের ঐ বিপ্লব কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায়? আমার মতে ইউরোপ (রাশিয়া) থেকে তা শিখতে হবে। আমাদের পুরনো হাতিয়ার (সমাজনীতি) এখন কোন কাজে আসবে না। কামাল পাশা ও আমানুল্লাহ্ খান এ মর্মটি ভালরূপেই অনুধাবন করেছেন। আমিও বিদেশে থেকে এই সত্য ভাল করে বুঝতে পেরেছি। ইউরোপের বিজ্ঞান ও ইউরোপের সামরিক বিদ্যা ইউরোপ থেকেই শিখতে হবে।" রাশিয়ার সমাজবিপ্লব এবং জিহাদের দ্বিতীয় অর্থ সম্পর্কে সিন্ধী বলেন: "কাবুলে থাকাকালে জিহাদের প্রাথমিক অর্থই ছিল আমার আদর্শ। সেখানে মুসলমান বাদশা ও মুসলমানের সামরিক শক্তি বিদ্যমান থাকায় আমি জিহাদের আদেশ বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করি। অতঃপর পরিস্থিতি বদলে যায়; আমাদেরকে কাবুল ছাড়তে হয়; আমি রাশিয়ায় চলে যাই; রাশিয়ার রাজনীতি অধ্যয়ন করে আমি শায়খুল হিন্দের বাতলানো জিহাদের দ্বিতীয় অর্থের প্রয়োগ বুঝতে সক্ষম হই- তা হলো - মুসলমানদের শাসনক্ষমতা ও সামরিক শক্তি না থাকলে তখন তাদের কর্তব্য হবে নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের দল গঠন করা ও জিহাদ করা। এই জিহাদকেই ইউরোপে

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লব বলা হয়। ঐ সময় ইউরোপীয় বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র ছিল রাশিয়া। সেখানে আমি সাত মাস ছিলাম এবং ইউরোপের বিপ্লব সম্পর্কে ভাল করে পড়াশোনা করলাম। ঐ অধ্যয়নই আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। তখন আমি জিহাদের দ্বিতীয় অর্থ বুঝতে সক্ষম হই।"

১৯২৪ সালে ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত সিন্ধীর 'সর্বরাজ্য পার্টি'র মেনিফেস্টোতো তাঁর উক্ত মনোভাব প্রতিফলিত হয়। ঐ মেনিফেস্টোর মর্ম ছিল: ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা কায়েম করা হবে; সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার থাকবে; মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থ এবং ইসলামের মর্যাদা সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে; ব্যবস্থাপক সভায় বয়স্ক ভোটের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে; জমিদারি ও পুঁজিবাদ খতম করা হবে; দেশের ভূমি-সম্পদ সরকারের মালিকানাধীন থাকবে; ব্যক্তিগত মালিকানা সীমিত করা হবে; সুদী কারবার বন্ধ করা হবে; ভারত হবে বহু জাতির আবাসভূমি; অভিন্ন ভাষাভাষী ও অভিন্ন তহযীব-তমদ্দুনের অধিকারী অঞ্চলগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্টেটে পরিণত হবে; স্টেটগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মকে সরকারি ধর্ম বলে পরিগণিত করা হবে; প্রত্যেকটি স্টেট সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন থাকবে; ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে সকল স্টেট থেকে সংখ্যানুপাত এবং আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক গুরুত্বের নিরিখে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হবে; কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু সামরিক বিভাগ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রনীতি।

তুরস্ক ত্যাগ করে সিন্ধী ১৯২৬ সালে মক্কায় পৌঁছেন। ঐ সময় সেখানে ইবনে সুউদের শাসন চলছিল। সেখানে তিনি ১২ বছর পড়াশোনা ও শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি হেজায গভর্নমেন্টকে এ মর্মে আশ্বাস দেন যে, তিনি সেখানে কোন রাজনীতি করবেন না। সেটা তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। সৌদী সরকার তাঁকে প্যান-ইসলামবাদী নয়, বরং জাতীয়তাবাদী বলেই ধরে নেন। তাই তাঁর গতিবিধির উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় নি। ইবনে সুউদ মক্কার শরীফ হুসাইনকে পরাভূত করে হেজাযের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ভারতের আলিমগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। লক্ষ্ণৌর মওলানা আবদুল বারীর (১৮৭৮- ১৯২৬) নেতৃত্বে ফিরিংগীমহলের আলিমগণ শরীফ হুসাইনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অন্যদিকে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও তাঁর সমর্থকগণ ইবনে সুউদকে স্বাগত জানান। অবশ্য পরবর্তীসময় মুহাম্মদ আলী রাজতন্ত্র কায়েমের জন্য ইবনে সুউদের প্রতি রুষ্ট হন। সিন্ধী সেখানে ছিলেন নির্বাসিত। তিনি মক্কায় নিশ্চিত চিত্তে শাহ্ ওলীউল্লাহর রচনাবলি ও তদ্সংক্রান্ত দেওবন্দী আলিমদের গ্রন্থাবলির অধ্যয়ন ও সেগুলোর শিক্ষাদানে রত ছিলেন। তিনি তথায় ভারতীয় আলিমদের কোন দলেই যোগদান করেন নি। এটা ছিল তাঁর নিরপেক্ষ রাজনীতি।

১৯০৯ সালে দেশে ফেরার পর সিন্ধীর নবজীবন শুরু হয়। ঐ বছরের মার্চ থেকে ১৯৪৪ সালের আগস্ট তথা মৃত্যু পর্যন্ত-এই সাড়ে পাঁচ বছরের রাজনীতি ছিল তাঁর প্রকাশ্য তথা *মাঠে ঘাটের রাজনীতি। দেওবন্দের রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে তাঁর জমীঅতুল আন্সার গঠন*, সীমান্তে মুজাহিদ বাহিনীর তত্ত্বাবধান, ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের উদ্দেশ্যে কাবুল গমন এবং সেখানে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন- এ সব ছিল তাঁর গোপন তৎপরতা তথা গোপন রাজনীতি। তাঁর এসব কর্মকাণ্ড তাঁর লিখিত আত্মকথা (যাতী ডায়েরী) থেকে কতেকটা জানা যায়। ব্রিটিশের আমলে লেখা হয়েছিল বলে তিনি গোপনীয় সব কথা তাতে খোলাখুলি বলেন

Dhaka University Institutional Repository

নি। তিনি কীরূপ মুচলিকা (Bond) দিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট থেকে দেশে ফেরার অনুমতি পেলেন, তা আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। অনুমিত হয়, তিনি ব্রিটিশ শাসনের উৎখাত বা ব্রিটিশ বিতাড়নের আন্দোলন থেকে বিরত থাকবেন এই বন্ড দিয়েই ভারতে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী ভাষণ, কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডে তাই প্রতিপন্ন হয়। যে লোকটি এক সময় ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের দুশমন ও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতীক, সেই মানুষটি ভারতে ফিরে এলেন একজন বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকরূপে। তিনি ইতঃপূর্বে শক্তি প্রয়োগ ও জিহাদ করে স্বাধীনতা অর্জনের কথা ভাবতেন। এখন নীতি দর্শনের আবরণে স্বাধীনতার বাণী শুনাতে লাগলেন; অহিংসনীতি ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ধরলেন। তিনি জীবনের শেষ ৫/৬ বছর পরিশ্রম করেছেন যথেষ্ট, সভা-সমিতিতে ভাষণ দিয়েছেন দেদার। তিনি 'বায়তুলহিকমত', 'সিন্ধ সাগর একাডেমী' ও 'শাহ্ ওলীউল্লাহ্ আবুল কাসেম থিয়লজিক্যাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'সর্বরাজ্য পার্টি'র দ্বিতীয় সংস্করণ 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি' নামক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সাফল্য লাভ করেছিলেন খুবই কম। তাঁর পার্টির জনপ্রিয়তা ছিল খুবই সীমিত। এস. পি. সেন সম্পাদিত 'ডিকশন্যারি অব্ ন্যাশনাল বাইয়গ্রাফি'তে বলা হয়েছে: "He failed to carry either the Muslim Ulema or nationalists with him. Except one or two occasions, the various palitical porties and their leaders kept aloof from him." নরেশ কুমার জৈন সম্পাদিত 'মুসলিমস্-ইন-ইন্ডিয়া'য় বলা হয়েছে: "He was politically isolated."

সিন্ধী দেশে ফিরে ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসা করেন, ব্রিটিশ প্রবর্তিত গণতন্ত্র, ব্যবস্থাপক সভা, ব্যবস্থাপক কাউন্সিল, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানা, রেলপথ ইত্যাদির গুণকীর্তন করেন; ইউরোপীয় তহযীব তমদ্দুনকে স্বাগত জানান; ইংরেজি শিক্ষার প্রতি দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। তিনি একদিকে বলতেন, ভারতের জন্য পূর্ণ আযাদী হাসিল করতে হবে, আবার অন্যদিকে শুনাতেন, ব্রিটিশ সরকারের সাথে তাঁর দলের কোন দ্বন্দ্ব-কলহ নেই; ভারতে ব্রিটিশ শাসন অন্তত আরো ১০/ ২০ বছর রাখতে হবে; ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ- এর অধীনে ভারতের জন্য 'ডমিনিয়ন স্টেটাস' অর্জন করতে হবে। অন্য কথায়, তিনি ভারতবাসীদেরকে আরও কিছুকাল ব্রিটিশ উপনিবেশে থাকার পরামর্শ দেন।

সিন্ধী তাঁর আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন ভারতের রূপরেখা বর্ণনা করে বলেন, অভিন্ন ভাষা ও কাছাকাছি তমদ্দুনের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশে কয়েকটি স্টেট সৃষ্টি করা হবে এবং সেগুলো ২/ ৩ টি বিষয় ছাড়া হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এ স্টেটসমূহের যৌগিক হবে একটি ফেডারেশন তথা যুক্তরাষ্ট্র। এর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্টেটসমূহ থেকে জনসংখ্যা ও রাজনৈতিক গুরুত্বের ভিত্তিতে কতক প্রতিনিধি প্রেরিত হবে; কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু দেশরক্ষা, বহির্বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রনীতি। স্টেটগুলোর রাষ্ট্রভাষা হবে স্থানীয় মাতৃভাষা; আর কেন্দ্রীয় ভাষা হবে উর্দু ও ইংরেজি।

সিন্ধী ভারতে ফেডারেল গভর্নমেন্ট গঠনের যে স্কীম পেশ করেন, তা তেমন কিছু অভিনব ছিল না। মওলানা মুহাম্মদ আলী ১৯১১ সাল থেকে আমৃত্যু ভারতের জন্য একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকাঠামো প্রণয়নের অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৯১১ সালের ১৪ জানুয়ারি তিনি

Dhaka University Institutional Repository

'কমরেড' পত্রিকায় লিখেছিলেন, ভারতে হয়তো জাপানের মত একটা কড়া জাতীয় সরকার গঠন করা সম্ভব নয়, তবে কানাডার মত একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা মোটেই কঠিন নয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতে প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪২ সালের ২২ মার্চ *ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে শাসন সংস্কারের* একটি মিশন নিয়ে ভারতে আসেন। ঐ মিশনের প্রস্তাবেও এই আশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধশেষে উপমহাদেশকে ডমিনিয়নের মর্যাদা সম্পন্ন একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। সিন্ধীর যুক্তরাষ্ট্র গঠনের স্কীমটির অভিনবত্ব হলো, তিনি অভিন্ন ভাষা ও কাছাকাছি আচার-অনুষ্ঠানের অধিকারী অঞ্চলগুলো নিয়ে ভাষা ও তমদ্দুনভিত্তিক স্টেটসমূহ গঠন ও ঐ সব স্টেটের সমন্বয়ে একটি ফেডারেল গভর্নমেন্ট গঠন করতে চেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্ববর্তী স্কীমগুলোর তুলনায় সিন্ধীর যুক্তরাষ্ট্রের স্কীমটি ছিল অনেক বেশী স্বব্যাখ্যাত ও অনেক বেশী উদারনীতি তথা গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন। তাঁর এ ধরনের ভাষা ও তমদ্দুনভিত্তিক স্টেট গঠনের প্রস্তাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত ও পাকিস্তানের রাজনীতিতে আজ তাই লক্ষ করা যাচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অভিন্ন ভাষা ও অভিন্ন তমদ্দুনভিত্তিক স্টেট গঠনের দাবি উঠেছে এবং জোরালো আন্দোলনও চলছে।

সিন্ধী কংগ্রেসের সমর্থক হলেও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এর সদস্য ছিলেন না। তিনি গান্ধী কংগ্রেসকে মোটেও পছন্দ করতেন না। কারণ তিনি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। তিনি মনে করতেন, রাজনীতি-ক্ষেত্রে গান্ধী হিন্দু জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে নয়; তাঁর অভিযোগ ছিল- গান্ধী কংগ্রেসের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িতকতা প্রচার করেছেন। সিন্ধী যেমন *গান্ধী-কংগ্রেসকে পছন্দ করতেন না, তেমনি ধর্মবিহীন সমাজবাদীদেরকেও ভাল জানতেন না।* তাঁর ভাষায়: "আপনারা যদি ন্যাশনাল কংগ্রেসে যেতে সংকল্প করে থাকেন, তবে আমার পরামর্শ হলো- আপনারা ভিন্ন একটি দল গঠন করুন। গান্ধীজীর পার্টির অনুসরণ করে আমার মত একজন মুসলমান যেমন সফলকাম হতে পারে না, তেমনি সোশ্যালিস্টদের দলে থেকেও সেই মুসলমান ব্যক্তি তার আন্দোলন সহজে চালাতে সক্ষম হবে না। এজন্য আপনারা নিজেদের পার্টিকে উৎকৃষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করুন, এতে আপনাদের ধর্ম ও পার্থিব অর্থনীতি উভয়ের সমন্বয় সাধিত হবে।"

সিন্ধী মনে করতেন, ধর্মনিরপেক্ষ স্টেটসমূহে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সমভাবে নাগরিক অধিকার লাভ করবে এবং স্ব-স্ব মর্জি মাফিক স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব ধর্ম পালন করবে। তিনি 'গান্ধী-কংগ্রেস' পছন্দ করতেন না বলেই কংগ্রেসের আওতায় 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি' গঠন করেছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক রাজনীতির উপর ঐ পার্টির কোন প্রভাব প্রতিফলিত *হয়েছিল বলে মনে হয় না। ঐ দল জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয় নি, যদিও সেই কর্মসূচি* জোরালোভাবে চলছে বলে সিন্ধী বারংবার দাবি করতেন। বস্তুত ওটি ছিল একটি কাগুজে পার্টি। সিন্ধী স্বয়ং কংগ্রেসী হয়েও মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীকে (১৮৭৮- ১৯৫৭) তাঁর পরস্পর বিরোধী মতবাদের জন্য অভিযুক্ত করেন। কারণ মওলানা মাদানী একদিকে জাতীয়তাবাদ সমর্থন করতেন, আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন প্যান-ইসলামবাদী। সিন্ধীর

Dhaka University Institutional Repository

মতে, যে ব্যক্তি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ করবে, সে নিজ দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অপরাপর দেশের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হতে পারে না। গান্ধীর তাবেদারি করেন বলেই সিন্ধী মওলানা আবুল কালাম ও মওলানা মাদানী উভয়েরই সমালোচনা করেন।

সিন্ধী কংগ্রেসপন্থী হলেও তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি অভিযোগের সুরে বলেছিলেন, কংগ্রেস যদি সংখ্যানুপাতে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার দিত, তবে তারা কংগ্রেস থেকে এত দূরে সরে যেত না। তিনি আরো বলতেন, খিলাফত আন্দোলন ও অন্যান্য স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদান করা সত্ত্বেও কংগ্রেসপন্থীরা স্বরাজ আন্দোলন কেবল একা নিজেরাই করতে চান। এই সমালোচনা সত্ত্বেও সিন্ধী কংগ্রেস ত্যাগ করেন নি; পাকিস্তান প্রস্তাবও সমর্থন করেন নি। তিনি কংগ্রেসকে সংশোধিত করে মুসলমান নেতৃবৃন্দকে, এমনকি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকেও সেই দলে নেয়ার কথা ভেবেছিলেন। তিনি সমাজবাদের ক্ষেত্রে এবং জগৎ ও জীবনের প্রশ্নে দেওবন্দ স্কুলের উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হন, কিন্তু ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও অখণ্ড ভারতের প্রশ্নে সেই স্কুলের গণ্ডিতেই রয়ে গেলেন।

ব্রিটিশ শাসনকে ভারতে আরো কিছুকাল জিইয়ে রাখা, ভারতকে ব্রিটিশ উপনিবেশের মর্যাদা দেওয়া, ব্রিটিশের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হওয়া, অহিংস নীতি অবলম্বন করে ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ থাকা- সিন্ধীর সব অভিপ্রায় ও অভিব্যক্তি বিস্ময়কর বলে মনে হয়। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিমলীগ লাহোরে সার্বভৌম মুসলিম স্টেট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে 'ভারতছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সিন্ধী কীভাবে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের পাশাপাশি স্টেটসমূহের প্রতিনিধিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিলেন, দেশরক্ষা বিভাগে ব্রিটিশ অফিসার বহাল রাখার পরামর্শ দিলেন, ব্রিটিশ উপনিবেশে ব্রিটিশ জাতির সাথে সহঅবস্থানের কথা ভাবলেন, ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থে উৎকৃষ্ট স্থান দখলের উদ্দেশ্যে আরো দশ-বিশ বছর শান্ত জীবন যাপনের আরজি করেছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, যতটুকু মনে হয়, দেশে ফেরার সময় তিনি ব্রিটিশ শাসন উৎখাত না করার অঙ্গীকার করে এসেছিলেন। তাই মনে হয়, ঐকান্তিক অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও তিনি ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নটি জাতির সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন নি। তবে পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে তাঁর মনে সব সময় পীড়া দিত, তা অবশ্যই অনুমান করা যায়। একবার তিনি বলেছিলেন: "কোন জাতি দেশের বাইরে বসে আমাদের শাসন করবে- এত অবমাননা তো কোন দিন আমাদের দেশের হয় নি।" কিন্তু যখন দিল্লীর উপর ব্রিটিশের কব্জা হলো, তখন থেকেই আমাদের দেশের 'নূরানী চেহারা'র উপর দাসত্বের কালিমা লেপন করা হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতার ধ্যান সিন্ধী কখনো তাঁর মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি। তিনি সব সময় নগ্নশির থাকতেন। মওলানা সাঈদ আহমদ আকবরবাদী একদিন দিল্লীর জামে মসজিদের দক্ষিণ দরজার পার্শ্বে মাওলানা সিন্ধীর সাথে দাঁড়ানো ছিলেন। মওলানা সাঈদ সিন্ধীকে জিজ্ঞেস করলেন: "মাওলানা, আপনি সব সময় নগ্নশির থাকেন কেন?" সিন্ধী তৎক্ষণাৎ লালকিল্লার দিকে ইঙ্গিত করে কিছুটা রোষ সহকারে, আর কিছুটা দুঃখের সুরে বললেন: "আমার টুপিতো ঐ দিনই মাথা থেকে খসে পড়েছে, যেদিন

Dhaka University Institutional Repository

এই লালকিল্লা আমাদের হাত থেকে ছুটে গেছে। যতদিন আমি ঐ টুপি ফিরে না পাই, ততদিন আমার ঈর্ষা আমাকে টুপি মাথায় লাগাবার অনুমতি দেবে না।" সিন্ধীর মিশন ও কর্মকাণ্ড কেন জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হল না, তার কারণ ব্যাখ্যা করে সাঈদ আহমদ বলেন: "এর দু'টি কারণ রয়েছে: প্রথমত- মাওলানা যত বড় চিন্তাবিদ ও যতটা আন্তরিক ছিলেন, ততটা বাগ্মী ও সাহিত্যিক ছিলেন না। দ্বিতীয়ত- তিনি তাঁর চিন্তাচেতনায় ততটা পাকাপোক্তও ছিলেন না। ফলে কোন বিষয় আলোচনা করার সময় তাঁর বাণীভঙ্গি কিছুটা কর্কশ ও শ্রুতিকটু হয়ে পড়ত।"

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সিন্ধী কামনা করতেন যে, ইউরোপ তথা রাশিয়ার সমাজবাদ ভারতেও প্রবর্তিত হোক। তবে তাঁর ঐ সমাজবাদ ধর্ম বিবর্জিত ছিল না। তিনি ধর্মের মূলনীতি ঠিক রেখে সমাজ বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, পুঁজিবাদ সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী; তাঁর মতে, কুরআনের শিক্ষায় পুঁজিবাদের কোন স্থান নেই। তাই তিনি পুঁজিবাদের অবসান চেয়েছিলেন। তুরস্ক থেকে তিনি তাঁর 'সর্বরাজ্য দলের' যে গঠনতন্ত্র প্রকাশ করেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, তাঁর আদর্শ হলো সমাজে জমিদারি থাকবে না; ভূমি থাকবে সরকারের মালিকানায়। অথচ তিনি দেশে ফিরে জমিদারি উচ্ছেদের প্রস্তাব ভুলে গেলেন। তিনি প্রচার করতে লাগলেন, জমিদার ও কৃষকের মধ্যে কোন সংঘাত থাকবে না; কৃষকরা জমিদারদের প্রাপ্য অংশ পুরোপুরি শোধ করবে; জমিদারেরাও কৃষকদের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ রাখবে এবং সরকারের ন্যায্য অংশ সরকারের হাতে পৌঁছাবে। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে: "আমরা কৃষকদের জন্য সব কিছু চাই। কিন্তু তাদেরকে দিয়ে জমিদারদের সাথে লড়াই করাতে চাই না। বর্তমানে আমাদের দেশে জমিদারদের একটা মর্যাদা আছে। তাঁরা জমিনের খাজনা কৃষক থেকে আদায় করেন এবং সরকারের হাতে তুলে দেন। আমরা যেহেতু সরকারের সাথে লড়ছি না, তাই কৃষকদেরকে জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াবো কেন? আমরা জানি, কীভাবে ব্যবস্থাপক পরিষদে জমিদারদের নিকট থেকে কৃষকদের অধিকার আদায় করতে হয়।"

সিন্ধীর সমাজ-বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তি। তিনি ভাবতেন, এই মুক্তির জন্য ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ভারতে অবশ্যই ঘটাতে হবে। তিনি বলতেন, এই বিপ্লবের সন্ধান তিনি খুঁজে পেয়েছেন শাহ্ ওলীউল্লাহর দর্শনে। অন্য কথায়, তিনি ইউরোপের অর্থনৈতিক বিপ্লবে শাহ্ ওলীউল্লাহর সমাজ-চিন্তার সঠিক ব্যাখ্যা লক্ষ করেছেন। তিনি কৃষক, মজুর, তথা খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি বলতেন, ভারতের কৃষক-শ্রমিকদের জীবন পদ্ধতির মান ইউরোপের কৃষক-শ্রমিকদের তুলনায় অধম হওয়া উচিত নয়। তাঁর ভরসা ছিল তরুণদের উপর। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তরুণরা চেষ্টা করলে ভারতে শিল্পবিপ্লব অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে।

লক্ষণীয় হলো- সিন্ধীর চিন্তা ও কর্ম সমতালে চলে নি। তাঁর চিন্তা যতটা অগ্রমুখী ছিল, তাঁর কর্ম ততটা অগ্রণী ছিল না। তিনি শিল্পবিপ্লব চেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তার জন্য পথনির্দেশ দিতে পারেন নি। শিল্প-বিপ্লবের জন্য যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন, সেই ব্যবস্থার কথা তিনি ভাবেন নি। তিনি 'বায়তুল হিকমত' প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শাহ্ ওলীউল্লাহর দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি কোন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার চেষ্টা করেন নি। 'জমীঅতুল আন্সার'-এর সেক্রেটারি থাকাকালে তিনি দেওবন্দ

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্‌রাসা ও আলীগড় কলেজ তথা সনাতন শিক্ষাপ্রাপ্ত ও আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে একটা সেতুবন্ধ সৃষ্টির কর্মসূচি নিয়েছিলেন। কিন্তু তাও অগ্রসর হয় নি। তিনি ছিলেন মাদ্‌রাসা শিক্ষিত। তাই স্বভাবতই তাঁর আনাগোনা বেশী ছিল মাদ্‌রাসা-শিক্ষিত লোকদের মধ্যে। তিনি মাদ্‌রাসা সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের দিকে তাঁর দৃষ্টি *যায় নি। মোটকথা, তাঁর সমাজচিন্তা যতটা আধুনিক ছিল, তাঁর কর্ম ততটা আধুনিক ছিল না।*[১]

মাওলানা সিন্ধীর রাজনৈতিক কলা-কৌশল ও ভাবধারা সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন: "ইটালীতে কিয়ৎকালের জন্য মৌলবী উবায়দুল্লাহ্‌র সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি চালাক-চতুর এবং প্রাচীন ধরনের রাজনৈতিক কলা-কৌশলে সুপটু; কিন্তু আধুনিক ভাবধারার সহিত তাঁহার কোন পরিচয় নাই। তিনি আমাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের (ইউনাইটেড রিপাবলিক্‌স অব ইন্ডিয়া) একটা পরিকল্পনা দেখাইয়া বলিলেন, ইহা দ্বারাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। তিনি আমাকে ইস্তাম্বুলে (কনস্টান্টিনোপল) তাঁহার অতীত কার্যকলাপের কথা বলিলেন। আমার নিকট সেগুলি গুরুতর বলিয়া মনে হয় নাই এবং সেগুলি আমি অল্পকাল পরেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কয়েকমাস পরেই লালাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাঁহার নিকটও তিনি এসব গল্প করেন। লালাজী তাঁহার কথায় অত্যন্ত মুগ্ধ হন। সেই সকল গল্পই নানা অযৌক্তিক ও আশ্চর্যরূপে পল্লবিত হইয়া সেই বৎসর ভারতীয় আইন সভার নির্বাচনে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে মৌলবী উবায়দুল্লাহ্ হেজাযে যান। তাহার পর আর কয়েক বৎসর আমি তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই।"[২]

মুঈন শাকির মাওলানা সিন্ধীর রাজনৈতিক দর্শন ও ইসলাম সমর্থিত তাঁর মৌলিক সমাজচিন্তা ব্যাখ্যা করে বলেন: "It was Ubaidullah Sindhi (1872- 1944), trained by Mahmudul Hassan, who evolved a political philosophy which, on the one hand was influenced by the revolutionary traditions of wahabies, on the other, by the "Indo-Islamic," joint programme of Mahmudul-Hassan. He was the first Indian Muslim to adopt the national point of view in the interpretation of the history of the Islamic. But to Moulana Sindhi it was Islamic as well as humanist; this historical approach is the culmination of the revolutionary teachings of shah Waliullah. Sindhi's theory of nationalism was different from that of the congress and the reactionary Ulema.

A real federation would provide a true solution of the Indian problem .....Moulana Sindhi is the most original and progressive *thinker of modern India. After Shah Waliullah and Sir Syed, he made a* sincere attempt to interprent Islam in accordance with the requirements of the age. He visualized the possible impact of Islam on the social, political and economic life of the people..... He supported the establishment of a democratic socialist state and society. This is

Dhaka University Institutional Repository

characterised by Aziz Ahmad as a kind of "Pseudo-Waliullahi Communism". Moulana Sindhi, curiously enough, is one of the most neglected thinkers of Islam. He is condemned without being studied and understood. His concept of religion, nationalism and nationalities and Islamic communism is an original contribution to Muslim political ideas in India."[3]

---

১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭- ৮১।

২. জওহররাল নেহরু: আত্মচরিত (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অনূদিত), প্রকাশক- অশোককুমার সরকার, চিন্তামনি দাস লেন, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ১২২।

৩. Moin Shakir, Khilafat to Partition, Delhi-1983, P. 43, 45 & 46.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট– দুই

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা

মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ছিলেন শিখ ধর্মান্তরিত মুসলমান; তাঁর পিতা ছিলেন হিন্দুধর্ম থেকে শিখধর্মে দীক্ষিত। ইসলাম সত্যিকার অর্থে 'তওহীদ' (আল্লাহর একত্ববাদ)– এর শিক্ষা দেয় বলেই সিন্ধী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। ইসলাম গ্রহণের পরেও তাঁর সূফীতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় হিন্দুধর্মের বেদান্তবাদের কিছুটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৪ সালের ১৭ এপ্রিল হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত সিন্ধু 'আরবি ছাত্র সমিতি'–এর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন: "আমার ইসলাম ঘোষণার পূর্বে আমি তওহীদ ও শিরক্ সম্পর্কে নিজ ঘরে পড়াশোনা করছিলাম; তাতে আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, ইসলামই সত্যিকার তওহীদ শিক্ষা দেয়; তাই আমি অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য দেই; অবশ্য খ্রীষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্মও এক সময় সত্য ধর্ম ছিল। কিন্তু আমি লক্ষ করলাম, এতে বর্তমানে শিরক্ অনুপ্রবেশ করেছে।" কুরআন বলে: "ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র (সত্য) ধর্ম।" ঐশী ধর্মরূপে কুরআনে খ্রীষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্মের স্বীকৃতি রয়েছে এবং ঐ সব ধর্মের কিতাব ও নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্যেও মুসলমানের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে কুরআন বা মুসলমানদের অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থে ঐরূপ কোন ভাষ্য নেই। অথচ সিন্ধী বলেছেন, হিন্দুধর্মও এক সময় সত্যধর্ম ছিল। এটাকে তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মেরই জের বলা যায়।

মাওলানা সিন্ধী হিন্দু–বেদান্তবাদ ও মায়াবাদী মুসলিম সূফীদের 'ওয়াহদাতুল্ ওজুদ' (একত্ববাদ)– এর মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র খুঁজে বের করার প্রয়াস পান। তিনি মনে করতেন, ইবনুল্ আরাবীপন্থী (১১৬৫– ১২৪০ খ্রীটাব্দ) মায়াবাদী মুসলিম সূফীদের 'ওয়াহদাতুল্ ওজুদ' হল– হিন্দু বেদান্তবাদেরই সার ও শোধিত সংস্করণ; শাহ্ ওলীউল্লাহ্ই এই দর্শনের পূর্ণতা ও সংস্কার সাধন করেছেন; এই পথ ধরেই হিন্দু–মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্ম বজায় রেখে একটা ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। ১৯৪০ সালের ১১ জুলাই সিন্ধু প্রদেশের থাট্টায় অনুষ্ঠিত জেলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন উদ্বোধনকালে সিন্ধী ইউরোপের প্রযুক্তিবাদকে স্বাগত জানিয়ে বলেন: "উপমহাদেশে ঐ প্রযুক্তি প্রয়োগ না করা হলে এখানকার জনগণ বৈষয়িক উন্নতি থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং তাদেরকে পরের অস্পৃশ্য দাস হয়ে থাকতে হবে।" এর সাথে সাথে তিনি এই সাবধান–বাণীও উচ্চারণ করেন যে, ঐ প্রযুক্তিবাদের সাথে এদেশে ইউরোপের ধর্মহীনতা প্রবেশের ততটা আশংকা না থাকলেও তদ্সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কারণ ঐ ধর্মহীনতা অন্য পথ দিয়েও আসতে পারে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাথে ধর্মের কোন সংযোগ লক্ষ করা যায় না। এর ফলেই মানুষ খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করে বসে। এমতাবস্থায় একমাত্র 'ওয়াহদাতুল্ ওজুদ'–এর দর্শনই বিজ্ঞানীকে খোদাবিশ্বাসী করে তুলতে পারে। ঐ উদ্বোধনী ভাষণে সিন্ধী আরো বলেন, এই দর্শন হিন্দুদর্শনেরও মৌল। শাহ্ ওলীউল্লাহ্ এই তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন এবং জ্ঞান ও দর্শনের এমন একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা সকল ধর্মের তৃষ্ণা মেটাতে পারে। সিন্ধীর ভাষায় বলতে গেলে: "যে

Dhaka University Institutional Repository

মানুষটি (সিন্ধী) একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে, তার জন্য এ বিপদটি অন্য দিক থেকে আসছে; বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই; মোটকথা, খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করারই উপক্রম হয়েছে; ধর্ম ছাড়তে পারি না বলেই আমি এর প্রতিকারের জন্য সদা চিন্তা-ভাবনা করছি। আমার মতে, এক্ষেত্রে 'ওয়াহ্দাতুল্ ওজুদ' ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর *মাধ্যমেই একজন বিজ্ঞানীকে খোদার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করানো সম্ভব। এটা হিন্দুদর্শনেরও* সারকথা। তাই ইমাম ওলীউল্লাহ্ এই দর্শনের উপর তাঁর দর্শন-স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এতে সকল ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ তৃষ্ণা নিবরণ করতে পারবে। আমার দৃঢ় অভিমত হল- বৈষয়িক উন্নতির জন্য উপমহাদেশকে ইউরোপের গণতন্ত্র ও প্রযুক্তি বিদ্যা সানন্দে বরণ করতে হবে।"

সিন্ধীর উপর্যুক্ত আধ্যাত্মবাদের পেছনে রাজনৈতিক মানস কাজ করেছে বলে মনে হয়। তাঁর এখানে আধ্যাত্মবাদ ও রাজনীতি একাকার হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সমর্থক ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়াসী ছিলেন। ঐ ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আকবরের স্বাধীন মুসলিম ভারত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং আওরংগজেবের একক আইনভুক্ত ঐক্যবদ্ধ ভারত সৃষ্টির প্রশংসা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তিনি সুফী সাধকদেরকে মানবতার সেবক বলে আখ্যায়িত করেন এবং শাহ্ ওলীউল্লাহ্কে সেই শৃঙ্খলের সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব বলে অভিহিত করেন। তিনি আশা পোষণ করেন, হিন্দু-মুসলিম ধর্মের এ সব মানব-সেবক যদি আল্লাহ্র একত্ববাদকে পুঁজি করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তবে ভারত আরেকবার মিলনস্থলে পরিণত হবে এবং তা দুনিয়াকে পথনির্দেশ দিতে সক্ষম হবে। সিন্ধীর ভাষায়: "সুফীবাদের এই সব দিশারীদের মৌল চিন্তা হলো 'ওয়াহ্দাতুল্ ওজুদ' এবং এটা বেদান্ত দর্শনেরও মূলাধার। শাহ্ ওলীউল্লাহ্র সংস্কার ও পূর্ণতা সাধন করে মানবতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেটাকে কুরআন-হাদীসের সারবস্তু বলে তুলে ধরেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগাহ্' এবং তাঁর দর্শনবিষয়ক রচনা- 'আল্ বুদুরুল্-বাযিগাহ্' ও 'আত্-তাফ্হীমাতুল্-ইলাহিয়াহ্' ইত্যাদিতে এ বিষয়টির পরিষ্কার ভাষ্য রয়েছে। আমার মনে হয়, হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানবসেবকরা যদি এগিয়ে এসে ঐ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন, তবে ভারত আবার নদীসংগমে পরিণত হবে এবং তাঁরা দেশকে পথনির্দেশ দিতে সক্ষম হবেন।"

১৯৩৯ সালের ৩ জুন কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গ প্রাদেশিক জমীঅতুল উলামার এক অধিবেশনে সিন্ধী 'ওয়াহ্দাতুল্ ওজুদ' সম্পর্কে বলেন: "ইসলামী দর্শন হল- মূলত ঐ হিন্দুদর্শন, যেটাকে ভারতীয় মুসলিম সূফী সাধকগণ পূর্ণতায় উপনীত করেছেন। এই পূর্ণতা সাধনের শিক্ষক ও মুর্শিদ ইমাম ওলীউল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না।"

মুসলিম সূফীবাদ বেদান্তবাদ থেকে উৎসারিত বা প্রভাবিত সিন্ধীর এই মতবাদ দার্শনিকদের দৃষ্টিতে যা-ই হোক না কেন, মুসলিম সূফী সাধকরা এটা মেনে নিতে পারেন না। কারণ তাঁদের মতে, আধ্যাত্মিক সাধনা একটা খাঁটি ইসলামী বিষয়; এর সাথে বেদান্তবাদের কোন যোগসূত্র নেই। শাহ্ ওলীউল্লাহ্ সাধারণত মুসলিম সম্প্রদায়সমূহের পরস্পর বিরোধী ধ্যান-ধারণার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেছেন। ইবনুল আরাবী 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' তথা মায়াবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। পক্ষান্তরে, মুজাদ্দিদ-এ-আল্ফ-এ-সানী 'ওয়াহ্দাতুশ

Dhaka University Institutional Repository

শুহূদ' (একাত্মবাদের সাক্ষ্য) তথা দ্বিত্ববাদের সমর্থক ছিলেন। শাহ্ ওলীউল্লাহ্ এই দুই মতবাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেন এবং বলেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র সত্তা একক ও অদ্বিতীয়; বিশ্বের সৃষ্টিরাজি তাঁর অঙ্গ বা অংশ নয় বটে; কিন্তু তা ঐ একক সত্তার সাক্ষ্য ও প্রমাণ বহন করে। এই সামঞ্জস্য বিধানের মানে এই নয় যে, শাহ্ ওলীউল্লাহ্ বেদান্তবাদ-উদ্ভূত 'ওয়াহ্দাতুল্ ওজূদ'-*এর উৎকর্ষ বা সংস্কার করেছেন, যেমন মাওলানা সিন্ধী বলতে চেয়েছেন। সিন্ধী* 'ওয়াহদাতুল্ ওজূদ' অর্থাৎ সকল ধর্মের মূল এক, তবে সেগুলোর মধ্যে তফাৎ রয়েছে কেবল রূপের দিকে থেকে- এই ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিমত এটা ছিল না, যে কোন একটি ধর্মের অনুসরণ করলেই চলবে। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে: 'ওয়াহদাতুল্ ওজূদ' এই বিশ্বাস পুরোপুরি ঠিক এবং এর উপর ভিত্তি করে সকল ধর্মের মূল এক এই ধারণাটি যথার্থভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ধর্মসমূহের অভিন্নত্বের এ মানে নয় যে, বিশেষ কোন একটি ধর্মকে মান্য করা বা তার নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজনীয় নয়। আকবরের 'দীন-এ-ইলাহী'র ভাবুকরা এ বিষয়ে ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছেন। হয়তো বা তাঁরা ইসলামের এই নীতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, কিন্তু কাজের বেলায় করেছিলেন অন্যরূপ। ধর্মসমূহের অভিন্নত্ব মানার মানে হল- নৈরাজ্য সৃষ্টি করা। ধর্মীয় মতভেদ দূর করার এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ ধর্মকে সমূলে ধ্বংস করারই শামিল। মানুষের জীবন থেকে ধর্মকে তাড়িয়ে দিলে তাদের সমস্যা হ্রাস পাবে না; বরং তা আরো বেড়েই যাবে।"

এখানে প্রশ্ন জাগে-আকবরের 'দীন-এ-এলাহী'র প্রতি সিন্ধীর সমর্থন না থাকলে তিনি কীভাবে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা সমর্থন করলেন এবং কীভাবে বল্লেন যে, তাঁর 'দীন-এ-ইলাহী'র ভিত্তি ছিল 'ওয়াহদাতুল্ ওজূদ'-এর উপর। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে: "আকবরের চিন্তাধারার ভিত্তি ছিল 'ওয়াহ্দাতুল্ ওজূদ'-এর উপর এবং এর উপরই তিনি তাঁর দীন-এ-ইলাহীর ভিত্তি স্থাপন করেন।"

মূলত আকবরের 'দীন-এ-ইলাহী'র প্রতি সিন্ধীর সমর্থন ছিল না। তিনি মনে করতেন, সারা ভারতের মুসলমানদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই আকবর রাজনৈতিক *দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ কুশলী নীতি অবলম্বন করেছিলেন। সিন্ধী এটাও মনে করতেন, আকবরের* অমাত্যবর্গ যদি ভুল পথে পরিচালিত না হতেন এবং ঐ নীতিকে যথাযথভাবে ও সদুদ্দেশ্যে পরিচালিত করা যেত, তবে সারা ভারতের হিন্দুগণ হয়ত মুসলমান হয়ে যেত। সিন্ধীর ভাষায়: "বস্তুত আকবরের শাসন ছিল ভারতীয় ইসলামী শাসন। তাঁর রাজনীতিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ইসলামী জাতীয়তাবাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। কারণ গোড়ার দিকে ইসলামী শাসনকে ভারতীয় রূপ দেয়ার জন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন তাঁর অবশ্যই ছিল।"

সিন্ধীর এখানে পরস্পর বিরোধী ধ্যান-ধারণার সমাবেশ লক্ষ করা যায়। তিনি একদিকে আকবরের প্রশংসা করেছেন, আবার অন্যদিকে তাঁর ধ্যান-ধারণার মূল্যোৎপাটনকারী আলমগীরেরও গুণকীর্তন করেছেন। সিন্ধী কোন কোন সময় শাহ্ ওলীউল্লাহ্র নামে এমন ভিত্তিহীন কথা বলার প্রয়াস পেয়েছেন, যাতে শাহ্ সাহেবের প্রতি পাঠকদের অভক্তি সৃষ্টি হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে। যেমন সিন্ধী বলেছেন, আকবর ও আলমগীর উভয়ের প্রতি শাহ্ ওলীউল্লাহ্ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বস্তুত ব্যাপারটি তা নয়।

সিন্ধী ছিলেন কংগ্রেসী। কংগ্রেসের দাবি ছিল- ভারতবাসী একজাতি এবং ঐ প্রতিষ্ঠানটি হল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই। কংগ্রেসীদের নীতি ছিল হিন্দু-মুসলমান একযোগে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন করবে এবং ভারত স্বাধীন হলে তা অখণ্ডই থাকবে।

মনে হয়, 'ওয়াহ্দাতুল্ ওজূদ্- এই সূফীবাদী দর্শনের দোহাই দিয়ে সিন্ধী ভারতের হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য তথা সাম্প্রদায়িক খুনখারাবীর অবসান এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, হিন্দুদেরকে মুসলমানদের নিকটবর্তী করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ঐ চিন্তাভাবনা ছিল একটা দুরাশামাত্র। কারণ ভারতে ব্রিটিশ আমলের গোড়া থেকেই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। মুসলিম রাজনীতির গোড়ার দিকে উপমহাদেশে যখন বেশীর ভাগ মুসলিম নেতা কংগ্রেসী ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন, তখনো এই অনৈক্য বিদূরিত হয় নি; তখনো হিন্দুরা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয় নি। সুতরাং 'বেদান্তবাদ' ও 'ওয়াহ্দাতুল্ ওজূদ' মূলত এক ও অভিন্ন এই দোহাই দিয়ে অমুসলমানদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করা যাবে না; রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক অনৈক্যও দূর করা সম্ভব হবে না। বাস্তবে তাই প্রমাণিত হয়েছে। শরীঅতকে বাদ দিয়ে যদি তরিকত তথা সূফীতত্ত্বের উপর আমল করা চলে, তবে হয়তো বেদান্ত-বাদ ওয়াহ্দাতুল্ ওজূদের অভিন্নত্বের দোহাই দিয়ে অমুসলমান ও মুসলমানকে কাছাকাছি আনা যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে- মুসলমানের একটা পরিষ্কার শরীঅত ও ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক স্বতন্ত্র কৃষ্টি রয়েছে, যা তাদেরকে চিরকাল অমুসলমান থকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র জাতিরূপে চিহ্নিত করে রাখবে। মুসলিম জাতীয়তাবাদকে উপমহাদেশীয় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের অঙ্গে পরিণত করার যে সব চেষ্টা করা হয়েছিল, তা অতীতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ঐরূপ কিছু করা হলে তা-ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। জোড়াতালি দেয়ার ঐরূপ মনোভাব ইসলামের জন্য ক্ষতিকর। আকবর আর দারা শেকোহ্- এর ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ফল কত যে অশুভ হয়েছিল, তা মুসলিম সমাজের কাছে অবিদিত নয়।

সিন্ধী ওহাবী তথা আহলে হাদীসদের মতবাদ পছন্দ করতেন না। তিনি নিজেকে কাদেরী তরীকার একজন ফকীর বলে আখ্যায়িত করতেন এবং আবদুল কাদের জীলানীর (১০৭৭-১১৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) মানস-মুরীদরূপে সিন্ধু থেকে ওহাবী মতবাদ উৎখাতের চিন্তা করেছিলেন। ওহাবীদের বিশ্বাস হলো-ইসলামে পীর-মুরীদীর কোন স্থান নেই; আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে আত্মসমর্পণ করা শিরক্; তাই কবর ও মাযারের সম্মান করাও তাঁদের মতে শিরক্। এই মতবাদে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান পালন, বিলাসী জীবন যাপন ও অন্যান্য অনাবশ্যক কর্ম বর্জনের তাকীদ রয়েছে। দোয়া করতে গিয়ে কোন পয়গাম্বর বা বুযুর্গের নাম ওসিলা (মধ্যসূত্র)- রূপে গ্রহণ করাও তাঁদের মতে এক ধরনের শিরক্। কারণ এগুলো তওহীদের পরিপন্থী। কিন্তু গর-ওহাবী সুন্নীদের মতে পীর-মুরীদী নিষেধ নয়; দোয়ায় ওসিলারূপে কোন পয়গাম্বর বা বুযুর্গের নাম উচ্চারণ করাও শরীঅত বা তওহীদ বিরোধী নয়। মাওলানা সিন্ধীর সময় সিন্ধু প্রদেশে তওহীদের প্রশ্নে ওহাবী ও গর-ওহাবীদের মধ্যে প্রকট দ্বন্দ্ব ছিল। সিন্ধী

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৪ সালের ১৭ এপ্রিল হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত 'সিন্ধু যমীঅতুল্-তালাবা'-র এক অধিবেশনে ওহাবী-গর-ওহাবীদের মধ্যে বিদ্যমান ঝগড়া-ঝাটি সম্পর্কে বলেন: "মুসলমানদের এ দ্বন্দ্ব আমার কাছে ভাল লাগে না। শেষ পর্যন্ত আমি এর সমাধানের পথ এটাই খুঁজে পেলাম যে, আমি কাদেরী তরীকার একজন ফকীর; আমি হযরত শায়খ আবদুল কাদের জীলানীর 'ফুতুহুল গাইব' *গ্রন্থটি মান্য করি। এতে তওহীদের বিস্তাতির বিবরণ রয়েছে; কিন্তু এতে ওহাবীদের লেশমাত্রও* নেই। আমি যদি এ গ্রন্থকে আমার মৌলিক চিন্তার উৎস বলে গ্রহণ করে থাকি, তবে তার মানে হলো- সিন্ধু থেকে তওহীদের প্রশ্ন উদ্ভূত ওহাবী মতবাদের বাড়াবাড়ি একদিন দুর হবেই।"

সিন্ধী ওহাবী মতবাদের প্রতি কিছুটা ক্ষিপ্ত ছিলেন বলেও মনে হয়। তিনি ওহাবী মতবাদের প্রবক্তা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাহ্হাব সম্পর্কে বলেন: "শরীঅতের ক্ষেত্রে তিনি গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন না। তিনি এমন কোন ওস্তাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, যিনি তাঁকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারতেন। ফলে তিনি ধর্মকর্ম বিষয়ে যথার্থ ও যথোপযুক্ত *জ্ঞান লাভের মত বিদ্যা অর্জন করতে পারেন নি।" উপমহাদেশীয় আহলে হাদীসগণ শাহ্* ইসমাঈল শহীদকে আহলে হাদীস তথা ওহাবী মতবাদের প্রবক্তা বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু মওলানা সিন্ধী তাঁকে ওহাবী নয় বলেই প্রমাণ করার প্রয়াস পান। তিনি বলেন: "ইসমাঈল শহীদের শত্রুরা তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণ করেছেন; তারা তাঁর সহচর ও অনুসারীদের প্রতি অযথা শত্রুতা করেছেন। তাঁর তরীকাকে তাঁরা শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের তরীকা বলে অভিহিত করছেন এবং তাঁকে ওহাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই পবিত্র লোকটি নজদও চিনতেন না এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের সাথে তাঁর পরিচয়ও ছিল না। এই পরিবারটি ছিল হানাফী ফিকহের অনুসারী এবং এতে অনেক বুযুর্গ লোক জন্মগ্রহণ করেছেন।"

সিন্ধী তাঁর 'যাতী ডায়েরী' গ্রন্থে লিখেছেন: "মানুষের জন্য ইসলামের চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন ধর্ম, আর কোন দর্শন, আর কোন সভ্যতা ও আর কোন আইন পৃথিবীতে নেই।" তাঁর মতে ইসলাম হল- প্রগতির ধর্ম; এর মৌলিক বিষয়গুলো অপরিবর্তনীয়; কিন্তু এর আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তন-পরিবর্ধনযোগ্য। তিনি বলেন, "ইসলাম ধর্ম কোন দেশ, জাতি বা যুগের সাথে সীমাবদ্ধ নয়; তা হলো মানবতার ধর্ম; কুরআন-এ-করীম হল এই মানব ধর্মেরই ভাষ্যকার।"

স্যার সৈয়দের ন্যায় সিন্ধীও মনে করতেন, শুধু কুরআনই ইসলামের উৎস; ইসলামের মৌলনীতি উৎসারিত হয় কুরআন থেকে। তাঁর ভাষায়: "ইসলামের ভিত্তি হলো শুধু কুরআন। এই গ্রন্থেই ইসলামের মৌলনীতি নিহিত। ইসলামের সমষ্টিগত জীবনের মৌলিক নীতিমালার নির্দেশ কুরআনেই আছে এবং সেগুলো অপরিবর্তনীয়। কিন্তু যখনি কোন নীতি তথা শরীঅতী কানুনের বাস্তবায়ন শুরু হয়, তখন সম্বোধিত (আইন প্রযুক্ত) ব্যক্তিদের অবস্থানুযায়ী কতেক আনুষঙ্গিক আইনও প্রণীত হয়। মৌলিক আইন তো অপরিবর্তনীয়ই থাকে, কিন্তু আনুষঙ্গিক আইনগুলো যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হতে পারে। এসব আনুষঙ্গিক আইনকেই আমরা 'সুন্নাত' বলে থাকি।"

Dhaka University Institutional Repository

সিন্ধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধান্দায় পড়ে ভারতীয় সভ্যতা উৎঘাটনের প্রয়াস পান। ইসলামী সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। স্বতন্ত্রভাবে ইসলামী সভ্যতা বর্ণনা বা প্রচারের প্রবণতা তাঁর মধ্যে তেমন একটা লক্ষ করা যায় না। কারণ তিনি ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম যুক্ত জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি যেন মুসলিম দুনিয়া ও মুসলিম বিশ্বসভ্যতাকে ভুলেই গিয়েছিলেন। কেবল ১৯৪৪ সালে লারকানা জেলার শাহাদাত কোর্টে অনুষ্ঠিতব্য 'মুহাম্মদ কাসেম ওলীউল্লাহ্ থিয়লজিক্যাল কলেজ' উদ্বোধনের জন্য লিখিত ভাষণে তিনি হিন্দু সভ্যতার কথা না বলে মোগল যুগীয় কিছুটা গৌরবময় মুসলিম ইতিহাস তুলে ধরেছিলেন। সাধারণত তিনি ভারতীয় মুসলিম সভ্যতার পাশাপাশি ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা, আবার ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার পাশাপাশি ভারতীয় মুসলিম সভ্যতা বর্ণনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কংগ্রেসী তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচারের মোহে তিনি যেন কুরআন-হাদীস আর রামায়ণ-গীতাকে সমতালে চালাতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, ভারতীয় সভ্যতা হলো-আদি হিন্দু সভ্যতা ও মুসলিম শাসন যুগীয় সভ্যতারই অভিব্যক্তি। তিনি ভারতীয় সভ্যতাকে ধর্মভিত্তিক এবং ইউরোপীয় সভ্যতাকে ধর্মবিবর্জিত বলে আখ্যায়িত করেন। ১৯৪০ সালের ১২ জুলাই থাট্টায় (সিন্ধু) জেলা কংগ্রেস কমিটিতে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে তিনি সংক্ষেপে ভারতের আদ্যোপান্ত হিন্দু-মুসলিম সভ্যতা তুলে ধরেন এবং ভারত বিশ্বের আসরে এক উজ্জ্বল ও গৌরবময় ইতিহাসের অধিকারী বলে গর্ব অনুভব করেন। ভারতীয় সভ্যতার এই অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও তিনি বৈষয়িক উন্নতির জন্য ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লব আনয়ন ও ইউরোপীয় জীবনপদ্ধতি বরণের জন্য দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। এটা ছিল তাঁর ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে গঠিত 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি'রই অন্যতম মূলনীতি।

সিন্ধী ভারতীয় ভাষাসমূহকে ভারতের ঐতিহ্যবাহী অক্ষরে না লিখে রোমান অক্ষরে লেখার পরামর্শ দেন। তিনি ১৯৩৯ সালের ৩ জুন কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গ প্রাদেশিক জমীঅত-এ উলামা-এ-হিন্দ'- এর এক সভায় সভাপতির ভাষণে সিন্ধুবাসীদের প্রতি লক্ষ করে বলেন, তাঁরা সিন্ধুতে প্রস্তুত পোশাক-পরিচ্ছদ পরবেন, তবে তা হবে কোট-প্যান্ট বা কলার বিশিষ্ট কামিসের আকারে; কিন্তু সব অবস্থাতেই তাঁরা বিলেতি হেট ব্যবহার করবেন। তিনি আরো বলেন, আফগানিস্তানের আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের আদেশে তাঁর সিপাহীরা বুট পরিধান করে নামায পড়ত এবং তিনি তা স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি সিন্ধুর জনসাধারণের কাছে এই প্রত্যাশা করেন যে, তাঁরাও অনুরূপ কাজ করবেন। এটা বোধগম্য হয় যে, ভারতে ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লব আনার সাথে ইউরোপীয় জীবনপদ্ধতি বা ইউরোপীয় স্টাইলের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের কী সম্পর্ক ছিল? গোঁড়া কংগ্রেসী ও জাতীয়তাবাদীরূপে তাঁর মধ্যে একদিকে ছিল প্রত্যেকটি বস্তুর ভারতীয়করণের প্রয়াস, অন্যদিকে সমাজ-বিপ্লবীরূপে ছিল শিল্পভিত্তিক ইউরোপীয় আধুনিক সভ্যতা ও কৃষ্টি বরণের প্রবণতা। তাঁর ভাষ্যসমূহ পাঠ করলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, তিনি ছিলেন ইসলামিক সোশ্যালিস্ট। তিনি রাশিয়ায় যে সমাজবিপ্লব দেখেছিলেন এবং কামাল পাশার নব্য তুরস্কে যে সংস্কার ও জাতীয়তাবাদ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা ভারতেও প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। তবে তিনি ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দিতে চান নি। তিনি কামাল পাশার সংস্কারকে ভাল মনে করেছিলেন; কিন্তু তাঁর ধর্মশূন্যতাকে নয়। তাঁর ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

বলতে গেলে: "তুরস্কে কামালবাদের সাথে ধর্মশূন্যতাও প্রবেশ করেছে। আমরা ধর্মহীনতার প্রশ্নে নীরব থাকতে পারি না। এই ধর্মহীনতাকে রুখে দাঁড়াবার জন্য শাহ্ ওলীউল্লাহ্র দর্শনের শিক্ষাকে আমাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।"

সিন্ধী ইউরোপীয় সমাজবিপ্লব বাস্তবায়িত করার প্রশ্নেও ধর্মকে উপেক্ষা করেন নি, বরং সমাজবাদের সঙ্গে ধর্মের সংযোগ স্থাপনের প্রশ্ন তুলেছেন। ১৯৪১ সালের জুন মাসে মাদ্রাজ প্রদেশের কুম্বাকুনামে অনুষ্ঠিত ভারত বিভাগ-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আয়োজিত এক সভায় তিনি বলেন: "যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টিকে এমন এক উচ্চ নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত করুন, যাতে আপনাদের ধর্মনীতি ও অর্থনীতির সমাবেশ ঘটে। এই পার্টির ধ্যানধারণা যুক্তি ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হোক। সদস্য সংখ্যার আধিক্য বা অনাধিক্যের প্রতি লক্ষ করবেন না। ভারতীয় মুসলমানের শক্তি খুবই বেশী, যে সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাও অনুমান করতে পারছেন না। বুদ্ধিমান ছোট একটি দলও দেশকে পরিচালিত করতে পারে। ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় এই যোগ্যতা মুসলমানদের মধ্যেই বেশী রয়েছে।"

সিন্ধীর মতে, কুরআন সম্মত শাসন বলতে কেবল ঐ শাসনকেই বোঝায় না, যা খিলাফত-এ-রাশিদার-যুগে বিদ্যমান ছিল। কারণ খিলাফত এ-রাশিদা যুগের হুবহু শাসনপদ্ধতি সব যুগে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ঐ শাসনের মৌলিক কাঠামো বজায় রেখে যুগের নিরিখে তাতে কিছুটা পরিবর্তন-পরিবর্ধন অবশ্যই করতে হবে। তাঁর ভাষায়: "চলে যাওয়া যুগ ফিরে আসে না; বয়ে যাওয়া পানি প্রত্যাবর্তন করে না। কুরআনের আলোকে খিলফত-এ-রাশিদা তথা ইসলামের প্রথম যুগে সাহাবিগণ সে শাসন কায়েম করেছিলেন, হুবহু সেই শাসন এখন আর বাস্তবায়িত করা যাবে না। যাঁরা কুরআনের শাসনকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করেন, তাঁরা এর সঠিক তাৎপর্য জানেন না। এতে সন্দেহ নেই যে, খিলাফত-এ-রাশিদার শাসন হলো কুরআনী শাসনের একটা আদর্শ। কিন্তু হুবহু ঐ আদর্শ যুগে যুগে হস্তান্তরিত হতে পারে না।"

সিন্ধী মুসলমানের বাহ্য বেশভূষা বা আঞ্চলিক রীতিনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ না করে তাদের মানসিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মের মূল উদ্দেশ্যের উপর বেশী জোর দিতেন। বাহ্য দিক থেকে ভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ বা ভিন্ন রীতিনীতি অবলম্বন করতে দেখে কাউকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা তাঁর কাছে ছিল গর্হিত। তাঁর ভাষায়: "দুর্ভাগ্যবশত লোকেরা নিজ খান্দান বা শুধু নিজ দেশের বিশেষ আচার-আচরণকেই সত্য ধর্ম বলে ধরে নিয়েছে এবং যারা বাহ্য দিক থেকে ভিন্ন রীতিনীতি অবলম্বন করে; তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তারা এটা লক্ষই করছে না যে, ধর্মের যা আসল উদ্দেশ্য, তা তারা পালন করছে কি না?"

সিন্ধী জীবনের প্রথম দিকে সক্রিয় জিহাদের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পরিকল্পিত বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি বলতে লাগলেন-জিহাদ বলতে বোঝায় সমাজ বিপ্লব। তাঁর মতে জিহাদের দু'টি স্তর আছে: সাধারণত জিহাদের শর্ত হলো- দেশে মুসলমান শাসক থাকবে এবং কাফেরদের সাথে লড়াই করার মত সামরিক ক্ষমতাও তাদের থাকবে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, কোন মুসলমান শাসকও থাকবে না এবং তারা সামরিক ক্ষমতারও অধিকারী হবে না। ঐ

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় মুসলমানের উপর ফরয হলো- তারা নিজেরাই দল গঠন করবে এবং জিহাদে অবতীর্ণ হবে। কাবুলের ব্যর্থতার পর সিন্ধী শেষোক্ত জিহাদের সমর্থক হয়ে উঠেন। তিনি বলতেন, শেষোক্ত জিহাদকেই ইউরোপে সমাজবিপ্লব বলা হয়। হেজায থেকে ফিরে এসে তিনি দেশবাসীকে এই জিহাদেরই তালীম দেন।

সিন্ধী মুসলমানদের সুখী জীবন কামনা করতেন। তিনি চেয়েছিলেন সত্যিকারভাবে তাদের ধর্ম বজায় থাকুক, আবার অর্থ-সামর্থ্যেও তারা উন্নতি লাভ করুক। একজন ইসলামিক সোশ্যালিস্টরূপে তিনি ইহকাল ও পরকালের মধ্যে এবং আধ্যাত্মিকতা ও বৈষয়িকতার মধ্যে একটা সেতু-বন্ধন সৃষ্টির পয়গাম দিয়ে গেলেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের সফলতা যতখানিই হোক না কেন, তাঁর আন্তরিকতায় কোন অভাব ছিল না। এমন চিন্তাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজ দরদী ও মরদে মুমিন আজ আমাদের সমাজে মেলা ভার। সর্বশেষ তাঁর কামনা-বাসনা সংবলিত একটি উদ্বৃতি পেশ করে মূল প্রবন্ধটির ইতি টানছি। তিনি বলেন: আমি চাই, ইউরোপের ঐ বৈষয়িক উন্নতিকে মেনে নেয়া হোক- চলুন, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিকে আমরা আমাদের জীবনের ভিত্তি বলে পরিগণিত করি; তবে এটা যেন মনে না করা হয় যে, বিজ্ঞানই জীবনের সব কিছু। এই জড় পৃথিবীতে বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে, তা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু জীবন শুধু জড় পৃথিবীতেই শেষ নয়, বরং এই জড় জগৎ অন্য একটি অস্তিত্বেরই ছায়ামাত্র; এই জড় জগতের কেন্দ্র হল অন্য একটি সত্তা। সেই সত্তাই প্রকৃত জীবন এবং জীবনের সহায় ও উৎসমূল। জীবনের বৈষয়িক দিকটি অসম্পূর্ণ। কারণ তা জীবনের একটি মাত্র দিকই নির্দেশ করে। জীবনের সঠিক ও পূর্ণ ধ্যানধারণা নিহিত রয়েছে- 'রব্বানা আতিনা ফিদ্-দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া-ফিল্-আখিরাতি হাসানাহ' (হে খোদা দাও মঙ্গল আমাদেরকে এ জীবনে এবং পরজীবনেও)-এই মর্মবাণীর মধ্যে এই ধারণাটাই জীবনের সব দিক ধারণ করে।[১]

১। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ড., মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী : জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪- ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট– তিন

(১৯৩৩ সালে মক্কায় লিখিত উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর 'যাতী ডায়েরী'র অংশ বিশেষ)

উপমহাদেশীয় মুসলমানের উৎপত্তি:

ইতিহাস পাঠ করে হিন্দু যুবকরা এই মত পোষণ করেন যে, হিন্দুরা নাকি মৌলিক ভারতীয়, আর মুসলমানরা ইংরেজদের ন্যায় অন্যতম বহিরাগত বিজেতা জাতি। তাই তাঁরা যখন বিদেশী লোকদের কাছে ভারতের পরিচয় দেন, তখন মুসলমানদেরকে বহিরাগত বলেই তুলে ধরেন। এতে সন্দেহ-নেই যে, এখানকার মুসলমানদের বড় একটি অংশ আরব-অনারবদের সন্তান। এই অভিজাত শ্রেণীর মুখ থেকে কোন কোন সময় এমন কথাও বেরিয়ে পড়ে, যাতে হিন্দু যুবকরা তাঁদের ধারণার সমর্থন পেয়ে যান। আমার বিশ্বাস, পাঠকদের কাছে আমার এ পরিচয় অজানা নয় যে, আমার জন্ম হয়েছে এক হিন্দু পরিবারে। এক ব্রাহ্মণ থেকে ধার নিয়ে আমি জনৈক হিন্দু নওমুসলিমের লেখা-'তুহ্ফাতুল্-হিন্দ' পড়েছিলাম। এর ফলে ইসলামের সত্যতার প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মে এবং আমি ১৬ বছর বয়সে ইসলামে দীক্ষিত হই। ৩২ বছর বয়সে ধর্মীয় শিক্ষা শেষ করে আমি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে 'ফাযেল' পাসের সার্টিফিকেট লাভ করি। জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ভারতের সাধারণ মুসলমান, বিশেষত নিম্ন শ্রেণীর কৃষক-মজুরেরা এখানকার পূর্ববর্তী হিন্দুদেরই সন্তান। এঁরা ইসলামের দীক্ষা লাভ করেছেন। আর যে সব মুসলমান বিজেতার বেশে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, এখানকার অধিবাসী হয়ে গিয়েছিলেন এবং এই নতুন ধর্ম (ইসলাম) ও তমদ্দুনকে ভারতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের সন্তানরাই প্রথম শ্রেণীর ভারতীয়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের যে সব লোকেরা এখানকার দীক্ষিত মুসলমান ও বিজেতা মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন, তাঁরা বোকামিজনিত অজ্ঞতার শিকারে পরিণত। আমাদের ভাইদের (হিন্দুদের) উচিত, যথাসত্ত্বর এই ভ্রান্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা। আমি এ মর্মে নিশ্চিত যে, মানবতার জন্য ইসলামের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কোন ধর্ম, আর কোন দর্শন, আর কোন তমদ্দুন, আর কোন আইন পৃথিবীতে নেই। ভারতীয়দের (হিন্দুদের) উচিত ইসলামের এই উৎকৃষ্ট সভ্যতাকে সগৌরবে মেনে নেয়া। দুর্ভাগ্যবশত যদি তা না হলো, তবে আমরা নব দীক্ষিত মুসলমানরা কি এতই অথর্ব হয়ে পড়েছি যে, আমরা আমাদের সংখ্যানুপাতে নিজেদের ধর্মের ইজ্জত (রাজনৈতিক অধিকার) সকল ভাইদের (হিন্দুদের) নিকট থেকে আদায় করে নিতে পারব না? ইসলাম গ্রহণের পর যে কোন ভারতীয় নিজেকে অধিকতর বাহাদুর ও অধিকতর কৃষ্টিসম্পন্ন বলে মনে করে থাকে।[১]

---

১. নক্শ -এ- হায়াত (২), পৃঃ ১৫৬-১৫৭; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ড., প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১- ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

যে সব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

অতুল চন্দ্র রায়, ড., : ভারতের ইতিহাস,

প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় : মৌলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা, ২০০১।

অরবিন্দ পোদ্দার : বঙ্কিম মানস, কলকাতা-১৯৫৬।

আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলী : ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম (অনু), (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ)
স্বপ্নিল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯।

আব্দুল জলীল, এ. এম. এম : দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ,
ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৩।

আব্দুল মান্নান, সৈয়দ (অনু) : মুজাহিদ বাহিনীর ইতিবৃত্ত,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮।

আনিস সিদ্দিকী : হতভাগ্য বাদশা আমানুল্লাহ্, তারিক সিদ্দিকী, খুলনা, ১৯৬৯।

ড. আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা মুক্তধারা-১৯৮৩।

আব্দুর রহমান, মাওলানা : তাহরীকে রেশমী রুমাল, ক্লাসিক, লাহোর, ১৯৬০।

আব্দুর রশীদ আরশাদ : বীস বড়ে মুসলমান (নবম সংস্করণ),
মাকতবা-ই রশীদিয়্যাহ, লাহোর, ১৯৯৯।

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ড. : স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২।

: মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী : জীবন ও কর্ম,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২।

: মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭।

আবদুল বারী : কোম্পানী কী হুকুমত, ফর্থরিয়া কুতুবখানা, মুরাদাবাদ, ১৯৪৮।

আশিকুর রহমান কাসেমী মওলানা, : মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব,
(অনূদিত) আল্ আমিন প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৯৭।

আযীযুর রহমান, মুফতী : তাযকিরা শায়খুলহিন্দ, মদনী দারুত্ তালীফ, বিজনৌর, ১৯৬৫।

আহমদ খান, স্যার, সায়্যিদ : আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ, উর্দু একাডেমী, সিন্ধ, করাচী ১৯৫৭।

: মাকালাত-এ স্যার সায়্যিদ, তরক্কিয়ে আদব, লাহোর, ১৯৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইনাম-উল-হক, মুহাম্মদ, ড. : ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

ইকরাম, এস.এম : মওযে কাওসার, তাজকোম্পানী, দিল্লী, ১৯৯১।

ইনতিযামুল্লাহ্, মুফতী : মাশাহীরে জঙ্গে আযাদী, মুহাম্মদ সাঈদ এন্ড সন্স, করাচী, ১৩৭৬ হিঃ।

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাওলানা : ইফতিতাহী খুতবা, লরেন্স প্রেস রোড, করাচী, ১৯৪০।

: শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ আওর উনকী সিয়াসী তাহরীক, সিন্ধসাগর একাডেমী, লাহোর, ১৯৫২।

: শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ আওর উন্‌কা ফাল্‌সাফা, সিন্ধ সাগর একাডেমী, লাহোর, ১৯৪৪।

: যাতী ডায়রী, সিন্ধ সাগর একাডেমী, লাহোর, ১৯৪৪।

: কাবুল মেঁ সাত সাল, সিন্ধসাগর একাডেমী, লাহোর, ১৯৫৫।

গোপাল হালদার : বাঙলা সাহিত্যে রূপরেখা, কলকাতা, ১৯৫৯।

মীর্যা মুহাম্মদ, ওহীদ, (সম্পাদিত) : দায়িরা-এ মাআরিফ-এ ইসলামিয়া, ৯ম খণ্ড, পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি, লাহোর, ১৯৭২।

ওয়ালীউল্লাহ্ (র.), শাহ্ : হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, (উর্দু সংস্করণ) ইসলামী একাডেমী, উর্দুবাজার, লাহোর, ১৯৮৪।

গোলাম রসূল মিহ্‌র : সরগুযাশত-এ মুজাহিদীন, কিতাব মনযিল, লাহোর, ১৯৫৬।

গোলাম আহমাদ মোর্তজা : চেপে রাখা ইতিহাস (৮ম সংস্করণ) বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, বর্ধমান, ২০০০।

বিনয় ঘোষ : বাংলার বিদ্বৎসমাজ, কলকাতা, ১৯৭৮।

মুহাম্মদ তাহির, মাওলানা : মাল্টার বন্দী, মদনী মিশন, কলিকাতা, ১৯৮৬।

তারাপদ লা-হিড়ী : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কলিকাতা, ১৯৮৩।

নূর মোহাম্মদ আজমী (রাঃ), মাওলানা : হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস (৪র্থ সংস্করণ) ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯২।

মাহবুব রিযবী, সায়্যিদ : তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, ১ম খণ্ড, ইদারা-ই-ইহতিমাম দারুল উলূম, দেওবন্দ, ১৯৭৮।

: তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ (২য় খণ্ড), ইদারা-ই-ইহতিমাম দারুল উলূম, দেওবন্দ, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ মিয়াঁ, সায়্যিদ, মওলানা : আসীরান-এ মাল্টা, আল্-জমইয়্যাত বুকডিপো, দিল্লী, ১৯৭৬।

: উলামা-এ হক (১ম খণ্ড), আল্-জমইয়্যাত বুকডিপো, দিল্লী, ১৯৪৪।

: উলামায়ে হিন্দ-কা-শান্দারমাযী (৪র্থ খণ্ড), কিতাবিস্তান, দিল্লী, ১৯৮৫।

মুজীবুর রহমান, মওলানা : মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর রোজনামচা,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

মোদাব্বের, মোহাম্মদ : ইতিহাস কথা কয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭।

মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা : আযাদী আন্দোলন- ১৮৫৭, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৩৮৯ বাং।

: হায়াতে মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী,
আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৫।

মুসা আনসারী : 'বিশ শতকের ইতিহাস দর্শনে কার' এ
'ঐতিহাসিক ও তার তথ্য' ঢাকা-২০০৭।

: ইতিহাস: সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা
'এ প্রসঙ্গ: সংস্কৃতি ও সভ্যতা', ঢাকা-২০০৮।

: আধুনিক মিশনের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা, ঢাকা-২০০৫।

লেগারী আবদুল্লা, মাওলানা : মাওলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধী কী সারগুজাসতে কাবুল,
ফয়জুর ইসলাম প্রিন্টিং প্রেস, রাওয়ালপিন্ডি কায়দে
আযম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, ১৯৮০।

যাফর হাসান আইবেক : আপবীতী, মনসুর বুক হাউজ, লাহোর, ১৯৬৮।

মাওলানা আদরাবী, ফরীদ উদ্দীন : শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মাদানী (রাঃ):

মাসউদ, মাওলানা (সম্পাদিত) : জীবন ও সংগ্রাম, জামান প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৯১।

রহিম, এম. এ : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (৪র্থ সংস্করণ),
আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৪।

রুহুল আমীন, মোহাম্মদ : মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর সংস্কার আন্দোলন,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪।

হুসাইন আহমদ, মওলানা, মাদানী, : নকশ্ -এ হায়াত (১ম খণ্ড),
শায়খুল ইসলাম দারুল ইশাআত, করাচী, তাঃ বিঃ।

: নকশ্-এ হায়াত (২য় খণ্ড), মাকতবা-ই দীনিয়্যাহ, দেওবন্দ, ১৯৫৩।

: সফরনামা-এ আসীরে মাল্টা,
মদনী দারুত্ তালীফ, বিজনৌর, ১৯৭০।

Dhaka University Institutional Repository

হ্যাপী : হুকূমত-এ খোদ্ এখতিয়ারী, কুতুবখানা ইমদাদিয়া, করাচী, ১৯৫৭।

সারওয়ার মুহাম্মদ : তালীমাত-এ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী,
নোবেল কিশোর প্রেস, লাহোর, ১৯৫৫।

: খুতুবাত-এ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী,
সিন্ধ সাগর একাডেমী, লাহোর, ১৯৪৪।

ফুয়ূযুর রহমান : মাশাহীর উলামায়ে দেওবন্দ (১ম খণ্ড),
আল-মাকতাবাতুল আযীযিয়্যা, লাহোর, ১৯৭৬।

মুশতাক আহ্মদ, মওলানা : তাহরীকে দেওবন্দ, বেফাকুল মাদারিস, ঢাকা, ১৯৯২।

মুসা, মুহাম্মদ, শায়খ : উপমহাদেশের মুজাহিদীনের অবদান,
হোছাইনিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭২।

মুসা, মুহাম্মদ : পাকভারতের উলামার অবদান, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯১।

মওদুদ, আবদুল : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সাংস্কৃতির রূপান্তর,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এর পক্ষে ইসলামী
সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৬৯।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : ভারতবর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, এপ্রিল ১৯৮৩।

আবদুল ওয়াহিদ : উপমহাদেশের রাজনীতিতে সম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩।

নূর-উদ-দীন, আহম্মদ, (অনূঃ) : শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২।

মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা : আযাদী আন্দোলনের বীরসেনানী মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী,
দারুল কুরআন শামসুন উলূম মাদ্‌রাসা, চৌধুরীপাড়া,
ঢাকা, ৩১শে আগস্ট ১৯৯২।

সাইদ আহমদ আকবরবাদী, মাওলানা : মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী আওর উনকে নাকিদ,
মাকতবা-এ রাহমানিয়া, দেওবন্দ, ১৯৭২।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত : সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড),
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা, ১৯৮৭।

: বাংলা বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড), ঢাকা, ১৯৭৩।

: বাংলা বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড), ঢাকা, ১৯৭৩।

সু-প্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলকাতা-১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

Dr. A.K.M. Ashraf : Muslim Revivalisval the Revolt of 1857 in Rebellion, 1757 ed. P.C. Joshi, People's Publishing House, Delhi, 1957.

Andrews, C. F. : The Rise and growth of the congress in India, George Allen and Unwin, London, 1938.

Aziz Ahmed : Islamic Modernism in India and Pakistan, Oxford University Press, London, 1967.

Adamec, Ludwing W. : Afghanistan (1900-1923), California University, California 1967.

C.W. Smith : Modern Islam in India, London-1996, P-16.

Dutt, Romesh : The Economic History of India under early British Rule, Trubner Co. Ltd., London, 1908.

Prepared by the Board : History of the Freedom Movement; Vol-II, Part-II, Chapter-XII.

Francis, Robinson : Separation Among Indian Muslims, Oxford University Press, Calcutta, 1997.

Faruqi, Zia-ul-Hasan : The Deoband School and Demand for Pakistan, Asia Publishing House, Bombay 1963.

Fraser Tytler, W. K : Afghanistan A study of Political Developments in central and Southern Asia, Oxford University Press, New York, Toronto, 1967.

Khalil Inaljik : The Ottaman Empire, London-1973.

Johone F. Cady : South East Asia: Historical Development, London.

Hunter, W. W. : The Indian Musalmans, The Comrade Publishers, Calcutta, 1945.

Hamza Alavi : The Colonial Transformation in India in the Jurnal of social science Studies, Dhaka, N-7, July-1980.

Dhaka University Institutional Repository

Hasan, Mushirul : Nationalism and Communal Politics in India (1885-1930), New Delhi, 1991.

J. Rawlatt : Rawlatt Sedition Committee Report, 1918.

Irvine, W. : Later Mughals. Vol- 11. M. C Sarker & Sons, Calcutta, 1921.

M. Azijul Hoq : History of problems of Muslim community in Bengal, 1913.

P.K.Hitti : History of the Arabs, London-1951.

R.P. Dutt : India Today and Tomorrow, Delhi-1955.

R.C. Majumdar & other : An Advanced History of India, London-1953.
: History of the Freedom Movement in India, London.

Ishtiaq Husain, Qureshi : Muslims in India (II), Manohar Publications, New Delhi, 1983.

Jain, Naresh Kumer (ed) : Muslims in India (II) Manohar Publications, New Delhi, 1983.

Malik, Hafeez : Moslem Nationalism in India and Pakistan, Public Affairs Press, Washington, 1963.

Moin Shakir, : Khilafat of Partition, Delhi, 1983.

P. Hardy, Dr. : Muslims of British India, Cambrize University Press, 1972.

Prasad, Yuvary Deva : The Indian Muslims and World War-1. Janaki Prakashan, New Delhi, 1985.

Prepared by the Board : History of the Freedom Movement; of Editors (1707-1947), Board of Editors, Karachi, 1957.

Ray, Santimony : Freedom Movement and Indian Muslims, People's publishing house, New Delhi, January- 1979.

Wensinck, M.TH. : Encyclopedia of Islam (III).

Dhaka University Institutional Repository

Houtsma; A.J. (ed.) Lieden, London, 1936.

পত্র–পত্রিকা

দৈনিক জমীঅত, দিল্লী : ২৬ মার্চ ১৯৮০ সংখ্যা।

সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ঢাকা : ৭ম বর্ষ ২৮,২৯ সংখ্যা (৯ মার্চ ১৯৯৪)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা : ৩৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (জুলাই–সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮)

: ৩৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (অক্টোবর–ডিসেম্বর, ১৯৯৯)

: ৪২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (অক্টোবর–ডিসেম্বর, ২০০২)

অসীম কুমার দাস গুপ্ত : প্রবন্ধ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৯৮৫।

আল্–কাসিম, মাসিক, দেওবন্দ : দারুল উলুম, ১৩২৯ হি., রবীউল আওয়াল সংখ্যা;

১৩৩০ হি. জুমাদালউলা সংখ্যা; ১৩৩২ হি. সফর সংখ্যা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জুন ১৯৮৩;

ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫।

মুসা আনসারী : প্রবন্ধ, বঙ্গ ভারতের ঐতিহাসিক জাগরণ, মুসলিম

অবক্ষয় ও হিন্দু ভদ্রলোকদের ইতিহাসবোধ (ইতিহাস

পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা–২০০৫)।

: নিবন্ধমালা, এয়োদশ খন্ড, ২০০৫ (উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র)।

: প্রবন্ধ, পলাশীর শিকড় সন্ধানে, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা (জুন সংখ্যা, ১৯৯৫)।

The Dhaka University Studies : Dhaka University, 'A' Dhaka, December, 1984.

আল্–বুরহান, মাসিক, দিল্লী : ডিসেম্বর, ১৯৪৮, একবিংশ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

রাওল্যাট কমিটি রিপোর্ট, লাহোর : কাশিরাম প্রেস, ডিসেম্বর, ১৯১৮।

Silken Letters Conspiracy case and

who is Who, C.I.D. Report : ইন্ডিয়া অফিস, লন্ডনে সংরক্ষিত রেকর্ড।

দৈনিক আল্–জম্ইয়াত : দিল্লী, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, ১৯৫৮।

দৈনিক আজাদ : কলিকাতা, ফালগুন– ২৪, ১৩৪৫/ মার্চ ৮, ১৯৩৯।

Star of India : August 25, 1944.

সমাপ্ত